৬

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

[ষষ্ঠ খণ্ড]

[মহিলা সাহাবী]

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ
মুহাররাম ১৪২৯
মাঘ ১৪১৪
জানুয়ারী ২০০৮

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত আশি টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. VI) Written by Muhammad Abdul Ma'bud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 First Edition January 2005 Second Edition January 2008 Price Taka 180.00 only.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নম্র স্বভাব ও কোমল হৃদয়– একজন সৎ মানুষের বড়ো দুইটি গুণ। এমন গুণসম্পন্ন মানুষই সকল প্রকার উপদেশ, নীতিকথা, শিক্ষা-দীক্ষা, সত্য ও সঠিক পথের দিশা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফুলের পাঁপড়ি প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুর নীরব গতিতে হেলে যায়; কিন্তু শক্ত দণ্ডধারী বৃক্ষকে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বিন্দুমাত্র হেলাতে পারে না। চোখের দৃষ্টি শিখা আয়না ভেদ করে যায়; কিন্তু পাথরের উপর তীক্ষ্ণধার তীরও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষেরও ঠিক একই অবস্থা। নরম স্বভাব ও কোমল অন্তরের মানুষ সত্যের প্রতিটি আহ্বান মেনে নেয়: কিন্তু কঠিন হৃদয় ও রুক্ষ মেজায মানুষের উপর বড় বড় মু'জিযাও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এ ধরনের পার্থক্যের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সর্বত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পুরোটাই এ জাতীয় দৃষ্টান্তে ভরা।

কাফিরদের মধ্যে এমন অনেক দুর্ভাগার নাম আমাদের জানা আছে যারা হাজারো চেষ্টার পরও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সামনে মাথা নত করেনি। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমন হাজারো বুযর্গ ছিলেন যাঁরা তাওহীদের আওয়ায শোনার সাথে সাথে ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করেন। সাহাবীদের সাথে সাহাবিয়াত বা মহিলা সাহাবীরাও এই মর্যাদার অংশীদার।

শুধু অংশীদারই নন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষেরও অগ্রগামী। কোন রকম চেষ্টা-তদবীর ও জোর-জবরদস্তি ছাড়াই খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সামনে মাথা নত করেন। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন :

'আমি সোমবার দিন নবুওয়াত লাভ করি, আর খাদীজা সেই দিনের শেষ ভাগে নামায পড়ে। 'আলী পরের দিন মঙ্গলবার নামায পড়ে। তারপর যায়িদ ইবন হারিছা ও আবূ বকর নামাযে শরীক হয়।'

রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, রিসালাত-সূর্য উদয় হওয়ার প্রথম দিন এ বিশ্বের দিগন্তে যে আলো ফেলে, সে আলো এক কোমল হৃদয়, এক পবিত্র-আত্মা মহিলার জ্যোতির্ময় অন্তরকে ভেদ করে।

ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম কবুল করার চেয়ে ইসলামের ঘোষণা দানের জন্য সাহস, নির্ভীকতা ও শক্ত মনোবলের প্রয়োজন ছিল বেশী। কাফিরদের বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা

সাহাবীরাও চূড়ান্ত রকমের সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

মহিলা সাহাবীরা খুব সহজে শুধু ইসলাম গ্রহণই করেননি, বরং তাঁরা অতি স্বচ্ছন্দভাবে ইসলামের প্রচারও করেছেন। সহীহ বুখারীর তায়াম্মুম' অধ্যায়ে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের এক অভিযানে একজন মহিলাকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করেন। তার নিকট মশক ভর্তি পানি ছিল। সাহাবায়ে কিরাম পানির প্রয়োজনে তাকে বন্দী করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার পানি নেন, তবে তার মূল্য পরিশোধ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন সততায় মহিলাটি ঈমান আনে এবং তার প্রভাবে তার গোটা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। উম্মু শুরাইক (রা) মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তা অন্যদের সামনেও তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। তিনি মক্কার বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে মহিলাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে কুরাইশ পাষণ্ডরা তাঁকে ধরে তাঁর গোত্রের লোকদের হাতে তুলে দেয়। তাদের হাতে তিনি অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

পুরুষ সাহাবীদের সাথে মহিলা সাহাবীরাও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। সুমাইয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁর উপর নানা রকম অত্যাচারের কসরত চালায়। মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো। তারপরেও তিনি ইসলামের উপর অটল থাকতেন। একদিন দুপুর রোদে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত বালুর উপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় রাসূল (সা) সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সুমাইয়্যাকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন : 'ধৈর্য ধর। জান্নাতই হবে তোমার ঠিকানা।' এত অত্যাচার করেও কাফিররা তৃপ্ত হয়নি। অবশেষে আবূ জাহল বর্শা বিদ্ধ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

হযরত 'উমারের (রা) বোন ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেকথা তাঁর কানে গেলে এমন নির্দয়ভাবে তাঁকে মারপিট করেন যে, তাঁর সারা দেহ রক্তে ভিজে যায়। তারপরেও তিনি বিন্দুমাত্র টললেন না। 'উমারের (রা) মুখের উপর সাফ বলে দিলেন, যা ইচ্ছা করুন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছি। ইসলাম গ্রহণের কারণে দাসী লুবাইনাকে (রা) 'উমার (রা) মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতেন। তখন বলতেন, তোমার প্রতি দয়া ও করুণাবশতঃ থেমে যাইনি, ক্লান্ত হয়ে থেমেছি। লুবাইনাও (রা) ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বলতেন, আপনি ইসলাম

গ্রহণ না করলে আল্লাহও আপনাকে এমন শাস্তি দেবেন।[১] এমনিভাবে যিন্নীরার (স্ত্রীর দাসী) উপরও কঠোর নির্যাতন চালাতেন। উম্মু শুরাইককে (রা) রুটি ও মধু খাইয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত বালুর উপর রাখা হতো। পিপাসায় বুক শুকিয়ে যেত, এক ফোটা পানির জন্য কাৎরাতেন, পানি দেওয়া হতো না।

পুরুষ সাহাবীরা যখন ঈমান আনলেন তখন কাফিরদের সাথে তাদের সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এতে তাঁদের ঈমানী শক্তিতে কোন রকম তারতম্য সৃষ্টি হয়নি। মহিলা সাহাবীদের অবস্থা এ ব্যাপারে পুরুষ সাহাবীদের চেয়ে বেশী নাজুক ছিল। মানুষ যদিও তার সকল আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তবে একজন নারীর জীবনের সকল নির্ভরশীলতা স্বামীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। জীবনের কোন অবস্থায়ই সে স্বামীর উপর নির্ভরতা ছাড়া চলতে পারে না। পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু একজন নারী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও মহিলা সাহাবীরা এমন এক স্পর্শকাতর সম্পর্ককেও ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং নিজেদের কাফির স্বামীদের থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। সুতরাং হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন এ আয়াত–[২] وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না) নাযিল হলো, তখন পুরুষ সাহাবীরা যেমন তাদের কাফির স্ত্রীদের তালাক দিলেন, তেমনিভাবে বহু মহিলা সাহাবী তাঁদের কাফির স্বামীদের ছেড়ে হিজরাত করে মদীনায় চলে যান এবং তাই হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৩]

'আমরা এমন কোন মুহাজির মহিলার কথা জানি না যে ঈমান এনে আবার মুরতাদ হয়েছে।' পুরুষদের ক্ষেত্রে মুরতাদ হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

কাফিররা মহিলা সাহাবীদেরকে নানা রকম শাস্তি দিত। কিন্তু তাঁদের কারও মুখ থেকে কালেমায়ে তাওহীদ ছাড়া শিরকমূলক কোন কথা কোনদিন উচ্চারিত হয়নি। উম্মু শুরাইক (রা) ঈমান আনলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে নিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি যখন সূর্যের উত্তাপে জ্বলছেন, তখন তাঁকে রুটির সাথে মধুর মত গরম জিনিস খেতে দিত। পানি পান করতে দিত না। এ অবস্থায় যখন তিন দিন চলে গেল তখন জালিমরা বললো : 'যে দ্বীনের উপর তুমি

---

১. আনসাব আল-আশরাফ-১/১৯৭; ইবন হাজার এ সাহাবিয়ার নাম লাবীবা এবং ডাকনাম উম্মু 'উবাইস বলেছেন। (আল-ইসাবা-৪/৩৯৯, ৩৭৫)

২. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০

৩. বুখারী : কিতাবুশ শুরূত; যিকরু সুলহিল হুদায়বিয়া।

আছ তা ত্যাগ কর।' তিনি এমনই বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, তাদের কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। যখন তারা আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বুঝালো যে, তুমি তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার কর, তখন তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, "আল্লাহর কসম, আমি তো এখনও সেই বিশ্বাসের উপর অটল রয়েছি"।[৪]

সকল দেশে এবং সবকালে মেয়েরা সাধারণত প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রথা ও প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। আর আরবে অংশীবাদী চিন্তা-বিশ্বাস দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকায় মানুষের অন্তরে তা শক্তভাবে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু মহিলা সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে প্রচলিত সকল বিশ্বাস ও সংস্কারকে অত্যন্ত প্রবলভাবে অস্বীকার করেন। আরববাসী মনে করতো, যদি কোন ব্যক্তি মূর্তির দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় তাহলে সে শক্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে হযরত যিন্নীরা (রা) ইসলাম গ্রহণের পর অন্ধ হয়ে গেলে কাফিররা বলতে শুরু করে যে, লাত ও 'উয্যা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। একথা শুনে তিনি সাফ বলে দিলেন, লাত ও 'উয্যার তার পূজারীদেরই কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমার যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৫]

জাহিলী যুগে আরবরা শিশুদের বিছানার নীচে ক্ষুর রেখে দিত। তারা বিশ্বাস করতো, এতে শিশুরা ভূত-প্রেতের আছর থেকে নিরাপদ থাকে। একবার আয়িশা (রা) একটি শিশুর শিথানে ক্ষুর দেখতে পেয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের কুসংস্কারকে মোটেই পসন্দ করতেন না।[৬]

আরবে শিরকের প্রধান উপকরণ ও কেন্দ্র ছিল মূর্তি। প্রতিটি বাড়ী, এমনকি প্রতিটি ঘরেই মূর্তি শোভা পেত। কিন্তু মহিলা সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেকটি সুযোগে মূর্তির সাথে তাঁদের নেতিবাচক সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। হিন্দ বিন্‌ত উতবা (রা) ঈমান আনার পর তাঁর ঘরে যে মূর্তি ছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। তারপর মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমরা তোর ব্যাপারে বড় ধোঁকার মধ্যে ছিলাম"।[৭]

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ তালহা (রা) যখন উম্মু সুলাইমকে (রা) বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি বললেন : 'আবূ তালহা! তোমার কি একথা জানা আছে, যে খোদার

---

৪. তাবাকাত-৮/১৫৪; নিসা' হাওলার রাসূল-২৪৫
৫. উসুদুল গাবা, খণ্ড-৫ (যিন্নীরা)
৬. আদাবুল মুফরাদ : বাবু আত-তায়র
৭. তাবাকাত, খণ্ড-৮ (হিন্দ বিনত 'উতবা)

তুমি পূজা করো তা একটি কাঠের তৈরী মূর্তি, সেই গাছ মাটিতে জন্মেছিল এবং অমুক হাবশী দাস সেটি কেটে মূর্তি তৈরী করেছিল?' আবূ তালহা বললেন : 'সেকথা আমার জানা আছে।' উম্মু সুলাইম বললেন : 'তাহলে তার পূজা করতে তোমার লজ্জা হয় না?' যতক্ষণ পর্যন্ত আবূ তালহা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করেননি, উম্মু সুলাইম (রা) তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হননি।[৮]

ইসলামের প্রথম যুগের এই সুযোগ্য মহিলারা তাঁদের সন্তানদেরকে এমন যোগ্য করে গড়ে তোলেন যে, বিশ্ববাসী অবাক-বিস্ময়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাঁরা ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। তাঁরা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, মোটকথা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এমন সব উদাহরণ পেশ করেন যা আজো মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। যেমন : আসমা' বিন্‌ত আবী বকর ও তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর, ফাতিমা বিনত আসাদ ও তাঁর ছেলে 'আলী (রা), আন-নাওয়ার বিন্‌ত মালিক ও তাঁর ছেলে যায়দ ইবন ছাবিত, সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব ও তাঁর ছেলে জা'ফর, উম্মু আইমান ও তাঁর ছেলে উসামা (রা) এবং আরো অনেকে।

এই মহিয়সী নারীগণ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ)-এর দায়িত্বও সে যুগে পালন করেছেন।

শিক্ষায়ও মহিলারা পুরুষের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে থাকেননি। অসংখ্য 'আলিম পুরুষ সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। তবে তার পাশাপাশি মহিলাদের সংখ্যাও কম নয়। সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছ যে সাতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন তার সপ্তমজন মহিলা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা)। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, শরী'আতের হুকুম-আহকামের ইসতিমবাত ও ইজতিহাদে মহিলারা পুরুষের মতই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে যে ইসলাম সমানভাবে দেখার নির্দেশ-দিয়েছে, কেবল পুরুষগণই তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেননি। বরং মহিলাগণও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। উহুদ যুদ্ধে হামযা (রা) শহীদ হলেন। সাফিয়্যা (রা)-হামযার বোন ও রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু, ভাইয়ের কাফনের জন্য দুই খণ্ড কাপড় নিয়ে এলেন। দেখলেন হামযার (রা) লাশের পাশে আরেকজন আনসারী ব্যক্তির নগ্ন লাশ পড়ে আছে। ইসলাম সাফিয়্যার মধ্যে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি

---

৮. তাবাকাত, খণ্ড-৮ (উম্মু সুলাইম)

করেছিল তা এই নগ্ন আনসারীর লাশকে উপেক্ষা করতে পারলো না। তিনি একখানা কাপড় এই আনসারীর কাফনের জন্য দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কোনটি দেবেন? কার'আর (লটারী) মাধ্যমে তা নির্ধারণ করেন। এভাবে তিনি সাম্য ও সমতার প্রতীকে পরিণত হন।[৯]

ইসলামের সেবায় ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন কি কেবল পুরুষরা? না, তা নয়। আমরা আবূ বকর (রা), 'উছমান (রা) ও অন্যদের দানের কথা জানি। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) অঢেল সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভুলি কি করে? একদিন মদীনায় রাসূল (সা) একটি ঈদের সমাবেশে দান-খায়রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। উক্ত সমাবেশে মহিলারাও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের হাতের বালা, কানের দুল, গলার হার, হাতের আংটি খুলে খুলে রাসূলে কারীমের (সা) হাতে তুলে দেন। আসমার (রা) ছিল একটি মাত্র দাসী। তিনি সেটি বিক্রী করে সকল অর্থ ফী সাবীলিল্লাহ দান করেন। উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) নিজ হাতে চামড়া দাবাগাত করতেন এবং তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

যুদ্ধের ময়দানেও কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবীকে উপস্থিত দেখা যায়। তাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাফিয়্যা (রা) তো এক ইহুদীর মাথা কেটে ছুড়ে মারেন। এই বীরাঙ্গনাদের মধ্যে উম্মু সুলাইমের (রা) নামটিও শোভা পায়। হুনাইন যুদ্ধে খঞ্জর হাতে উম্মু সুলাইম (রা) দাঁড়িয়ে, রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এ খঞ্জর দিয়ে কি করবে? বললেন : শত্রু নিধন করবো।

ঈছার তথা অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দান করা সর্বযুগের সকল মানুষের নিকট নৈতিকতার উচ্চতম স্তরের গুণ বলে স্বীকৃত। এ গুণ অর্জন করা অত সোজা নয়। পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে এ গুণের বিকাশ ব্যাপকভাবে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। জীবনের অন্তিম ক্ষণে এক ঢোক পানি নিজে পান না করে পাশে আহত আরেক ভাইকে দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছেন, তিনি আবার অন্যকে দেওয়ার ইঙ্গিত করছেন। এভাবে একগ্লাস পানি তিনজনের নিকট ঘুরে আবার যখন প্রথমজনের নিকট আসে তখন দেখা যায় তিনি আর বেঁচে নেই। এভাবে একে একে পরবর্তী দুইজনের একই পরিণতি হয়। তিনজনের প্রত্যেকেই নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা পুরুষ সাহাবীদের জীবনের একটি চিত্র।

---

৯. আল-মুফাসসাল ফী আহকাম আল-মারআতি ওয়াল বায়ত আল-মুসলিম-৪/৩৫৮, ৩৫৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩৫

এ ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীরাও কিন্তু পিছিয়ে ছিলেন না। এ গুণটির ব্যাপক বিকাশ তাঁদের মধ্যেও ঘটেছিল। আয়িশা (রা) একদিন রোযা আছেন। ইফতারের জন্য ঘরে কেবল এক টুকরো রুটি আছে। ইফতারের আগে এক দুঃস্থ মহিলা এসে কিছু খেতে চায়। তিনি দাসীকে রুটির টুকরোটি তাকে দিতে বলেন। দাসী বলে, আপনি ইফতার করবেন কিভাবে? বললেন, 'রুটির টুকরোটি তাকে দাও, ইতফারের কথা পরে চিন্তা করা যাবে।'

একদিন রাসূল (সা) বললেন, যে আজ রাতে এই লোকটিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে যাবে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন। আবূ তালহা (রা) তাকে সংগে করে বাড়ীতে এলেন। বাড়ীতে সেদিন ছোট ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না। তাই স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রা) ভুলিয়ে ভালিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন। তারপর যে সামান্য খাবার ছিল তা মেহমানের সামনে হাজির করেন। এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে নিজেরা খাবার না খেয়ে বসে থাকেন, আর মেহমান তা বুঝতে না পেরে পেট ভরে আহার করেন।

এই মহিলা সাহাবীগণ সত্য উচ্চারণে কারো চোখ রাঙ্গানি ও ভীতি প্রদর্শনকে পরোয়া করেননি। উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া (রা) যখন 'আয়িশার (রা) সংগে দেখা করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে তাঁর কিছু কাজের জন্য তিরস্কার করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) ঘাতক স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আসমার (রা) সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এমনকি তাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেন। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক একদিন রাতে তাঁর এক চাকরকে কোন ত্রুটির কারণে অভিশাপ দেন। ঘটনাক্রমে সে রাতে প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুদ দারদা (রা) খলীফার মহলে অবস্থান করছিলেন। সকালে তিনি খলীফাকে ডেকে বলেন, গত রাতে তুমি চাকরকে অভিশাপ দিয়েছো। অথচ রাসূল (সা) কাউকে অভিশাপ দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। খলীফা লজ্জিত হন।

এভাবে জীবনের একেকটি দিক যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহিলা সাহাবীগণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানভাবে এগিয়ে গেছেন। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৬ষ্ঠ খণ্ডে আমরা তাঁদের জীবনের এ সকল দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, সাহাবায়ে কিরাম, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে অনেকের ইসলামী জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁদের জীবনের বেশী সময় কেটেছে জাহিলী যুগে। তাই তাঁদের জীবনের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না। মানব জাতির ইতিহাসের বিস্ময়কর নায়ক 'উমারের (রা) জাহিলী জীবনের

দু'একটি ঘটনা ছাড়া পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে অন্যদের ইসলাম-পূর্ব জীবন কতটুকু জানা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা মহিলা সাহাবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ইতিহাস রচনা করতে পারিনি। কারণ, সে তথ্য আমাদের হাতে নেই। যেটুক আমরা করেছি, তা তাঁদের জীবনের একটি খণ্ডচিত্র বলা যেতে পারে। তবে এসব চিত্র যেন এককেটি আলোর ঝলক। যুগে যুগে মুসলিম মহিলারা সেই আলোতে পথ চলার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষা-ভাষী মহিলারাও যাতে মহিলা সাহাবীদের জীবনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের অনুসরণ করতে পারেন, এই লক্ষ্যে আমাদের এ প্রয়াস। পাঠক-পাঠিকাগণ যদি এ লেখা দ্বারা সামান্য উপকার পান তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আরেকটি কথা যা না বললেই নয়, তা হলো আসহাবে রাসূলের জীবনকথা লেখার পরিকল্পনা আসলে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ সাহেবের। বেশ কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে লেখার জন্য তিনি উৎসাহিত করেন। সেই যে শুরু করেছি, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আমার প্রতিটি ধাপে তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন– এই দু'আ করি।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাদের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা লেখককে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর মর্জি মত কাজ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

২৩ ডিসেম্বর ২০০৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর
আরবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে সায়্যিদা যায়নাব (রা)- যিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী বর্ণনা করেছেন :[১]

هِيَ خَيْرُ بَنَاتِيْ أُصِيْبَتْ فِيَّ.

'সে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে। আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।'

হযরত যায়নাবের (রা) সম্মানিতা জননী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)। যিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনার অনন্য গৌরবের অধিকারিণী। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা এত বিশাল যে বিগত উম্মাত সমূহের মধ্যে কেবল হযরত মারইয়ামের (আ) সাথে যা তুলনীয়।

ইমাম আজ-জাহাবী বলেন :[২]

زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَأَكْبَرُ أَخْوَاتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ السَّيِّدَاتِ.

'যায়নাব হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে এবং তাঁর হিযরাতকারিণী সায়্যিদাত বোনদের মধ্যে সবার বড়।'

আবু 'আমর বলেন, যায়নাব (রা) তাঁর পিতার মেয়েদের মধ্যে সবার বড়। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। আর যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁরা ভুলের মধ্যে আছেন। তাদের দাবীর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের কোন হেতু নেই। তবে মতপার্থক্য যে বিষয়ে আছে তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যায়নাব প্রথম সন্তান, না কাসিম? বংশবিদ্যা বিশারদদের একটি দলের মতে আল-কাসিম প্রথম ও যায়নাব দ্বিতীয় সন্তান। ইবনুল কালবী যায়নাবকে (রা) প্রথম সন্তান বলেছেন। ইবনে সা'দের মতে, যায়নাব (রা) মেয়েদের মধ্যে সবার বড়।[৩] ইবন হিশাম রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের ক্রমধারা এভাবে সাজিয়েছেন :[৪]

أَكْبَرُ بَنِيْهِ الْقَاسِمُ، ثُمَّ الطَّيِّبُ، ثُمَّ الطَّاهِرُ، وَأَكْبَرُ بَنَاتِهِ رُقَيَّةُ، ثُمَّ زَيْنَبُ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُوْمَ، ثُمَّ فَاطِمَةُ.

---

১. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭২
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬
৩. তাবাকাত-৮/৩০
৪. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-১/১৯০

'রাসূলুল্লাহর (সা) বড় ছেলে আল কাসিম, তারপর যথাক্রমে আত-তায়্যিব ও আত-তাহির। আব বড় মেয়ে রুকাইয়্যা, তারপর যথাক্রমে যায়নাব, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা।'

পিতা মুহাম্মাদ (সা)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে হযরত যায়নাবের (রা) জন্ম হয়। তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বয়স তিরিশ এবং মাতা হযরত খাদীজার (রা) পঁয়তাল্লিশ বছর। হযরত যায়নাবের (রা) শৈশব জীবনের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর এ জীবনটি সম্পূর্ণ অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে যতটুকু যা জানা যায় তা তাঁর বিয়ের সময় থেকে।

রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ে অল্প বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। তখনও পিতা মুহাম্মাদ (সা) নবী হননি।[৫] ইমাম আজ- জাহাবী এ মত গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলেন :[৬]

ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الْعَاصِ تَزَوَّجَ بِزَيْنَبَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَهٰذَا بَعِيْدٌ.

'ইবন সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আ'স যায়নাবকে বিয়ে করেন নবুওয়াতের পূর্বে। এ এক অবাস্তব কথা।'

যাই হোক স্বামী আবুল 'আস ইবন আর-রাবী' ইবন আবদুল 'উয্যা ছিলেন যায়নাবের খালাতো ভাই। মা হযরত খাদীজার (রা) আপন ছোট বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদের ছেলে।[৭]

বিয়ের সময় বাবা-মা মেয়েকে যে সকল উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইয়ামনী আকীকের একটি হারও ছিল। হারটি দিয়েছিলেন মা খাদীজা (রা)।[৮]

পিতা মুহাম্মাদ (সা) ওহী লাভ করে নবী হলেন। মেয়ে যায়নাব (রা) তাঁর মার সাথে মুসলমান হলেন। স্বামী আবুল 'আস তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। পরে হযরত যায়নাব (রা) স্বামীকে মুশরিক অবস্থায় মক্কায় রেখে মদীনায় হিজরাত করেন।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব (রা) ও আবুল 'আসের মধ্যের গভীর সম্পর্ক এবং ভদ্রোচিত কর্মপদ্ধতির প্রায়ই প্রশংসা করতেন।[১০]

আবুল 'আস যেহেতু শিরকের উপর অটল ছিলেন, এ কারণে ইসলামের হুকুম অনুযায়ী উচিত ছিল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু রাসূল (সা) মক্কায় সে সময় শক্তিহীন ছিলেন। ইসলামী শক্তি তেমন মজবুত ছিল না। তাছাড়া কাফিরদের জুলুম-

---

৫. তাবাকাত-৮/৩০-৩১
৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬
৭. তাবাকাত-৮/৩১
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত-৮/৩২
১০. সুনানু আবী দাউদ-১/২২২

অত্যাচারের প্লাবন সবেগে প্রবহমান ছিল। এদিকে ইসলামের প্রচার প্রসারের গতি ছিল মন্থর ও প্রাথমিক পর্যায়ের। এসকল কারণে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটানোই রাসূল (সা) সমীচীন মনে করেন।

আবুল 'আস স্ত্রী যায়নাবকে (রা) অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন কবুল করতে কোনভাবেই রাজী হলেন না। এ অবস্থা চলতে লাগলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গেল। কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো : 'তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের বিয়ে করে তার দুশ্চিন্তা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো। তোমরা যদি এ সকল মেয়েকে তার কাছে ফেরত পাঠাতে তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো।' তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা সমর্থন করে বললো– 'এ তো অতি চমৎকার যুক্তি।' তারা দল বেঁধে আবুল 'আসের কাছে যেয়ে বললো, 'আবুল 'আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার পরিবর্তে তুমি যে কুরাইশ সুন্দরীকে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।' আবুল 'আস বললেন, 'আল্লাহর কসম! না তা হয়না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। তার পরিবর্তে সকল নারী আমাকে দিলেও আমার তা পসন্দ নয়।' একারণে রাসূল (সা) তাঁর আত্মীয়তাকে খুব ভালো মনে করতেন এবং প্রশংসা করতেন।[১১]

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ত্যাগের অবস্থা নিম্নের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

নবুওয়াতের ১৩তম বছরে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। হযরত যায়নাব (রা) স্বামীর সাথে মক্কায় থেকে যান।[১২] কুরাইশদের সাথে মদীনার মুসলমানদের সামরিক সংঘাত শুরু হলো। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে সমবেত হলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবুল 'আস কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন। কারণ, কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যে স্থান তাতে না যেয়ে উপায় ছিলনা। বদরে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা বন্দী হয়। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এই বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী আবুল 'আসও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইবন নু'মান (রা) তাঁকে বন্দী করেন। তবে আল-ওয়াকিদীর মতে হযরত খিরাশ ইবন আস-সাম্মাহর (রা) হাতে তিনি বন্দী হন।[১৩]

---

১১. তাবারী-৩/১৩৬; ইবন হিশাম, আস্-সীরাহ-১/৬৫২
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯
১৩. আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা-৪/১২২

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধনী-দরিদ্র প্রভেদ অনুযায়ী একহাজার থেকে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হলো। বন্দীদের প্রতিনিধিরা ধার্যকৃত মুক্তিপণ নিয়ে মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি শুরু করে দিল। নবী দুহিতা হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসের মুক্তিপণসহ মদীনায় লোক পাঠালেন। আল-ওয়াকিদীর মতে আবুল 'আসের মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় এসেছিল তাঁর ভাই 'আমর ইবন রাবী'। হযরত যায়নাব মুক্তিপণ দিরহামের পরিবর্তে একটি হার পাঠিয়েছিলেন। এই হারটি তাঁর জননী হযরত খাদীজা (রা) বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হারটি দেখেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং নিজের বিষণ্ন মুখটি একখানি পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। জান্নাতবাসিনী প্রিয়তমা স্ত্রী ও অতি আদরের মেয়ের স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন : 'যায়নাব তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে এই হারটি পাঠিয়েছে। তোমরা ইচ্ছে করলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পার এবং হারটিও তাকে ফেরত দিতে পার।' সাহাবীরা বললেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো।' সাহাবীরা রাজী হয়ে গেলেন। তাঁরা আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন, আর সেইসাথে ফেরত দিলেন তাঁর মুক্তিপণের হারটি। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল 'আসের নিকট থেকে এ অঙ্গিকার নিলেন যে মক্কায় ফিরে অনতিবিলম্বে সে যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবকে (রা) নেওয়ার জন্য আবুল 'আসের সংগে হযরত যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) পাঠান। তাঁকে 'বাতান' অথবা 'জাজ' নামক স্থানে অপেক্ষা করতে বলেন! যায়নাব (রা) মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছলে তাঁকে নিয়ে মদীনায় চলে আসতে বলেন। আবুল 'আস মক্কায় পৌঁছে যায়নাবকে (রা) মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দান করেন।

হযরত যায়নাব (রা) সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় হিন্দ বিনত 'উতবা এসে হাজির হলো। প্রস্তুতি দেখে বললো : মুহাম্মাদের মেয়ে, তুমি কি তোমার বাপের কাছে যাচ্ছো? যায়নাব (রা) বললেন, এই মুহূর্তে তো তেমন উদ্দেশ্য নেই, তবে ভবিষ্যতে আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়। হিন্দ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললো : বোন, এটা গোপন করার কি আছে। সত্যিই যদি তুমি যাও, তাহলে পথে দরকার পড়ে এমন কোন কিছু প্রয়োজন হলে রাখঢাক না করে বলে ফেলতে পার, আমি তোমার খিদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

মহিলাদের মধ্যে শত্রুতার সেই বিষাক্ত প্রভাব তখনও বিস্তার লাভ করেনি যা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে হযরত যায়নাব (রা) বলেন : হিন্দ যা বলেছিল, অন্তরের কথাই বলেছিল। অর্থাৎ আমার যদি কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো, তাহলে অবশ্যই সে তা পূরণ করতো। কিন্তু সে সময়ের অবস্থা চিন্তা করে আমি অস্বীকার করি।[১৫]

---

১৪. ইবন হিশাম-১/৬৫৩; তাবাকাত-৮/৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬
১৫. তাবারী-১/১২৪৭; ইবন হিশাম-১/৬৫৩-৫৪

হযরত যায়নাব (রা) কিভাবে মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন সে সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থসমূহে নানা রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইবন ইসহাক বলেন, সফরের প্রস্তুতি শেষ হলে যায়নাবের (রা) দেবর কিনানা ইবন রাবী' একটি উট এনে দাঁড় করালো। যায়নাব উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলেন। আর কিনানা স্বীয় ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি হাতে নিয়ে দিনে দুপুরে উট হাঁকিয়ে মক্কা থেকে বের হলো। কুরাইশদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা ধাওয়া করে মক্কার অদূরে 'জী-তুওয়া' উপত্যকায় তাঁদের দুই জনকে ধরে ফেললো। কিনানা কুরাইশদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁধের ধনুকটি হাতে নিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললো : তোমাদের কেউ যায়নাবের নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার সিনা হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল। কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তার নিক্ষিপ্ত কোন তীর সচরাচর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তার এ হুমকী শুনে আবু সুফইয়ান ইবন হারব তার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললো :

'ভাতিজা, তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করে রেখেছো তা একটু ফিরাও। আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।' কিনানা তীরটি নামিয়ে নিয়ে বললো, কি বলতে চান, বলে ফেলুন। আবু সুফইয়ান বললো :

'তোমার কাজটি ঠিক হয়নি। তুমি প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে মানুষের সামনে দিয়ে যায়নাবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা বসে বসে তা দেখছি। গোটা আরববাসী জানে বদরে আমাদের কী দুর্দশা ঘটেছে এবং যায়নাবের বাপ আমাদের কী সর্বনাশটাই না করেছে। তুমি যদি এভাবে প্রকাশ্যে তার মেয়েকে আমাদের নাকের উপর দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সবাই আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে এবং এ কাজটি আমাদের জন্য অপমান বলে বিবেচনা করবে। তুমি আজ যায়নাবকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কিছুদিন সে স্বামীর ঘরে থাকুক। এদিকে লোকেরা যখন বলতে শুরু করবে যে, আমরা যায়নাবকে মক্কা থেকে যেতে বাধা দিয়েছি, তখন একদিন তুমি গোপনে তাঁকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিও।'[১৬]

কিনানা আবু সুফইয়ানের কথা মেনে নিয়ে যায়নাবসহ মক্কায় ফিরে এল। যখন ঘটনাটি মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, তখন একদিন রাতের অন্ধকারে সে আবার যায়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো এবং ভাইয়ের নির্দেশ মত নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিনিধির হাতে তুলে দিল। যায়নাব (রা) হযরত যায়দ ইবন হারিছার (রা) সাথে মদীনায় পৌঁছলেন।[১৭]

তাবারানী 'উরওয়া ইবন যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যায়নাব বিন্‌ত রাসূলুল্লাহকে (সা) সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলে কুরায়শদের দুই ব্যক্তি[১৮] পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। তারা যায়নাবের (রা) সংগী লোকটিকে কাবু করে যায়নাবকে (রা) উটের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি একটি পাথরের উপর ছিটকে পড়লে শরীর

---

১৬. আল-বিদায়া-৩/৩৩০; ইবন হিশাম-১/৬৫৪-৫৫

১৭. তাবারী-১/১২৪৯; যুরকানী : শারহুল মাওয়াহিব-৩/২২৩'

ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা যায়নাবকে (রা) মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট নিয়ে যায়। আবু সুফইয়ান তাঁকে বনী হাশিমের মেয়েদের কাছে সোপর্দ করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। উঠের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তিনি যে আঘাত পান, আমরণ সেখানে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সেই ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য তাঁকে শহীদ মনে করা হতো।[১৯]

হযরত 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে যায়নাব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যায়নাবকে ধরে ফেললো। সে যায়নাবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে সন্তান সম্ভাবা ছিল। এই আঘাতে তার গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বানু হাশিম ও বানু উমাইয়্যা তাঁকে নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিল। অবশেষে সে হিন্দ বিন্ত 'উতবার নিকট থাকতে লাগলো। হিন্দ প্রায়ই তাকে বলতো, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যেই হয়েছে।[২০]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইবন হারিছাকে বললেন, তুমি কি যায়নাবকে আনতে পারবে? যায়দ রাজি হলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যায়দকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও, যায়নাবের কাছে পৌঁছাবে।' আংটি নিয়ে যায়দ মক্কার দিকে চললো। মক্কার উপকণ্ঠে সে এক রাখালকে ছাগল চরাতে দেখলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার রাখাল? বললো, 'আবুল 'আসের'। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছাগলগুলি কার?' বললো, 'যায়নাব বিন্ত মুহাম্মাদের।' যায়দ কিছুদূর রাখালের সাথে

---

১৮. সেই দুই ব্যক্তির একজন হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ। সে ছিল হযরত খাদীজার (রা) চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। তাই সম্পর্কে সে যায়নাবের মামাতো ভাই। আর দ্বিতীয়জন ছিল নাফে' ইবন 'আবদি কায়স অথবা খালিদ ইবন 'আবদি কায়স। তাদের এমন অহেতুক বাড়াবাড়িমূলক আচরণের জন্য রাসূল (সা) ভীষণ বিরক্ত হন। তাই তিনি নির্দেশ দেন :

إنْ ظَفِرْتُمْ بِهَبَّار بْنِ الاَسْوَدِ وَالرَّجُل الَّذِىْ سَبَقَ مَعَه إلى زَيْنَبَ ، فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّار.

'যদি তোমরা হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ ও সেই ব্যক্তিটি যে তার সাথে যায়নাবের দিকে এগিয়ে যায়, হাতের মুঠোয় পাও, তাহলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে।' কিন্তু পরদিন তিনি আবার বলেন :

إنِّى كُنْتُ أمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إنْ أخَذْتُمُوْهُمَا ، ثُمَّ رَأيْتُ أنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لاَحَدٍ أنْ يُعَذِّبَ بِالنَّار إلاَّ اللهُ ، فَإنْ ظَفِرْتُمْ فَاقْتُلُوْهُمَا.

'আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমরা এ দুই ব্যক্তিকে ধরতে পার, আগুনে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তাই তোমরা যদি তাদেরকে ধরতে পার, হত্যা করবে।' কিন্তু পরে তারা মুসলমান হয় এবং রাসূল (সা) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ : বাবু লা ইউ'য়াজ্জাবু বিআজাবিল্লাহ; আল-ইসাবা : হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ, ৩য় খণ্ড; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৫৭, ৩৯৮, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৭; ইবন হিশাম-১/৬৫৭)

১৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১

২০. ইবন হিশাম-১/৬৫৪

চললো। তারপর তাকে বললো, 'আমি যদি একটি জিনিস তোমাকে দিই, তুমি কি তা যায়নাবের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?' রাখাল রাজি হলো। যায়দ তাকে আংটিটি দিল, আর রাখাল সেটি যায়নাবের হাতে পৌঁছে দিল।

যায়নাব রাখালকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটি তোমাকে কে দিয়েছে?' বললো, 'একটি লোক'। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে কোথায় ছেড়ে এসেছো?' বললো, অমুক স্থানে।' যায়নাব চুপ থাকলো। রাতের আঁধারে যায়নাব চুপে চুপে সেখানে গেল। যায়দ তাকে বললো, 'তুমি আমার উটের পিঠে উঠে আমার সামনে বস।' যায়নাব বললো, 'না, আপনিই আমার সামনে বসুন।' এভাবে যায়নাব যায়দের (রা) পিছনে বসে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই বলতেন, 'আমার সবচেয়ে ভালো মেয়েটি আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করেছে।'[২১] সীরাতের গ্রন্থসমূহে হযরত যায়নাবের (রা) মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছার ঘটনাটি একাধিক সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

যেহেতু তাঁদের দুইজনের মধ্যের সম্পর্ক অতি চমৎকার ছিল, এ কারণে হযরত যায়নাবের (রা) মদীনায় চলে যাওয়ার পর আবুল 'আস বেশীর ভাগ সময় খুবই বিমর্ষ থাকতেন। একবার তিনি যখন সিরিয়া সফরে ছিলেন তখন যায়নাবের (রা) কথা স্মরণ করে নিম্নের পংক্তি দুইটি আওড়াতে থাকেন :[২২]

ذَكَرْتُ زَيْنَبَ لَمَّا وَرَكَتْ أَرِمًا + فَقُلْتُ سُقْيًا لِشَخْصٍ يَسْكُنُ الْحَرَمَا

بِنْتُ الْأَمِيْنِ جَزَاهَا اللّٰهُ صَالِحَةً + وَكُلُّ بَعْلٍ يُثْنِيْ بِالَّذِيْ عَلِمَا

"যখন আমি 'আরিম' নামক স্থানটি অতিক্রম করলাম তখন যায়নাবের কথা মনে হলো। বললাম, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সজীব রাখুন যে হারামে বসবাস করছেন। আমীন মুহাম্মাদের (সা) মেয়েকে আল্লাহ তা'আলা ভালো প্রতিদান দিন। আর প্রত্যেক স্বামী সেই কথার প্রশংসা করে যা তার ভালো জানা আছে।"

মক্কার কুরায়শদের যে বিশেষ গুণের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে— 'রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াস সাঈফ'— শীতকালে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে তাদের বাণিজ্য কাফিলা চলাচল করে— আবুল 'আসের মধ্যেও এ গুণটির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মক্কা ও শামের মধ্যে সবসময় তাঁর বাণিজ্য কাফিলা যাতায়াত করতো। তাতে কমপক্ষে একশো উটসহ দুইশো লোক থাকতো। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, সততা ও আমানতদারীর জন্য মানুষ তাঁর কাছে নিজেদের পণ্যসম্ভার নিশ্চিন্তে সমর্পণ করতো। ইবন ইসহাক বলেন, 'অর্থ-বিত্ত, আমানতদারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মক্কার গণমান্য মুষ্টিমেয় লোকদের অন্যতম ছিলেন।'[২৩]

স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল 'আস মক্কায় কাটাতে লাগলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ

২১. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১-৭২
২২. তাবাকাত-৮/৩২; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৮
২৩. আল-ইসাবা-৪/১২২

সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে তিনি কুরাইশদের ১৭০ উটের একটি বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে সিরিয়া যান। বাণিজ্য শেষে মক্কায় ফেরার পথে কাফিলাটি যখন মদীনার কাছাকাছি স্থানে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) খবর পেলেন। তিনি এক শো সত্তর সদস্যের একটি বাহিনীসহ যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) পাঠালেন কাফিলাটিকে ধরার জন্য। 'ঈস নামক স্থানে দুইটি দল মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী কুরায়শ কাফিলার বাণিজ্য সম্ভারসহ সকল লোককে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। তবে আবুল 'আসকে ধরার জন্য তারা তেমন চেষ্টা চালালো না। তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।[২৪]

অবশ্য মূসা ইবন 'উকবার মতে, আবু বাসীর ও তাঁর বাহিনী আবুল 'আসের কাফিলার উপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, এই আবু বাসীর ও আরও কিছু লোক হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সন্ধির শর্তানুযায়ী মদীনাবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। ফলে মক্কা থেকে পালিয়ে তাঁরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে মক্কার বাণিজ্য কাফিলার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে লুটপাট করতে থাকেন। তাঁরা কুরায়শদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের ভয়ে কুরায়শদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে মক্কার কুরায়শরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করে।[২৫]

যাই হোক, আবুল 'আস তাঁর কাফিলার এ পরিণতি দেখে মক্কায় না গিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং সোজা যায়নাবের (রা) কাছে পৌঁছে আশ্রয় চাইলেন। যায়নাব তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। কেউ কিছুই জানলো না।[২৬]

রাত কেটে গেল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর তাহরীমা বেঁধেছেন। পিছনের মুকতাদীরাও তাকবীর তাহরীমা শেষ করেছে। এমন সময় পিছনে মেয়েদের কাতার থেকে যায়নাবের (রা) কণ্ঠস্বর ভেসে এলো— 'ওহে জনমণ্ডলী, আমি মুহাম্মাদের (সা) কন্যা যায়নাব। আমি আবুল 'আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাঁকে নিরাপত্তা দিন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনেছো?"

লোকেরা জবাব দিল, 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, আমি এ ঘটনার কিছুই জানিনে। কী অবাক কাণ্ড! মুসলমানদের একজন দুর্বল সদস্যাও শত্রুকে নিরাপত্তা দেয়। সে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে।'[২৭]

---

২৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৭, ৩৯৯-৪০০; তাবাকাত-৮/৩৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯
২৫. আল-ইসাবা-৪/১২২
২৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৭, ৩৯৯
২৭. প্রাগুক্ত-১/৩৯৯-৪০০; তাবাকাত-৮/৩৩

অতঃপর রাসূল (সা) ঘরে গিয়ে মেয়েকে বললেন, 'আবুল আসের থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখ তুমি আর তার জন্য হালাল নও। যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে। হযরত যায়নাব (রা) পিতার কাছে আবেদন জানালেন আবুল 'আসের কাফিলার লোকদের অর্থসম্পদসহ মুক্তিদানের জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বাহিনীর লোকদের ডাকলেন যারা আবুল 'আসের কাফিলার উট ও লোকদের ধরে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের বললেন, 'আমার ও আবুল 'আসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তোমরা জান। তোমরা তার বাণিজ্য সম্ভার আটক করেছো। তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফেরত দিলে আমি খুশী হবো। আর তোমরা রাজী না হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে তোমরা তা ভোগ করতে পার। তোমরাই সেই মালের বেশী হকদার।' তারা বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তার সবকিছু ফেরত দিচ্ছি।'[২৮]

আবুল 'আস চললেন তাদের সাথে মালামাল বুঝে নিতে। পথে তারা আবুল 'আসকে বললো, শোন আবুল 'আস, কুরায়শদের মধ্যে তুমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং তাঁর মেয়ের স্বামী। তুমি এক কাজ কর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এ মালামালসহ মদীনায় থেকে যাও। বেশ আরামে থাকবে। আবুল 'আস বললেন, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি আমার নতুন দ্বীনের জীবন শুরু করবো শঠতার মাধ্যমে?[২৯]

আবুল 'আস তাঁর কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। মক্কায় প্রত্যেকের মাল বুঝে দিয়ে তিনি বললেন, 'হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! আমার কাছে তোমাদের আর কোন কিছু পাওনা আছে কি?' তারা বললো না। আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমরা তোমাকে একজন চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী রূপে পেয়েছি।

আবুল 'আস বললেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা করছি– আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর একজন বান্দা ও রাসূল। মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিইনি এ জন্যে যে, তোমরা ধারণা করতে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন করেছি। আল্লাহ যখন তোমাদের যার যার মাল ফেরত দানের তাওফীক আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।'

এ হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম মাসের ঘটনা। এরপর হযরত আবুল 'আস (রা) জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন।[৩০]

---

২৮. ইবন হিশাম-১/৬৫৮; তাবাকাত-৮/৩৩

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্মানের সাথে আবুল 'আসকে (রা) গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বিয়ের প্রথম 'আকদের ভিত্তিতে স্ত্রী যায়নাবকেও (রা) তাঁর হাতে সোপর্দ করেন।[৩১]

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে তাঁর পৌত্তলিক অবস্থায় মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। পরে আবুল 'আস যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলেন তখন রাসূল (সা) যায়নাবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম 'আকদের ভিত্তিতে যায়নাবকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন, না আবার নতুন 'আকদ হয়েছিল? এ ব্যাপারে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন :[৩২]

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ إِبْنَتَهُ اِلى أَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سِنِيْنَ بِنِكَاحِهَا الاَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ صُدَاقًا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মেয়েকে অনেক বছর পর প্রথম বিয়ের ভিত্তিতে আবুল 'আসের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং কোন রকম নতুন মাহর ধার্য করেননি।'

ইমাম শা'বী বলেন :[৩৩]

اَسْلَمَتْ زَيْنَبُ وَهَاجَرَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ بَعْدَ ذلِكَ وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

'যায়নাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাতও করেন। তারপর আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাননি।'

এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তখনও পর্যন্ত সূরা আল-মুমতাহিনার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়নি :[৩৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ، اَللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ، لاَهُنَّ حِلٌ لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ.

"মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্যে হালাল নয়।"

এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, যে নারী কোন কাফির পুরুষের স্ত্রী ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিয়ে কাফিরের সাথে আপনা-আপনি বাতিল হয়ে গেছে। এখন তারা একে অপরের জন্যে হারাম।

---

৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯; আল ইসাবা-৪/৩১২,

৩২. ইবন হিশাম-১/৬৫৮-৫৯; তিরমিজী (১১৪৩); ইবন মাজাহ (২০০৯); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯

৩৩. তাবাকাত-৮/৩২

৩৪. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০

একই ধরনের কথা হযরত কাতাদাও বলেছেন। তিনি বলেন :[৩৫]

ثُمَّ أُنْزِلَتْ (بَرَاءَةٌ) بَعْدُ فَإِذَا أَسْلَمَتْ إِمْرَاةٌ قَبْلَ زَوْجِهَا، فَلَاسَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلَّا بِخِطْبَةٍ.

'এ ঘটনার পরে নাযিল হয় সূরা 'আল-বারায়াত'। অতঃপর কোন স্ত্রী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে নতুন করে 'আকদ ছাড়া স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন প্রকার অধিকার থাকতো না।'

কিন্তু তার পূর্বে মুসলিম নারীরা স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর নতুন 'আকদ ছাড়াই স্বামীর কাছে ফিরে যেতেন।[৩৬]

তবে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে :[৩৭]

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيْدٍ.

'নবী (সা) নতুন বিয়ে ও নতুন মাহরের ভিত্তিতে যায়নাবকে আবুল 'আসের নিকট প্রত্যর্পণ করেন।' ইমাম আহমাদ বলেন : এটি একটি দুর্বল হাদীছ।

সনদের দিক দিয়ে ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনাটি যদিও অপর বর্ণনাটির উপর প্রাধান্যযোগ্য, তবুও ফকীহরা দ্বিতীয়বার 'আকদের বর্ণনাটির উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনাটির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যেহেতু দ্বিতীয় 'আকদের সময় মাহর ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ছিল, তাই তিনি প্রথম 'আকদ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় এ ধরনের বিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার 'আকদ অপরিহার্য। ইমাম সুহায়লীও এরূপ কথা বলেছেন।[৩৮]

হযরত যায়নাব (রা) পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) ও স্বামী আবুল 'আস (রা)— উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ভালো দামী কাপড় পরতে আগ্রহী ছিলেন। হযরত আনাস (রা) একবার তাঁকে একটি রেশমী চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। চাদরটির পাড় ছিল হলুদ বর্ণের।[৩৯]

হযরত আবুল 'আসের (রা) ঔরসে হযরত যায়নাবের (রা) দুইটি সন্তান জন্মলাভ করে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলে 'আলী হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন 'আলী নানার উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। বালেগ হওয়ার পূর্বে পিতা আবুল 'আসের (রা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।[৪০]

---

৩৫. তাবাকাত-৮/৩২
৩৬. আল-ইসাবা-৪/৩১২
৩৭. তিরমিজী (১১৪২); তাবাকাত-৮/৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৮
৩৮. ইবন হিশাম (টীকা)-১/৬৫৭
৩৯. তাবাকাত-৮/৩৩-৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫০
৪০. আল-আ'লাম-৩/৬৭

কিন্তু ইবন 'আসাকিরের একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, 'আলী ইয়ারমূক যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪১] মেয়ে উমামা (রা) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসের (রা) সাথে পুনর্মিলনের পর বেশীদিন বাঁচেননি। এক বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশীদিন মদীনায় স্বামীর সাথে কাটানোর পর হিজরী অষ্টম সনের প্রথম দিকে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৪২] তাঁর মৃত্যুর কারণ ও অবস্থা সম্পর্কে ইবন 'আবদিল বার লিখেছেন :[৪৩]

'হযরত যায়নাবের (রা) মৃত্যুর কারণ হলো, যখন তিনি তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হন তখন হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ ও অন্য এক ব্যক্তি তাঁর উপর আক্রমণ করে। তাদের কেউ একজন তাঁকে পাথরের উপর ফেলে দেয়। এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে রক্ত ঝরে এবং তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকেন। অবশেষে হিজরী অষ্টম সনে ইনতিকাল করেন।

হযরত উম্মু আয়মান (রা), হযরত সাওদা (রা), হযরত উম্মু সালামা (রা) ও হযরত উম্মু 'আতিয়্যা (রা), হযরত যায়নাবকে (রা) গোসল দেন।[৪৪] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং নিজে কবরে নেমে নিজ হাতে অতি আদরের মেয়েটিকে কবরের মধ্যে রেখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক খুবই বিমর্ষ ও মলিন দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেন এই বলে : হে আল্লাহ! যায়নাবের (রা) সমস্যাসমূহের সমাধান করে দিন এবং তার কবরের সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিন।[৪৫]

হযরত উম্মু 'আতিয়া (রা) বলেন, আমি যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) গোসলে শরীক ছিলাম। গোসলের নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলে দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, প্রথমে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন অথবা পাঁচবার গোসল দিবে। তারপর কর্পূর লাগাবে।[৪৬] একটি বর্ণনায় সাতবার গোসল দেওয়ার কথাও এসেছে। মূলত উদ্দেশ্য ছিল তাহারাত বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যদি তিন বারে অর্জিত হয়ে যায় তাহলে বেশী ধোয়ার প্রয়োজন নেই। তা না হলে পাঁচ/সাত বারও ধুতে হবে। উম্মু 'আতিয়্যা আরও বলেন :[৪৭] আমরা যখন যায়নাবকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন : 'তোমরা তার ডান দিক ও ওজুর স্থানগুলি হতে গোসল আরম্ভ করবে।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) একথাও বলেন যে, গোসল শেষ হলে তোমরা আমাকে জানাবে। সুতরাং গোসল শেষ হলে তাঁকে জানানো হয়। তিনি নিজের

৪১. আল-ইসাবা-৪/৩১২
৪২. তাবাকাত-৮/৩৪; আল-আ'লাম-৩/৬৭
৪৩. আল-ইসতী 'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) ৪/৩১২
৪৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০
৪৫. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৮; তাবাকাত-৮/৩৪
৪৬. তাবাকাত-৮/৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫০
৪৭. প্রাগুক্ত

একখানি তবন (লুঙ্গি) দিয়ে বলেন, এটি কাফনের কাপড়ের মধ্যে প্রতীক হিসেবে দিয়ে দাও।[৪৮] রাসূল (সা) যায়নাবকে (রা) তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) পাশে দাফন করার নির্দেশ দেন।[৪৯]

হযরত যায়নাবের (রা) ইনতিকালের অল্প কিছুদিন পর তাঁর স্বামী আবুল 'আসও (রা) ইনতিকাল করেন।[৫০] বালাজুরী বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং হিজরী ১২ সনে ইনতিকাল করেন। হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) ছিলেন তাঁর মামাতো ভাই। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেই অসী বানিয়ে যান।[৫১]

---

৪৮. বুখারী: বাবু গুসলিল মায়্যিত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২
৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২১২
৫০. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৮
৫১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০

রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত খাদীজার (রা) মেঝো মেয়ে হযরত রুকায়্যা (রা)। পিতা মুহাম্মাদের (সা) নবুওয়াত লাভের সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। যুবাইর ও তাঁর চাচা মুসআব যিনি একজন কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ, ধারণা করেছেন, রুকায়্যা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ছোট মেয়ে। জুরজানী এ মত সমর্থন করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে যায়নাব (রা) হলেন বড়, আর রুকায়্যা মেঝো। ইবন হিশামের মতে, রুকায়্যা মেয়েদের মধ্যে বড়।[১]

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সংকলিত একটি বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন তিরিশ তখন হযরত যায়নাবের (রা) জন্ম হয় এবং তেত্রিশ বছর বয়সে জন্ম হয় হযরত রুকায়্যার (রা)।[২] যাই হোক, সীরাত বিশেষজ্ঞরা হযরত রুকায়্যাকে রাসূলুল্লাহর (সা) মেঝো মেয়ে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার আবু লাহাবের পুত্র 'উতবার সাথে হযরত রুকায়্যার (রা) প্রথম বিয়ে হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। কুরায়শদের সাথে তাঁর বিরোধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন তারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার সকল পথ ও পন্থা বেছে নেয়। তারা সকল নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে মুহাম্মাদের বিবাহিত মেয়েদের স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ অথবা প্রলোভন দেখিয়ে প্রত্যেকের স্ত্রীকে তালাক দেওয়াবে এবং পরে তাদের পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেবে। তাতে অন্তত মুহাম্মাদের মনোকষ্ট ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তারা প্রথমে গেল রাসূলুল্লাহর (সা) বড় মেয়ের স্বামী আবুল 'আস ইবন রাবী'র নিকট। আবদার জানালো তাঁর স্ত্রী যায়নাব বিনত মুহাম্মাদকে তালাক দিয়ে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তিনি তাদের মুখের উপর সাফ 'না' বলে দিলেন। নির্লজ্জ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এমন জবাব শুনেও থামলো না। তারা গেল রুকায়্যার (রা) স্বামী 'উতবা ইবন আবী লাহাবের নিকট এবং তার স্ত্রীকে তালাক দানের জন্যে চাপ প্রয়োগ করলো। সাথে সাথে এ প্রলোভনও দিল যে, সে কুরায়শ গোত্রের যে সুন্দরীকেই চাইবে তাকে তার বউ বানিয়ে দেওয়া হবে। বিবেকহীন 'উতবা তাদের প্রস্তাব মেনে নিল। সে রুকায়্যার বিনিময়ে সা'ঈদ ইবনুল 'আস,[৪] মতান্তরে আবান ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আসের একটি মেয়েকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কুরায়শ নেতারা সানন্দে তার এ দাবী মেনে নিল। তাদের না মানার কোন কারণ ছিল না। তাদের তো প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে

---

১. সীরাত ইবন হিশাম-১/১৯০

২. আল ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা)-৪/২৯৯

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ-৮/৩৬

৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০১

কোনভাবে এবং যতটুকু পরিমাণেই হোক মুহাম্মাদকে (সা) দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা। মুহাম্মাদের (সা) একটু কষ্টতেই তাদের মানসিক প্রশান্তি। নরাধম 'উতবা তার স্ত্রী সয়্যিদা রুকায়্যাকে (রা) তালাক দিল।[৫]

তবে এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা এই যে, যখন 'উতবার পিতা-মাতার নিন্দায় সূরা 'লাহাব'– تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ নাযিল হয় তখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল-হাম্মালাতাল হাতাব– ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলে 'উতবাকে বললো, তুমি যদি মুহাম্মাদের মেয়ে রুকায়্যাকে তালাক দিয়ে বিদায় না কর তাহলে তোমার সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। মাতা-পিতার অনুগত সন্তান মা-বাবাকে খুশী করার জন্যে স্ত্রী রুকায়্যাকে তালাক দেয়।[৬] উল্লেখ্য যে, 'উতবার সাথে রুকায়্যার কেবল আক্‌দ হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসের পূর্বেই তালাকের এ ঘটনা ঘটে।[৭]

হযরত রুকায়্যার (রা) দ্বিতীয় বিয়ে

হযরত 'উছমান (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি পবিত্র কা'বার আঙ্গিনায় কয়েকজন বন্ধুর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় কোন এক ব্যক্তি এসে আমাকে জানালো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মেয়ে রুকায়্যাকে 'উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু হযরত রুকাইয়্যা রূপ-লাবণ্য এবং ঈর্ষণীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্বাতন্ত্রের অধিকারিণী ছিলেন, এ কারণে তাঁর প্রতি আমার খানিকটা মানসিক দুর্বলতা ছিল। আমি তাঁর বিয়ের সংবাদ শুনে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লাম। তাই উঠে সোজা বাড়ী চলে গেলাম। তখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন আমার খালা সা'দা। তিনি ছিলেন আবার একজন 'কাহিনা' (ভবিষ্যদ্বক্তা)।[৮] আমাকে দেখেই তিনি অকস্মাৎ নিম্নের কথাগুলো বলতে আরম্ভ করলেন :

أَبْشِرْ وَحُيِّيْتَ ثَلاثًا وِتْرًا، ثُمَّ ثَلاثًا وَثَلاثًا أُخْرى، ثُمَّ بِأُخْرى كَى تَتِمُّ عَشْرًا، لَقِيْتَ خَيْرًا وَوُقِيْتَ شَرًّا نَكَحْتَ وَاللهِ حَصَانًا زَهْرًا، وَأَنْتَ بِكْرٌ وَلَقِيْتَ بِكْرًا.

'(হে উছমান) তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমার প্রতি তিনবার সালাম। আবার তিনবার। তারপর আবার তিন বার। শেষে একবার সালাম। তাহলে মোট দশটি সালাম পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি শুভ ও কল্যাণের সাথে মিলিত হবে এবং অমঙ্গল থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর কসম, তুমি একজন ফুলের কুঁড়ির মত সতী-সাধ্বী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছো। তুমি একজন কুমার, এক কুমারী পাত্রীই লাভ করেছো।'

---

৫. সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬৫২

৬. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগিল আমানী-২২/৯৯ (হাদীস নং ৮৯৩)

৭. তাবাকাত-৮/৩৬

৮. ইসলাম-পূর্ব আরবের ইতিহাসে বহু কাহিন ও কাহিনার নাম পাওয়া যায়। তারা সাধারণত হেঁয়ালিপূর্ণ ও ধাঁধামূলক কথায় সত্য ও অর্ধসত্য ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতো।

তাঁর এমন কথাতে আমি ভীষণ তাজ্জব বনে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনি এসব কী বলছেন? তিনি বললেন :

عُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ! لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ الشَّأْنُ هـذَا نَبِىٌّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ اَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ الدَّيَّانُ وَجَاءَ التَّنْزِيْلُ وَالْفُرْقَانُ فَاتَّبِعْهُ لاَيَغُرَّنَّكَ الاَوْثَانُ.

'উছমান, উছমান, হে 'উছমান! তুমি সুন্দরের অধিকারী, তোমার জন্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইনি নবী, তাঁর সাথে আছে দলিল-প্রমাণ। তিনি সত্য-সঠিক রাসূল। তাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ কর, মূর্তির ধোঁকায় পড়ো না।'

আমি এবারও কিছু বুঝলাম না। আমি তাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলার জন্যে অনুরোধ করলাম। এবার তিনি বললেন :

إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ دُوْنِ اللهِ جَاءَ بِتَنْزِيْلِ اللهِ يَدْعُوْ بِهِ إِلَى اللهِ، مِصْبَاحُهُ مِصْبَاحٌ وَدِيْنُهُ فَلاَحٌ، مَايَنْفَعُ الصَّبَاحُ وَلَوْ وَقَعَ الرِّمَاحُ وَسَلَّتِ الصِّفَاحُ وَمُدَّتِ الرِّمَاحُ.

'মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ যিনি আল্লাহর রাসূল, কুরআন নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর প্রদীপই প্রকৃত প্রদীপ, তাঁর দীনই সফলতার মাধ্যম। যখন মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে এবং অসি উন্মুক্ত হবে এবং বর্শা নিক্ষেপ করা হবে তখন শোরগোল হৈচৈ কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।'

তাঁর একথা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করলো। আমি ভবিষ্যতের করণীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। আমি প্রায়ই আবু বকরের কাছে গিয়ে বসতাম। দুইদিন পর আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম তখন সেখানে কেউ ছিলনা। আমাকে চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, আজ তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাই আমি আমার খালার বক্তব্যের সারকথা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন : 'উছমান, তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য যদি তুমি করতে না পার তাহলে সেটা হবে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তোমার স্বজাতির লোকেরা যে মূর্তিগুলির উপাসনা করে, সেগুলি কি পাথরের তৈরী নয়- যারা কোন কিছু শুনতে পায় না, দেখতে পারে না এবং কোন উপকার ও অপকারও করার ক্ষমতা তারা রাখেনা? উছমান বললেন, আপনি যা বলছেন, তা সবটুকু সত্য।

আবু বকর বললেন, তোমার খালা যে কথা বলেছেন তা সত্য। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে পাঠিয়েছেন। যদি তুমি তাঁর কাছে যাও এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শোন, তাতে ক্ষতির কী আছে? তাঁর একথার পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের এ আলোচনার কথা শুনে রাসূল (সা) নিজেই 'উছমানের (রা) নিকট

যান। রাসূল (সা) বলেন, শোন উছমান, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন, তুমি সে ডাকে সাড়া দাও। আমি আল্লাহর রাসূল– তোমাদের তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আমাকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহই জানেন তাঁর এ বাক্যটির মধ্যে কী এমন শক্তি ছিল! আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। অবলীলাক্রমে আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো কালেমায়ে শাহাদাত– আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।[৯]

এ ঘটনার পর মক্কাতেই হযরত উছমানের (রা) সাথে হযরত রুকায়্যার (রা) বিয়ের 'আকদ সম্পন্ন হয়।

হযরত রুকায়্যা (রা) তাঁর মা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) ও বড় বোন হযরত যায়নাবের (রা) সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] অন্য মহিলারা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) বাই'আত করেন তখন তিনিও বাই'আত করেন।[১১]

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে তিনি স্বামী হযরত 'উছমানের (রা) সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। হযরত আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) ও আবু বকর হিরাগুহায় অবস্থান করতেন আর আমি তাঁদের দুইজনের খাবার নিয়ে যেতাম। একদিন হযরত 'উছমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হিজরাতের অনুমতি চাইলে তাঁকে হাবশায় যাওয়ার অনুমতি দান করেন। অতঃপর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মক্কা ছেড়ে হাবশার দিকে চলে যান। তারপর আমি আবার যখন তাঁদের খাবার নিয়ে গেলাম তখন রাসূল (সা) জানতে চান : উছমান ও রুকায়্যা কি চলে গেছে? বললাম : জী হাঁ, তাঁরা চলে গেছেন। তখন তিনি আমার পিতা আবু বকরকে (রা) শুনিয়ে বললেন :

إِنَّهُمَا لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ ولوط.

'নিশ্চয় তারা দুইজন ইবরাহীম ও লূত-এর পর প্রথম হিজরাতকারী।'[১২]

কিছুকাল হাবশায় অবস্থানের পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার কাফিরদের অপতৎপরতার মাত্রা তখন আরো বেড়ে গিয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করলেন না। আবার হাবশায় ফিরে গেলেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা) তাঁর স্ত্রী রুকায়্যাকে (রা) নিয়ে হাবশার দিকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের খবর রাসূলুল্লাহর নিকট আসতে দেরী হলো। এরমধ্যে এক কুরায়শ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। সে বললো : মুহাম্মাদ, আমি আপনার জামাইকে তার স্ত্রীসহ যেতে দেখেছি। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : তুমি

---

৯. আল-ইসাবা-৪/৩২৭-২৮

১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৫১

১১. তাবাকাত-৮/৩৬

১২. আনসাবুল 'আশরাফ-১/১৯৯। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেন : 'উছমান ইবন 'আফফান সপরিবারে মহান আল্লাহর দিকে প্রথম হিজরাতকারী।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৬)।

তাদের কি অবস্থায় দেখেছো? সে বললো : দেখলাম সে তার স্ত্রীকে একটি দুর্বল গাধার উপর বসিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) তখন মন্তব্য করলেন :

صَحِبَهُمَا اللهُ، إنْ عُثْمَانَ أوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بَاهْلِهِ بَعْدَ لُوْطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

'আল্লাহ তাদের সাথী হোন। লূত আলাইহিস সালামের পরে উছমান প্রথম ব্যক্তি যে সস্ত্রীক হিজরাত করেছে।'[১৩]

তাঁরা দ্বিতীয়বার বেশ কিছুদিন হাবশায় অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন মক্কায় থেকে পরিবার-পরিজনসহ আবার চিরদিনের জন্য মদীনায় হিজরাত করেন।[১৪]

দ্বিতীয়বার হাবশায় অবস্থানকালে হযরত রুকায়্যার (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। এ 'আবদুল্লাহর নামেই হযরত 'উছমানের (রা) উপনাম হয় আবু 'আবদিল্লাহ। এর পূর্বে হাবশায় প্রথম হিজরাতের সময় তার গর্ভের একটি সন্তান নষ্ট হয়ে যায়।[১৫] কাতাদা বলেন, 'উছমানের (রা) ঔরসে রুকায়্যার (রা) কোন সন্তান হয়নি। ইবন হাজার বলেন, এটা কাতাদার একটি ধারণা মাত্র। এমন কথা তিনি ছাড়া আর কেউ বলেননি।[১৬] তবে 'আবদুল্লাহর পরে হযরত রুকায়্যার (রা) আর কোন সন্তান হয়নি।[১৭]

'আবদুল্লাহর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর তখন হঠাৎ একদিন একটি মোরগ তার একটি চোখে ঠোকর দেয় এবং তাতে তার মুখমণ্ডল ফুলে গোটা শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই দুর্ঘটনায় হিজরী চতুর্থ সনের জামাদিউল আওয়াল মাসে সে মারা যায়।[১৮] রাসূল (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত 'উছমান (রা) কবরে নেমে তার দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

মদীনা পৌঁছার পর হযরত রুকায়্যা (রা) হিজরী দ্বিতীয় সনে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। তখন ছিল বদর যুদ্ধের সময়কাল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 'উছমানকে (রা) তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে মদীনায় রেখে নিজে বদরে চলে যান। হিজরাতের এক বছর সাত মাস পরে পবিত্র রমজান মাসে হযরত রুকায়্যা ইনতিকাল করেন। উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে রুকায়্যাকে কবর দিয়ে মাটি সমান করছিলাম ঠিক তখন আমার পিতা যায়দ ইবন হারিছা বদরের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূল (সা) আমাকে 'উছমানের সাথে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।[১৯]

---

১৩. আল-বিদায়া-৩/৬৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫১
১৪. তাবাকাত-৮/৩৬
১৫. প্রাগুক্ত; উসুদুল গাবা-৫/৩৫৬
১৬. আল-ইসতী'আব-৪/৩০০
১৭. তাবাকাত-৮/৩৬
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫১
১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৪২-৪৩; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৪, ৪৭৫

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তারা যখন রুকায়্যার (রা) দাফন কাজে ব্যস্ত ঠিক সে সময় 'উছমান (রা) দূর থেকে আসা একটি তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেয়ে উসামার (রা) নিকট জানতে চান এটা কী? তাঁরা তাকিয়ে দেখতে পেলেন যায়দ ইবন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীর উপর সওয়ার হয়ে আছেন এবং বদরে মক্কার কুরায়শ নেতাদের হত্যার খবর ঘোষণা করছেন।[২০]

অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য হযরত 'উছমান (রা) বদরের মত এত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে রাসূল (সা) তাঁকে বদরের অংশীদার গণ্য করে গণীমতের অংশ দান করেন। 'উছমান (রা) জানতে চান, জিহাদের সাওয়াবের কি হবে? রাসূল (সা) বলেন : তুমি সাওয়াবও লাভ করবে।[২১]

ইবন 'আব্বাস বলেন, রুকায়্যার (রা) মৃত্যুর পর রাসূল (সা) বলেন :[২২]

اِلْحِقِىْ بِسَلَفِنَا الصَّالِح عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْن.

'তুমি আমাদের পূর্বসূরী 'উছমান ইবন মাজ'উনের সাথে মিলিত হও।'[২৩] মহিলারা কাঁদতে থাকে। এসময় 'উমার (রা) এসে তাঁর হাতের চাবুক উঁচিয়ে পেটাতে উদ্যত হন। রাসূল (সা) হাত দিয়ে তাঁর চাবুকটি ধরে বলেন, ছেড়ে দাও। তারা তো কাঁদছে। অন্তর ও চোখ থেকে যা বের হয়, তা হয় আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে। আর হাত ও মুখ থেকে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তা হয় শয়তান থেকে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে কবরের ধারে বসেছিলেন। রাসূল (সা) নিজের কাপড়ের কোনা দিয়ে তাঁর চোখের পানি মুছে দিচ্ছিলেন।[২৪]

ইবন সা'দ উপরোক্ত বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, সকল বর্ণনাকারীর নিকট এটাই সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত যে, রুকায়্যার (রা) মৃত্যু ও দাফনের সময় রাসূল (সা) বদরে ছিলেন। সম্ভবত এটা রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য মেয়ের মৃত্যুর সময়ের ঘটনা। আর যদি রুকায়্যার মৃত্যু সময়ের হয় তাহলে সম্ভবত রাসূল (সা) বদর থেকে ফিরে আসার পরে কবরের পাশে গিয়েছিলেন, আর মহিলারাও তখন ভীড় করেছিলেন।[২৫] মুসনাদে ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলের (সা) অনিচ্ছার কারণে উছমানের (রা) পরিবর্তে আবু তালহা (রা) কবরে নেমে রুকায়্যাকে (রা) শায়িত করেন। এ ক্ষেত্রেও

---

২০. আল-ইসাবা-৪/৩০৫

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৭৮

২২. আল ইসাবা-৪/৩০৪

২৩. 'উছমান ইবন মাজ'উন (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) মামা। তিনি দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। সর্বশেষ মদীনায় হিজরাত করেন। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি হযরত রুকায়্যার (রা) পূর্বে মারা যান। বালাজুরীর বর্ণনা মতে, তিনি হিজরী ২য় সনের জিলহাজ্জ মাসে মদীনায় ফিরে এসে হিজরাতের তিরিশ মাস পরে মারা যান। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-২/২৭) আর হযরত রুকায়্যা (রা) বদর যুদ্ধের সময় মারা যান, এ ব্যাপারে সকলে একমত। সুতরাং বিষয়টি বোধগম্য নয়।

২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২; তাবাকাত-৮/৩৭।

২৫. তাবাকাত-৮/৩৭

একই প্রশ্ন উঠেছে যে, তা কেমন করে সম্ভব? রাসূল (সা) তো তখন বদরে। তাই মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, এটা উম্মু কুলছূমের (রা) দাফনের সময়ের ঘটনা। তাছাড়া অপর একটি বর্ণনায় উম্মু কুলছূমের (রা) নাম এসেছে।[২৬]

উল্লেখ্য যে, উম্মু কুলছূম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তৃতীয় মেয়ে– রুকায়্যার (রা) মৃত্যুর পর 'উছমান (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর তিনি মারা যান।

হযরত রুকায়্যা (রা) খুবই রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন। 'দুররুল মানছূর' গ্রন্থে এসেছে : 'তিনি ছিলেন দারুণ রূপবতী। হাবশায় অবস্থানকালে সেখানকার একদল বখাটে লোক তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই দলটি তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করে। তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।[২৭]

প্রিয়তমা স্ত্রী ও সুখ-দুঃখের সাথীর অকাল মৃত্যুতে হযরত 'উছমান (রা) দারুণ কষ্ট পান। তাঁদের দুইজনের মধ্যে দারুণ মিল-মুহাব্বত ছিল। লোকেরা বলাবলি করতো এবং কথাটি যেন উপমায় পরিণত হয়েছিল যে,

أَحْسَنُ الزَّوْجَيْنِ رَاٰهُمَا الاُنْسَانُ رُقَيْةٌ وَزَوْجُهَا عُثْمَانُ.

'মানুষের দেখা দম্পতিদের মধ্যে রুকায়্যা ও তাঁর স্বামী 'উছমান হলো সর্বোত্তম।[২৮] বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, রুকায়্যা ছিলেন একজন স্বামী-সোহাগিনী এবং পতি-পরায়ণা স্ত্রী। তাঁদের স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবনে তাঁরা কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। সকল বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল অবস্থা তাঁরা একসাথে মুকাবিলা করেছেন। তিনি নিজে যেমন স্বামীর সেবা করে সকল যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করতেন, তেমনি স্বামী 'উছমানও স্ত্রীর জীবনকে সহজ করার চেষ্টা সব সময় করতেন। একদিন রাসূল (সা) 'উছমানের (রা) ঘরে গিয়ে দেখেন রুকায়্যা স্বামীর মাথা ধুইয়ে দিচ্ছেন। তিনি মেয়েকে বলেন :[২৯]

يابنيَّة أَحْسِنِي إِلى أَبِيْ عَبْدِ اللهِ فَإِنَّهُ أَشْبَهَ اَصْحَابِيْ لِيْ خُلْقًا.

'আমার মেয়ে! তুমি আবু 'আবদিল্লাহর ('উছমান) সাথে ভালো আচরণ করবে। কারণ আমার সাহাবীদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে তাঁর বেশী মিল'।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ও 'উছমানের স্ত্রী রুকায়্যার ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে চিরুনী। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) এই মাত্র আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখে গেলেন, আমি 'উছমানের মাথায় চিরুনী করছি।[৩০]

---

২৬. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগিল আমানী-২২/১৯৯
২৭. দুররুল মানছূর-২০৭; সাহাবিয়াত-১২৮
২৮. আল-ইসাবা-৪/৩০৫
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৪২

উম্মু কুলছূম বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

হযরত উম্মু কুলছূম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) তৃতীয় মেয়ে। তবে এ ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ বলেছেন।[১] যুবাইর ইবন বাক্‌কার বলেছেন, উম্মু কুলছূম ছিলেন রুকাইয়্যা ও ফাতিমা (রা) থেকে বড়। কিন্তু অধিকাংশ সীরাত লেখক এ মতের বিরোধিতা করেছেন। সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য মত এটাই যে, হযরত উম্মু কুলছূম (রা) ছিলেন হযরত রুকায়্যার (রা) ছোট।[২] তাবারী রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েদের জন্মের ক্রমধারা উল্লেখ করেছেন এভাবে।[৩]

وولدت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.

'যায়নাব, রুকায়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।'

হযরত রুকায়্যা (রা) ছিলেন হযরত 'উছমানের (রা) স্ত্রী। হিজরী ২য় সনে তাঁর ইনতিকাল হলে রাসূল (সা) উম্মু কুলছূমকে (রা) 'উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দেন।[৪] যদি উম্মু কুলছূম বয়সে রুকায়্যার বড় হতেন তাহলে 'উছমানের (রা) সাথে তাঁরই বিয়ে হতো আগে, রুকায়্যার নয়। কারণ, সকল সমাজ ও সভ্যতায় বড় মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাটা আগেই করা হয়। আর এটাই বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী।

সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) জন্ম সনের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের ছয় বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ, একথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে, নবুওয়াতের সাত বছর পূর্বে রুকায়্যার এবং পাঁচ বছর পূর্বে হযরত ফাতিমার (রা) জন্ম হয়। আর একথাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, উম্মু কুলছূম (রা) ছিলেন রুকায়্যার ছোট এবং ফাতিমার বড়। তাহলে তাঁদের দুইজনের মধ্যবর্তী সময় তাঁর জন্মসন বলে মেনে নিতেই হবে। আর এই হিসেবেই তিনি নবুওয়াতের ছয় বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

অনেকের মত হযরত উম্মু কুলছূমেরও (রা) শৈশবকাল অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। আরবের সেই সময়কালটা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তিরই জীবনকথা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। এ কারণে তাঁর বিয়ের সময় থেকেই তাঁর জীবন ইতিহাস লেখা হয়েছে।

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ২/২৫২
২. সীরাতু ইবন হিশাম, ১/১৯০
৩. তারীখ আত-তাবারী (লেইডেন) ৩/১১২৮
৪. তাবাকাত, ৮/৩৫
৫. সাহাবিয়াত-১২৯

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র 'উতবার সাথে রুকায়্যার এবং তার দ্বিতীয় পুত্র 'উতাইবার সাথে উম্মু কুলছূমের বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পর যখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর নিন্দায় সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন আবু লাহাব, মতান্তরে আবু লাহাবের স্ত্রী দুই ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে, 'তোমরা যদি তাঁর [মুহাম্মাদ (সা)] মেয়েকে তালাক দিয়ে বিদায় না কর তাহলে তোমাদের সাথে আমার বসবাস ও উঠাবসা হারাম।'[৬] হযরত রুকায়্যার (রা) জীবনীতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পিতা-মাতার এরূপ কথায় এবং সামাজিক চাপে 'উতবা তার স্ত্রী রুকায়্যাকে তালাক দেয়। তেমনিভাবে 'উতাইবাও মা-বাবার হুকুম তামিল করতে গিয়ে স্ত্রী উম্মু কুলছূমকে তালাক দেয়। এ হিসেবে উভয়ের তালাকের সময়কাল ও কারণ একই।[৭] উভয় বোনের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বামীর ঘরে যাবার পূর্বেই এ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকায়্যা (রা) মৃত্যুবরণ করলে হযরত 'উছমান (রা) স্ত্রীর শোকে বেশ বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) একদিন তাঁকে বললেন, 'উছমান, তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখছি, কারণ কি? 'উছমান (রা) বললেন, আমি এমন বিমর্ষ না হয়ে কেমন করে পারি? আমার উপর এমন মুসীবত এসেছে যা সম্ভবত: কখনো কারো উপর আসেনি। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যার ইনতিকাল হয়েছে। এতে আমার মাজা ভেঙ্গে গেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার উপায় কি? তাঁর কথা শেষ না হতেই রাসূল (সা) বলে উঠলেন, জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার থেকে আমাকে হুকুম পৌঁছে দিয়েছেন, আমি যেন রুকায়্যার সমপরিমাণ মাহরের ভিত্তিতে উম্মু কুলছূমকেও তোমার সাথে বিয়ে দিই।[৮] অতঃপর রাসূল (সা) হিজরী ৩য় সনের রাবী'উল আউয়াল মাসে হযরত 'উছমানের (রা) সাথে উম্মু কুলছূমের 'আক্‌দ সম্পন্ন করেন।[৯] 'আকদের দুই মাস পরে জামাদিউস ছানী মাসে তিনি স্বামী গৃহে গমন করেন। হযরত উম্মু কুলছূম কোন সন্তানের মা হননি।[১০]

একটি বর্ণনায় এসেছে, রুকায়্যার (রা) ইনতিকালের পর 'উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে (রা) উছমানের (রা) সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। একথা রাসূল (সা) জানতে পেরে 'উমারকে বলেন, আমি হাফসার জন্যে 'উছমানের চেয়ে ভালো স্বামী এবং 'উছমানের জন্যে হাফসার চেয়ে ভালো স্ত্রী তালাশ করবো। তারপর তিনি হাফসাকে বিয়ে করেন এবং উম্মু কুলছূমকে 'উছমানের সাথে বিয়ে দেন।[১১]

---

৬. তাবাকাত-৮/৩৭
৭. উসুদুল গাবা-৫/১২
৮. প্রাগুক্ত-৫/৬১৩
৯. তাবাকাত-৮/৩৭
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত-৮/৩৮

হযরত উম্মু কুলছূম (রা) তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে অন্য বোনদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'আত করেন।[১২] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[১৩]

হযরত উম্মু কুলছুমের (রা) ইনতিকালের পর রাসূল (সা) বলেন, আমার যদি দশটি মেয়ে থাকতো তাহলে একের পর এক তাদের সকলকে 'উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দিতাম।[১৪] একটি বর্ণনায় দশটি মেয়ের স্থলে একশোটি মেয়ে এসেছে।[১৫]

স্বামী 'উছমানের (রা) সাথে ছয় বছর কাটানোর পর হিজরী ৯ম সনের শা'বান মাসে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) ইনতিকাল করেন।[১৬] আনসারী মহিলারা তাঁকে গোসল দেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উম্মু 'আতিয়্যাও ছিলেন। রাসূল (সা) জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবু তালহা, 'আলী ইবন আবী তালিব, ফাদল ইবন 'আব্বাস ও উসামা ইবন যায়দ (রা) লাশ কবরে নামান।[১৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কন্যা উম্মু কুলছূমের (রা) মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথা পান। যখন কবরের কাছে বসেন তখন চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।[১৮]

একটি বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রা) উম্মু কুলছূমকে (রা) রেখা অঙ্কিত রেশমের কাজ করা একটি চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখেছেন।[১৯]

নরাধম 'উতায়বা তার জাহান্নামের অগ্নিশিখা পিতা আবু লাহাব এবং কাঠকুড়ানি মা উম্মু জামীল হাম্মালাতাল হাতাব-এর চাপে স্ত্রী উম্মু কুলছূমকে তালাক দানের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে চরম অমার্জিত আচরণ করে। সে রাসূলকে (সা) লক্ষ্য করে বলে : 'আমি আপনার দীনকে অস্বীকার করি, মতান্তরে আপনার মেয়েকে তালাক দিয়েছি। আপনি আর আমার কাছে যাবেন না, আমিও আর আপনার কাছে আসবো না।' একথা বলে সে গোঁয়ারের মত রাসূলুল্লাহর (সা) উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) জামা ছিঁড়ে যায়। এরপর সে শামের দিকে সফরে বেরিয়ে যায়। তার এমন পশুসুলভ আচরণে রাসূল (সা) ক্ষুব্ধ হয়ে বদ-দু'আ করেন এই বলে : আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তাঁর কোন কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দেন।'

---

১২. প্রাগুক্ত-৮/৩৭
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২' হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৯
১৪. আল-ইসতী'আব-৭৯৩
১৫. তাবাকাত-৮/৩৮
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫৩
১৭. তাবাকাত-৮/৩৮-৩৯
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫৩; বুখারী ৩/১২৬-১২৭, ১৬৭,
১৯. বুখারী : বাবুল হারীর লিন-নিসা; আবু দাউদ (২০৫৮); নাসাঈ-৮/১৯৭; ইবন মাজাহ্-(৩৫৯৮); তাবাকাত-৮/৩৮

'উতাইবা কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে শামের দিকে বেরিয়ে পড়লো। যখন তারা 'আয-যারকা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করছিল, তখন একটি নেকড়ে তাদের অবস্থান স্থলের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। তা দেখে 'উতাইবার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বদ-দু'আর কথা। সে তার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে বলতে থাকে, 'আমার মা নিপাত যাক, মুহাম্মাদের কথা মত এ নেকড়ে তো আমাকে খেয়ে ফেলবে।' যাহোক, কাফেলার লোকেরা তাকে সকলের মাঝখানে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে ঘুমিয়ে পড়ে। নেকড়ে সকলকে ডিঙ্গিয়ে মাঝখান থেকে 'উতাইবাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং কামড়ে, খামছে রক্তাক্ত করে তাকে হত্যা করে।

২০. হায়াতুস সাহাবা-১/২৭৪

ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে উম্মুল কুরা তথা মক্কা নগরীতে হযরত ফাতিমা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সায়্যিদুল কাওনায়ন রাসূলু রাব্বিল 'আলামীন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব এবং মাতা সারা বিশ্বের নারী জাতির নেত্রী, প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)। ফাতিমার যখন জন্ম হয় তখন মক্কার কুরায়শরা পবিত্র কা'বা ঘরের সংস্কার কাজ চালাচ্ছে। সেটা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। ফাতিমার জন্মগ্রহণে তার মহান পিতা-মাতা দারুণ খুশী হন।[১] ফাতিমা ছিলেন কনিষ্ঠা মেয়ে। মা খাদীজা (রা) তাঁর অন্য সন্তানদের জন্য ধাত্রী রাখলেও ফাতিমাকে ধাত্রীর হাতে ছেড়ে দেননি। তিনি তার অতি আদরের ছোট মেয়েকে নিজে দুধ পান করান। এভাবে হযরত ফাতিমা (রা) একটি পূতঃপবিত্র গৃহে তাঁর মহান পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন এবং নবুওয়াতের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারায় স্নাত হন।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

হযরত ফাতিমার (রা) মহত্ব, মর্যাদা, আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব কথা বলা হয় তার কারণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. তাঁর পিতা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান রাহমাতুল্লিল 'আলামীন আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।
২. তাঁর মা বিশ্বের নারী জাতির নেত্রী, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)।
৩. স্বামী দুনিয়া ও আখিরাতের নেতা আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা)।
৪. তাঁর দুই পুত্র-আল-হাসান ও আল-হুসায়ন (রা) জান্নাতের যুবকদের দুই মহান নেতা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুগন্ধি (رَيْحَا نَتَان)।
৫. তাঁর এক দাদা শহীদদের মহান নেতা হযরত হামযা (রা)।
৬. অন্য এক দাদা প্রতিবেশীর মান-মর্যাদার রক্ষক, বিপদ-আপদে মানুষের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ খরচকারী, উলঙ্গ ব্যক্তিকে বস্ত্র দানকারী, অভুক্ত ও অনাহার-ক্লিষ্টকে খাদ্য দানকারী হযরত আল-'আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা)।
৭. তাঁর এক চাচা মহান শহীদ নেতা ও সেনানায়ক হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা)।

উল্লেখিত গৌরবের অধিকারী বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ কি আছে?

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৯

ইসলাম গ্রহণ

হযরত রাসূলে কারীমের (রা) উপর ওহী নাযিল হবার পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর রিসালাতকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। আর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম পর্বে যেসব মহিলা ঈমান আনেন তাঁদের পুরো ভাগে ছিলেন তাঁর পূতঃ পবিত্র কন্যাগণ। তাঁরা হলেন : যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা (রা)। তাঁরা তাঁদের পিতার নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেন তাঁদের মহিয়ষী মা খাদীজার (রা) সাথে।

ইবন ইসহাক হযরত 'আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে নবুওয়াতে ভূষিত করলেন তখন খাদীজা ও তাঁর কন্যারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যারা তাঁদের মায়ের সাথে প্রথম ভাগেই ইসলামের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন এবং তাঁদের পিতার রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁরা উন্নত মানের নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত হন। ইসলামের পরে তা আরো সুশোভিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ইমাম আয-যুরকানী 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে ফাতিমা ও তাঁর বোনদের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন এভাবে : 'তাঁর মেয়েদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কারণ, নবুওয়াতের পূর্বেই তাঁদের পিতার জীবন ও আচার-আচরণ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' অন্য এক স্থানে আয্-'যুরকানী নবী-দুহিতাদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা সম্পর্কে বলছেন এভাবে : মোটকথা, আগেভাগে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সর্বাধিক সত্য, সর্বাধিক অভিজাত পিতৃত্ব এবং সবচেয়ে ভালো ও সর্বাধিক স্নেহময়ী মাতৃত্বের ক্রোড়ে বেড়ে ওঠার কারণে তাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের পিতার সর্বোত্তম আখলাক তথা নৈতিকতা এবং তাঁদের মার থেকে পেয়েছিলেন এমন বুদ্ধিমত্তা যার কোন তুলনা চলেনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কোন নারীর সাথে। সুতরাং নবী পরিবারের তথা তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের ইসলাম ছিল স্বচ্ছ-স্বভাবগত ইসলাম। ঈমান ও নবুওয়াত দ্বারা যার পুষ্টি সাধিত হয়। মহত্ব, মর্যাদা ও উন্নত নৈতিকতার উপর যাঁরা বেড়ে ওঠেন।[২]

শৈশব-কৈশোরে পিতার সহযোগিতা

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপর ওহী নাযিল হলো। তিনি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশমত মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। আর এজন্য তিনি যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন, অস্বীকৃতি, মিথ্যা দোষারোপ ও বাড়াবাড়ির মুখোমুখী হলেন, সবকিছুই তিনি উপেক্ষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কুরায়শরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে চরম বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা করতে লাগলো। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো, তাঁর

---

২. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৫৯২

প্রতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে আরম্ভ করলো। হযরত ফাতিমা (রা) তখন জীবনের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করছেন। পিতা যে তাঁর জীবনের একটা কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন, মেয়ে ফাতিমা এত অল্প বয়সেও তা বুঝতে পারতেন। অনেক সময় তিনি পিতার সাথে ধারে-কাছে এদিক ওদিক যেতেন। একবার দুরাচারী 'উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে তাঁর পিতার সাথে এমন একটি নিকৃষ্ট আচরণ করতে দেখেন যা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি। এই 'উকবা ছিল মক্কার কুরায়শ বংশের প্রতি আরোপিত। আসলে তার জন্মের কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। একজন নিকৃষ্ট ধরনের পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত হিসেবে সে বেড়ে ওঠে। তার জন্মের এই কালিমা ঢাকার জন্য সে সব সময় আগ বাড়িয়ে নানা রকম দুষ্কর্ম করে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রীতিভাজন হওয়ার চেষ্টা করতো।

একবার 'উকবা মক্কার পাপাচারী পৌত্তলিক কুরায়শদের একটি বৈঠকে বসা ছিল। কয়েকজন কুরায়শ নেতা বললো : এই যে মুহাম্মাদ সিজদায় আছেন। এখানে উপস্থিতদের মধ্যে এমন কে আছে, যে উটের এই পচাগলা নাড়ী-ভুঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে তাঁর পিঠে ফেলে আসতে পারে? নরাধম 'উকবা অতি উৎসাহ ভরে এই অপকর্মটি করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে বললো : আমি যাচ্ছি। তারপর সে দ্রুত পচা নাড়ী-ভুঁড়ির দিকে চলে গেল এবং সেগুলো উঠিয়ে সিজদারত মুহাম্মাদ (সা)-এর পিঠের উপর ফেলে দিল। দূর থেকে কুরায়শ নেতারা এ দৃশ্য দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সিজদা থেকে উঠলেন না। সাথে সাথে এ খবর বাড়ীতে হযরত ফাতিমার (রা) কানে গেল। তিনি ছুটে এলেন, অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ হাতে পিতার পিঠ থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলেন এবং পানি এনে পিতার দেহে লাগা ময়লা পরিষ্কার করেন। তারপর সেই পাপাচারী দলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দেন।[৩]

রাসূল (সা) নামায শেষ করে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন :

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعِيْطٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ.

'হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবন রাবী'আকে পাকড়াও কর, হে আল্লাহ! তুমি আবূ জাহ্ল ইবন হিশামকে ধর, হে আল্লাহ! তুমি 'উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে সামাল দাও, হে আল্লাহ তুমি উমাইয়্যা ইবন খালাফের খবর নাও।'

রাসূলুল্লাহকে (সা) হাত উঠিয়ে এভাবে দু'আ করতে দেখে পাষণ্ডদের হাসি থেমে যায়। তারা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর দু'আ কবুল করেন। উল্লেখিত চার দুর্বৃত্তের সবাই বদরে নিহত হয়।[৪] উল্লেখ্য যে, 'উকবা বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী

---

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪; হায়াত আস-সাহাবা-১/২৭১

৪. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/২৭৮, ২৮০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪

হয়। রাসূল (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সে বলে : মুহাম্মাদ! আমার ছোট্ট মেয়েগুলোর জন্য কে থাকবে? বললেন : জাহান্নাম। তারপর সে বলে, আমি কুরায়শ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তুমি হত্যা করবে? বললেন : হাঁ। তারপর তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা কি জান এই লোকটি আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? একদিন আমি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সিজদারত ছিলাম। এমন সময় সে এসে আমার ঘাড়ের উপর পা উঠিয়ে এত জোরে চাপ দেয় যে, আমার চোখ দু'টি বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আরেকবার আমি সিজদায় আছি। এমন সময় সে কোথা থেকে ছাগলের বর্জ্য এনে আমার মাথায় ঢেলে দেয়। ফাতিমা দৌড়ে এসে তা সরিয়ে আমার মাথা ধুইয়ে দেয়। মুসলমানদের হাতে এ পাপিষ্ঠ 'উকবার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৫]

সেই কিশোর বয়সে ফাতিমা পিতার হাত ধরে একদিন গেছেন কা'বার আঙ্গিনায়। তিনি দেখলেন, পিতা যেই না হাজারে আসওয়াদের কাছাকাছি গেছেন অমনি একদল পৌত্তলিক একযোগে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে লাগলো : আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি এমন এমন কথা বলে থাকেন? তারপর তারা একটা একটা করে গুনে বলতে থাকে : আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দেন, উপাস্যদের দোষের কথা বলেন, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরকে নির্বোধ ও বোকা মনে করেন।

তিনি বলেন : হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

এর পরের ঘটনা দেখে বালিকা ফাতিমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি ভয়ে অসাড় হয়ে পড়েন। দেখেন, তাদের একজন তাঁর পিতার গায়ের চাদরটি তাঁর গলায় পেঁচিয়ে জোরে টানতে শুরু করেছে। আর আবূ বকর (রা) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন : তোমরা একটি লোককে শুধু এ জন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন : আল্লাহ আমার রব, প্রতিপালক?

লোকগুলো আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তাঁর দাড়ি ধরে টানলো, তারপর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ছাড়লো।[৬]

এভাবে আবূ বকর (রা) সেদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে পাষণ্ডদের হাত থেকে মুহাম্মাদকে (সা) ছাড়ালেন। ছাড়া পেয়ে তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। মেয়ে ফাতিমা পিতার পিছনে পিছনে চললেন। পথে স্বাধীন ও দাস যাদের সাথে দেখা হলো প্রত্যেকেই নানা রকম অশালীন মন্তব্য ছুড়ে মেরে ভীষণ কষ্ট দিল। রাসূল (সা) সোজা বাড়ীতে গেলেন এবং মারাত্মক রকমের বিধ্বস্ত অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। বালিকা ফাতিমার চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটলো।[৭]

---

৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪; হায়াত আস-সাহাবা-১/২৭১; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৬

৬. ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৩১০

৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৫৯২

ফাতিমা শি'বু আবী তালিবে

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহর (সা) উপর নির্যাতন চালানোর নতুন পথ বেছে নিল। এবার তাদের নির্যাতনের হাত বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের প্রতিও সম্প্রসারিত হলো। মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে বয়কট করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে নত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে কেনাবেচা, কথা বলা ও উঠাবসা বন্ধ। একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিব মক্কার উপকণ্ঠে "শি'বু আবী তালিব"-এ আশ্রয় নেয়। তাদেরকে সেখানে অবরোধ করে রাখা হয়। অবরুদ্ধ জীবন এক সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। "শি'ব"-এর বাইরে থেকেও সে সময় ক্ষুধা-কাতর নারী ও শিশুদের আহাজারি ও কান্নার রোল শোনা যেত। এই অবরুদ্ধদের মধ্যে ফাতিমাও (রা) ছিলেন। এই অবরোধ তার স্বাস্থ্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। এখানে অনাহারে থেকে যে অপুষ্টির শিকার হন তা আমরণ বহন করে চলেন। এই অবরোধ প্রায় তিন বছর চলে।[৮]

অবরুদ্ধ জীবনের দুঃখ-বেদনা ভুলতে না ভুলতে তিনি আরেকটি বড় রকম দুঃখের মুখোমুখী হন। স্নেহময়ী মা হযরত খাদীজা (রা), যিনি তাঁদের সবাইকে আগলে রেখেছিলেন, যিনি অতি নীরবে পুণ্যময় নবীগৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন, ইনতিকাল করেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) যাবতীয় দায়িত্ব যেন কন্যা ফাতিমার উপর অর্পণ করে যান। তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে পিতার পাশে এসে দাঁড়ান। পিতার আদর ও স্নেহ বেশী মাত্রায় পেতে থাকেন। মদীনায় হিজরাতের আগ পর্যন্ত মক্কায় পিতার দা'ওয়াতী কার্যক্রমের সহযোগী হিসেবে অবদান রাখতে থাকেন। আর এ কারণেই তাঁর ডাকনাম হয়ে যায়– "উম্মু আবীহা" (তাঁর পিতার মা)।[৯]

হিজরাত ও ফাতিমা

যে রাতে রাসূল (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন সে রাতে 'আলী (রা) যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন, ফাতিমা (রা) অতি নিকট থেকে তা প্রত্যক্ষ করেন। 'আলী (রা) নিজের জীবন বাজি রেখে কুরায়শ পাষণ্ডদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলের (সা) বিছানায় শুয়ে থাকেন। সেই ভয়াবহ রাতে ফাতিমাও বাড়ীতে ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে কুরায়শদের সব চাপ প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর 'আলী (রা) তিন দিন মক্কায় থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করে মদীনায় পাড়ি জমান।

ফাতিমা ও তাঁর বোন উম্মু কুলছূম মক্কায় থাকলেন। রাসূল (সা) মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর পরিবারের লোকদের নেয়ার জন্য একজন সাহাবীকে পাঠালেন। আর সেটা ছিল নবুওয়াতের ১৩ তম বছরের ঘটনা। ফাতিমা (রা) তখন অষ্টাদশী। মদীনায় পৌঁছে

---

৮. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৬

৯. প্রাগুক্ত-২০৭; উসুদুল গাবা-৫/২৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৫০

তিনি দেখেন সেখানে মুহাজিররা শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছেন। বিদেশ-বিভূঁইয়ের একাকীত্বের অনুভূতি তাঁদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে। রাসূল (সা) মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। তিনি নিজে 'আলীকে (রা) দ্বীনি ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১০]

বিয়ে

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পরে 'আলীর (রা) সাথে ফাতিমার (রা) বিয়ে হয়। বিয়ের সঠিক সন তারিখ ও বিয়ের সময় ফাতিমা ও 'আলীর (রা) বয়স নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য দেখা যায়। একটি মত এরকম আছে যে, উহুদ যুদ্ধের পর বিয়ে হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) হযরত 'আয়িশাকে (রা) ঘরে উঠিয়ে নেয়ার চার মাস পরে 'আলী-ফাতিমার বিয়ে হয় এবং বিয়ের নয় মাস পরে তাঁদের বাসর হয়। বিয়ের সময় ফাতিমার (রা) বয়স পনেরো বছর সাড়ে পাঁচ মাস এবং আলীর (রা) বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস।[১১] ইবন 'আবদিল বার তাঁর "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে এবং ইবন সা'দ তাঁর "তাবাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আলী (রা) ফাতিমাকে (রা) বিয়ে করেন রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পাঁচ মাস পরে রজব মাসে এবং বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তাঁদের বাসর হয়। ফাতিমার বয়স তখন আঠারো বছর। তাবারীর তারীখে বলা হয়েছে, হিজরী দ্বিতীয় সনে হিজরাতের বাইশ মাসের মাথায় জিলহাজ্জ মাসে 'আলী-ফাতিমার (রা) বাসর হয়। বিয়ের সময় 'আলী (রা) ফাতিমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন।[১২]

আবূ বকর (রা) ও 'উমারের (রা) মত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীগণও ফাতিমাকে (রা) স্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবও দেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। হাকিমের মুসতাদরিক ও নাসাঈর সুনানে এসেছে যে, আবূ বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে বলেন : সে এখনো ছোট। একটি বর্ণনায় এসেছে, আবূ বকর প্রস্তাব দিলেন। রাসূল (সা) বললেন : আবূ বকর! তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আবূ বকর (রা) একথা 'উমারকে (রা) বললেন, 'উমার (রা) বললেন : তিনি তো আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর আবূ বকর (রা) 'উমারকে (রা) বললেন : এবার আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন। 'উমার (রা) প্রস্তাব দিলেন। রাসূল (সা) আবূ বকরকে যে কথা বলে ফিরিয়ে দেন, 'উমারকেও ঠিক একই কথা বলেন। 'উমার (রা) আবূ বকরকে সে কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন : 'উমার, তিনি আপনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৩] তারপর 'উমার (রা) 'আলীকে

---

১০. ইবন হিশাম-২/১৫০; আল-ইসতী'আব-৩/১৯৮

১১. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯

১২. প্রাগুক্ত; তাবাকাত-৮/১১; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৮

১৩. তাবাকাত-৮/১১; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৮

(রা) বলেন, আপনিই ফাতিমার উপযুক্ত পাত্র। 'আলী (রা) বলেন, আমার সম্পদের মধ্যে এই একটি মাত্র বর্ম ছাড়া তো আর কিছু নেই। আলী-ফাতিমার বিয়েটি কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা দেখা যায়। সেগুলো প্রায় কাছাকাছি। এখানে কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

তাবাকাতে ইবন সা'দ ও উসুদুল গাবা'র গ্রন্থের একটি বর্ণনা মতে 'আলী (রা) 'উমারের কথামত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে নিজ উদ্যোগে আলীর (রা) সাথে ফাতিমাকে বিয়ে দেন। এ খবর ফাতিমার কানে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূল (সা) ফাতিমার কাছে যান এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন : ফাতিমা! আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলী (রা) প্রস্তাব দানের পর রাসূল (সা) বলেন : ফাতিমা! 'আলী তোমাকে স্মরণ করে। ফাতিমা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। অতঃপর রাসূল (সা) বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

অন্য একটি বর্ণনা এ রকম : মদীনার আনসারদের কিছু লোক আলীকে বলেন : আপনার জন্য তো ফাতিমা আছে। একথার পর 'আলী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) বলেন : আবূ তালিবের ছেলের কি প্রয়োজন? আলী ফাতিমার প্রসঙ্গে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু বলেন : মারহাবান ওয়া আহলান। (পরিবারে সুস্বাগতম)। এর বেশী আর কিছু বললেন না। 'আলী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে উঠে অপেক্ষমান আনসারদের সেই দলটির কাছে গেলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো : পিছনের খবর কি? 'আলী বললেন : আমি জানিনে। তিনি আমাকে "মারহাবান ওয়া আহলান" ছাড়া আর কিছুই বলেননি। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে আপনাকে এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয়? তিনি আপনাকে পরিবারের সদস্য বলে স্বাগতম জানিয়েছেন। ফাতিমার সাথে কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সে সম্পর্কে আলীর (রা) বর্ণনা এ রকম : রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমার বিয়ের পয়গাম এলো। তখন আমার এক দাসী আমাকে বললেন : আপনি কি একথা জানেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমার বিয়ের পয়গাম এসেছে?

বললাম : না।

সে বললো : হাঁ, পয়গাম এসেছে। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কেন যাচ্ছেন না? আপনি গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে আপনার সাথেই বিয়ে দিবেন।

বললাম : বিয়ে করার মত আমার কিছু আছে কি?

সে বললো : যদি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান তাহলে তিনি অবশ্যই আপনার সাথে তাঁর বিয়ে দিবেন।

'আলী (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমাকে এভাবে আশা-ভরসা দিতে থাকে। অবশেষে আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। তাঁর সামনে বসার পর আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মধ্যে বিরাজমান গাম্ভীর্য ও ভীতির ভাবের

কারণে আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। এক সময় তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন : কি জন্য এসেছো? কোন প্রয়োজন আছে কি?

আলী (রা) বলেন : আমি চুপ করে থাকলাম। রাসূল (সা) বললেন : নিশ্চয় ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছো?

আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা দ্বারা তুমি তাকে হালাল করবে? বললাম : আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেই। তিনি বললেন : যে বর্মটি আমি তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা কি করেছো?

বললাম : সেটা আমার কাছে আছে। 'আলীর জীবন যে সত্তার হাতে তার কসম, সেটা তো একটি "হুতামী" বর্ম। তার দাম চার দিরহামও হবে না।

রাসূল (সা) বললেন : আমি তারই বিনিময়ে ফাতিমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং তা দ্বারাই তাকে হালাল করে নাও।

'আলী (রা) বলেন : এই ছিল ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) মাহর।[১৪]

'আলী (রা) খুব দ্রুত বাড়ী গিয়ে বর্মটি নিয়ে আসেন। কনেকে সাজগোজের জিনিসপত্র কেনার জন্য রাসূল (সা) সেটি বিক্রি করতে বলেন।[১৫] বর্মটি 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা) চার 'শো সত্তর (৪৭০) দিরহামে কেনেন। এই অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দেয়া হয়। তিনি তা বিলালের (রা) হাতে দিয়ে কিছু আতর-সুগন্ধি কিনতে বলেন, আর বাকী যা থাকে উম্মু সালামার (রা) হাতে দিতে বলেন। যাতে তিনি তা দিয়ে কনের সাজগোজের জিনিস কিনতে পারেন।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে রাসূল (সা) সাহাবীদের ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে চার 'শো মিছকাল রূপোর বিনিময়ে 'আলীর (রা) সাথে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর আরবের প্রথা অনুযায়ী কনের পক্ষ থেকে রাসূল (সা) ও বর 'আলী (রা) নিজে সংক্ষিপ্ত খুতবা দান করেন। তারপর উপস্থিত অতিথি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খোরমা ভর্তি একটা পাত্র উপস্থাপন করা হয়।[১৬]

ফাতিমা ও 'আলীর (রা) বিয়েতে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর (সা) খুতবা :[১৭]

الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه، المرغوب فيما عنده، النافذ أمره فى سمائه وأرضه الذى خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه،

---

১৪. দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৩/১৬০; উসুদুল গাবা-৫/২৫০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৩৪৬; তাবাকাত-৮/১২

১৫. সাহীহ আল-বুখারীও, কিতাব আল-বুয়ূ'; সুনানে নাসাঈ, কিতাব আন-নিকাহ; মুসনাদে আহমাদ-১/৯৩, ১০৪, ১০৮

১৬. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

১৭. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-৩/৩৪৪

وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة لاحقًا، وأمرا مفترضا، ووشج ربه الأرحام، وألزمه الانام، قال تبارك اسمه، وتعالى ذكره : "وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا." فأمر الله يجرى إلى قضائه ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجلٌ "يَمْحُو اللهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعنده أُمُّ الْكِتَابِ".

ثم إن ربى أمرنى أن أزوج فاطمة من على بن أبى طالب، وقد زوجتها إياه على اربعمائة مثقال فضة، إن رضى بذلك على.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে উপাস্য, শাস্তির কারণে ভীতিপ্রদ এবং তাঁর কাছে যা কিছু আছে তার জন্য প্রত্যাশিত। আসমান ও যমীনে তিনি স্বীয় হুকুম বাস্তবায়নকারী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিধি নিষেধ দ্বারা তাদেরকে পার্থক্য করেছেন, দীনের দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিবাহ ব্যবস্থাকে পরবর্তী বংশ রক্ষার উপায় এবং একটি অবশ্যকরণীয় কাজ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি জগতের জন্য অবধারিত করেছেন।

যাঁর নাম অতি বরকতময় এবং যাঁর স্মরণ সুমহান, তিনি বলেছেন : "তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার রব সবকিছু করতে সক্ষম।" সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি চূড়ান্ত পরিণতির একটি নির্ধারিত সময় আছে। আর প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ের একটি শেষ আছে। 'আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলীন করেন এবং বহাল রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।'

অতঃপর, আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন 'আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে দিই। আর আমি তাঁকে চার শো 'মিছকাল' রূপোর বিনিময়ে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি– যদি এতে আলী রাজী থাকে।'

রাসূলুল্লাহর (সা) খুতবার পর তৎকালীন আরবের প্রথা-অনুযায়ী বর 'আলী (রা) ছোট্ট একটি খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন :[১৮]

---

১৮. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৫

فان اجتماعنا مما قدره الله تعالى اورضيه، والنكاح مـاأمره الله بـه واذن فيـه، وهـذا محمد صلى الله عليه وسـلم قـد زوجنـي فاطمـة ابنتـه علـى صـداق اربعمائـة درهـم وثمانين درهما، ورضيت به فاسئلوه، وكفى بالله شهيدًا.

'আমাদের এই সমাবেশ, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিয়ে হলো আল্লাহ যার আদেশ করেছেন এবং যে ব্যাপারে অনুমতি দান করেছেন। এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কন্যা ফাতিমার সাথে চার শো আশি দিরহাম মাহরের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে রাজি হয়েছি। অতএব আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'

এভাবে অতি সাধারণ ও সাদাসিধে ভাবে 'আলীর সাথে নবী দুহিতা ফাতিমাতুয যাহরার শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

সংসার জীবন

মদীনায় আসার পর রজব মাসে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর আলী (রা) তাঁর স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য একটি ঘর ভাড়া করতে সক্ষম হন। সে ঘরে বিত্ত-বৈভবের কোন স্পর্শ ছিল না। সে ঘর ছিল অতি সাধারণ মানের। সেখানে কোন মূল্যবান আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, জাজিম, গদি কোন কিছুই ছিল না। 'আলীর ছিল কেবল একটি ভেড়ার চামড়া, সেটি বিছিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং দিনে সেটি মশকের কাজে ব্যবহার হতো। কোন চাকর-বাকর ছিল না।[১৯] আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) যিনি 'আলী-ফাতিমার (রা) বিয়ে ও তাঁদের বাসর ঘরের সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বলেছেন, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি বালিশ-বিছানা ছাড়া তাদের আর কিছু ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে 'আলীর (রা) ওলীমার চেয়ে ভালো কোন ওলীমা সে সময় আর হয়নি। সেই ওলীমা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা যায় এই বর্ণনা দ্বারা : 'আলী (রা) তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে কিছু যব আনেন।'[২০] তাঁদের বাসর রাতের খাবার কেমন ছিল তা এ বর্ণনা দ্বারা অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

তবে বানূ 'আবদিল মুত্তালিব এই বিয়ে উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ এমন একটা ভোজ অনুষ্ঠান করেছিল যে, তেমন অনুষ্ঠান নাকি এর আগে তারা আর করেনি। সাহীহাইন ও আল-ইসাবার বর্ণনা মতে তাহলো, হামযা (রা) যিনি মুহাম্মাদ (সা) ও 'আলী উভয়ের চাচা, দুটো বুড়ো উট যবেহ করে আত্মীয়-কুটুম্বদের খাইয়েছিলেন।[২১]

---

১৯. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯; তাবাকাত-৮/১৩; সাহাবিয়াত-১৪৮
২০. তাবাকাত-৮/২৩
২১. তারাজিমু বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আগত আত্মীয়-মেহমানগণ নব দম্পতির শুভ ও কল্যাণ কামনা করে একে একে বিদায় নিল। রাসূল (সা) উম্মু সালামাকে (রা) ডাকলেন এবং তাঁকে কনের সাথে 'আলীর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁদেরকে একথাও বলে দিলেন, তাঁরা যেন সেখানে তাঁর (রাসূল সা.) যাওয়ার অপেক্ষা করেন।

বিলাল (রা) 'ঈশার নামাযের আযান দিলেন। রাসূল (সা) মসজিদে জামা'আতের ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর 'আলীর (রা) বাড়ী গেলেন। একটু পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিলেন। সেই পানির কিছু বর-কনেকে পান করাতে বললেন। অবশিষ্ট পানি দিয়ে রাসূল (সা) নীচে ধরে রাখা একটি পাত্রের মধ্যে ওযূ করলেন। সেই পানি তাঁদের দু'জনের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর এই দু'আ করতে করতে যাওয়ার জন্য উঠলেন :[২২]

"اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما فى نسلهما."

'হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনকে কল্যাণ দান কর। হে আল্লাহ! তাদের বংশধারায় সমৃদ্ধি দান কর।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যাবার সময় তিনি মেয়েকে লক্ষ্য করে বলেন : ফাতিমা! আমার পরিবারের সবচেয়ে ভালো সদস্যের সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করিনি।[২৩]

ফাতিমা চোখের পানি সম্বরণ করতে পারেননি। পিতা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর পরিবেশকে হালকা করার জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে মেয়েকে বলেন : আমি তোমাকে সবচেয়ে শক্ত ঈমানের অধিকারী, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে ভালো নৈতিকতা ও উন্নত মন-মানসের অধিকারী ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।[২৪]

দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখী

পিতৃগৃহ থেকে ফাতিমা যে স্বামী গৃহে যান সেখানে কোন প্রাচুর্য ছিল না। বরং সেখানে যা ছিল তাকে দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতাই বলা সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে তাঁর অন্য বোনদের স্বামীদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভালো ছিল। যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল 'আসের (রা) সাথে। তিনি মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। রুকাইয়্যা ও উম্মু কুলছূমের (রা) বিয়ে হয় মক্কার বড় ধনী ব্যক্তি 'আবদুল 'উয্যা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের দুই ছেলের সাথে। ইসলামের কারণে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর একের পর একজন করে তাঁদের দু'জনেরই বিয়ে হয় 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফানের (রা) সাথে। আর 'উছমান (রা) ছিলেন একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তাঁদের তুলনায় 'আলী (রা)

---

২২. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯

২৩. তাবাকাত-৮/১৫, ২৮

২৪. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৮

ছিলেন একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ। তাঁর নিজের অর্জিত সম্পদ বলে যেমন কিছু ছিল না, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রেও কিছু পাননি। তাঁর পিতা মক্কার সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তবে তেমন অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলেন না। আর সন্তান ছিল অনেক। তাই বোঝা লাঘবের জন্য মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর চাচা 'আব্বাস তাঁর দুই ছেলের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। এভাবে 'আলী (রা) যুক্ত হন মুহাম্মাদের (সা) পরিবারের সাথে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, 'আলীর (রা) মত মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় বুদ্ধিমান যুবক এত সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে থাকলেন কেন? এর উত্তর 'আলীর (রা) জীবনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (সা) রাসূল হলেন। কিশোরদের মধ্যে 'আলী (রা) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স দশ বছর।[২৫] আর তখন থেকে তিনি নবী মুহাম্মাদের (সা) জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। নবী (সা) যত কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছেন, 'আলীকেও তার মুখোমুখী হতে হয়েছে। মক্কার অভিজাত লোকদের পেশা ছিল ব্যবসা। এখানে 'আলীর (রা) জীবন যেভাবে শুরু হয় তাতে এ পেশার সাথে জড়ানোর সুযোগ ছিল কোথায়? মক্কার কুরাইশদের সাথে ঠেলা-ধাক্কা করতেই তো কেটে যায় অনেকগুলো বছর। মদীনায় গেলেন একেবারে খালি হাতে। সেখানে নতুন জায়গায় নতুনভাবে দা'ওয়াতী কাজে জড়িয়ে পড়লেন। এর মধ্যে বদর যুদ্ধ এসে গেল। তিনি যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধের পর গনীমতের অংশ হিসেবে রাসূল (সা) তাকে একটি বর্ম দিলেন। এই প্রথম তিনি একটি সম্পদের মালিক হলেন।

'আলী (রা) যে একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ ছিলেন তা ফাতিমার জানা ছিল। তাই, বালাযুরীর বর্ণনা যদি সত্য হয়– রাসূল (সা) ফাতেমাকে যখন 'আলীর প্রস্তাবের কথা বলেন তখন ফাতিমা 'আলীর দারিদ্রের কথা উল্লেখ করেন। তার জবাবে রাসূল (সা) বলেন :

'সে দুনিয়াতে একজন নেতা এবং আখিরাতেও সে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হবে। সাহাবীদের মধ্যে তার জ্ঞান বেশী। সে একজন বিচক্ষণও। তাছাড়া সবার আগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'[২৬]

এই বর্ণনাটি সত্য হতেও পারে। কারণ, বিয়ে-শাদীর এ রকম পর্যায়ে অভাব-দারিদ্র বিবেচনায় আসা বিচিত্র কিছু নয়।

ফাতিমা (রা) আঠারো বছরে স্বামী গৃহে যান। সেখানে যে বিত্ত-বৈভবের কিছু মাত্র চিহ্ন ছিল না, সে কথা সব ঐতিহাসিকই বলেছেন। সেই ঘরে গিয়ে পেলেন খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ, বিছানা, এক জোড়া যাতা, দু'টো মশক, দু'টো পানির ঘড়

---

২৫. প্রাগুক্ত-৬১২

২৬. প্রাগুক্ত; হায়াত আস-সাহাবা-৩/২৫৬

আর আতর-সুগন্ধি। স্বামী দারিদ্রের কারণে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ-কর্মে তাঁকে সহায়তা করার জন্য অথবা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজগুলো করার জন্য কোন চাকর-চাকরানী দিতে পারেননি। ফাতিমা (রা) একাই সব ধরনের কাজ সম্পাদন করতেন। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়, মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে বুকে দাগ হয়ে যায় এবং ঘর-বাড়ী ঝাড়ু দিতে দিতে পরিহিত কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত।[২৭] তাঁর এভাবে কাজ করা 'আলী (রা) মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর করারও কিছু ছিল না। যতটুকু পারতেন নিজে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তিনি সব সময় ফাতিমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। কারণ, মক্কী জীবনে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে অপুষ্টির শিকার হন তাতে বেশ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ঘরে-বাইরে এভাবে দু'জনে কাজ করতে করতে তাঁরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একদিন 'আলী (রা) তাঁর মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইবনে হাশিমকে বলেন : তুমি পানি আনা ও বাইরের অন্যান্য কাজে রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েকে সাহায্য কর, আর ফাতিমা তোমাকে বাড়ীতে গম পেষা ও রুটি বানাতে সাহায্য করবে। এ সময় ফাতিমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীসহ বিজয়ীর বেশে একটি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরলেন। 'আলী (রা) একদিন বললেন : ফাতিমা! তোমার এমন কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু যুদ্ধ বন্দী দিয়েছেন। তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমার সেবার জন্য যুদ্ধ বন্দী একটি দাসের জন্য আবেদন জানাতে! ফাতিমা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় হাতের যাতা পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলেন : আমি যাব ইনশা আল্লাহ। তারপর বাড়ীর আঙ্গিনায় একটু বিশ্রাম নিয়ে চাদর দিয়ে গা-মাথা ঢেকে ধীর পায়ে পিতৃগৃহের দিকে বেরিয়ে গেলেন। পিতা তাঁকে দেখে কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : মেয়ে! কেন এসেছো? ফাতিমা বললেন : আপনাকে সালাম করতে এসেছি। তিনি লজ্জায় পিতাকে মনের কথাটি বলতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এলেন এবং স্বামীকে সে কথা বললেন। 'আলী (রা) এবার ফাতিমাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। ফাতিমা পিতার সামনে লজ্জায় মুখ নীচু করে নিজের প্রয়োজনের কথাটি এবার বলে ফেলেন। পিতা তাঁকে বলেন : আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে আমি একটি দাসও দিব না। আহ্‌লুস সুফ্‌ফার লোকেরা না খেয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে। তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছিনে। এগুলো বিক্রি করে সেই অর্থ আমি তাদের জন্য খরচ করবো।

একথা শোনার পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন পিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। তাঁদেরকে এভাবে খালি হাতে ফেরত দিয়ে স্নেহশীল পিতা যে পরম শান্তিতে থাকতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়। সারাটি দিন কর্মক্লান্ত আদরের মেয়েটির চেহারা তাঁর মনের মধ্যে ভাসতে থাকে।

সন্ধ্যা হলো। ঠাণ্ডাও ছিল প্রচণ্ড। 'আলী-ফাতিমা শক্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা

২৭. তাবাকাত-৮/১৫৯; আল-ইসাবা-৪/৪৫০

করছেন। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় কি ঘুম আসে? এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পান পিতা মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) দাঁড়িয়ে। তিনি দেখতে পান, এই প্রবল শীতে মেয়ে-জামাই যে কম্বলটি গায়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে তা এত ছোট যে দু'জন কোন রকম গুটিশুঁটি মেরে থাকা যায়। মাথার দিকে টানলে পায়ের দিকে বেরিয়ে যায়। আবার পায়ের দিকে সরিয়ে দিলে মাথার দিক আলগা হয়ে যায়। তাঁরা এই মহান অতিথিকে স্বাগতম জানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে ব্যস্ত না হয়ে যে অবস্থায় আছে সেভাবে থাকতে বলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তারপর কোমল সুরে বলেন : তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছিলে তার চেয়ে ভালো কিছু কি আমি তোমাদেরকে বলে দিব?

তাঁরা দু'জনই এক সাথে বলে উঠলেন : বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেন : জিবরীল আমাকে এই কথাগুলো শিখিয়েছেন : প্রত্যেক নামাযের পরে তোমরা দু'জন দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবর পাঠ করবে। আর রাতে যখন বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পাঠ করবে। একথা বলে তিনি মেয়ে-জামাইকে রেখে দ্রুত চলে যান।[২৮]

এ ঘটনার শত বর্ষের এক তৃতীয়াংশ সময় পরেও ইমাম 'আলীকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) শিখানো এই কথাগুলো আলোচনা করতে শোনা গেছে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এই কথাগুলো শিখানোর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি একদিনও তা বাদ দিইনি। একবার একজন ইরাকী প্রশ্ন করেন : সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সেই ঘোরতর রাতেও না? তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন : সিফ্‌ফীনের সেই রাতেও না।[২৯]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। আলী (রা) একবার দারুণ অভাব-অনটনে পড়লেন। একদিন স্ত্রী ফাতিমাকে (রা) বললেন, যদি তুমি নবী (সা)-এর নিকট গিয়ে কিছু চেয়ে আনতে তাহলে ভালো হতো। ফাতিমা (রা) গেলেন। তখন নবীর (সা) নিকট উম্মু আয়মন (রা) বসা ছিলেন। ফাতিমা দরজায় টোকা দিলেন। নবী (সা) উম্মু আয়মনকে বললেন : নিশ্চয় এটা ফাতিমার হাতের টোকা। এমন সময় সে আমাদের নিকট এসেছে যখন সে সাধারণতঃ আসতে অভ্যস্ত নয়। ফাতিমা (রা) ঘরে ঢুকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফেরেশতাদের খাদ্য হলো তাসবীহ-তাহ্‌লীল ও তাহমীদ। কিন্তু আমাদের খাবার কি? বললেন : সেই সত্তার শপথ যিনি আমাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, মুহাম্মাদের পরিবারের রান্না ঘরে তিরিশ দিন যাবত আগুন জ্বলে না। আমার নিকট কিছু ছাগল এসেছে, তুমি চাইলে পাঁচটি ছাগল তোমাকে দিতে পারি। আর তুমি

---

২৮. হাদীছটি সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তাবাকাত-৮/২৫; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১১-দ্র.।

২৯. সাহীহ মুসলিম; আদ-দু'আ, খণ্ড-৪, হাদীছ নং-২০৯১; তাবাকাত-৮/১৯

যদি চাও এর পরিবর্তে আমি তোমাকে পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিতে পারি যা জিবরীল আমাকে শিখিয়েছেন।
ফাতিমা (রা) বললেন : আপনি বরং আমাকে সেই পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিন যা জিরবীল আপনাকে শিখিয়েছেন। নবী (সা) বললেন, বল :

يَاأَوَّلَ الأَوَّلِيْنَ، يَاآخِرِ الآخِرِيْـنَ، وَيَـاذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْـنَ، وَيَـارَاحِمَ الْمَسَـاكِيْنَ. يَـاأرحم الراحمين.

এই পাঁচটি কথা শিখে ফাতিমা (রা) ফিরে গেলেন 'আলীর (রা) নিকট। ফাতিমাকে দেখে 'আলী (রা) প্রশ্ন করলেন : খবর কি? ফাতিমা বললেন : আমি দুনিয়া পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তোমার নিকট থেকে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে এসেছি আখিরাত নিয়ে। 'আলী (রা) বললেন : আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।[৩০]

ছোটখাট দাম্পত্য কলহ

সেই কৈশোরে একটু বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হযরত ফাতিমা যে অবস্থায় যৌবনের এ পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাতে আনন্দ-ফুর্তি যে কি জিনিস তাতো তিনি জানেন না। পিতা তাঁর কাছ থেকে নিকটে বা দূরে যেখানেই থাকেন না কেন সবসময় তাঁর জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোন অন্ত থাকেনা। তিনি যখন যুদ্ধে যান তখন তা আরো শত গুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই পিতাকে আগলে রাখতে রাখতে তাঁর নিজের মধ্যেও একটা সংগ্রামী চেতনা গড়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যান। উহুদ যুদ্ধে তাই তাঁকে আহত যোদ্ধাদেরকে পট্টি বাঁধতে, তাদের ক্ষতে ঔষুধ লাগাতে এবং মৃত্যুপথযাত্রী শহীদদেরকে পানি পান করাতে দেখা যায়। যখন ঘরে থাকতেন তখন চাইতেন স্বামীর সোহাগভরা কোমল আচরণ। কিন্তু আলীর (রা) জীবনের যে ইতিহাস তাতে তাঁর মধ্যে এই কোমলতার সুযোগ কোথায়? তাঁর জীবনের গোটাটাই তো হলো কঠোর সংগ্রাম, তাই তাঁর মধ্যে কিছুটা রূঢ়তা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ফলে তাঁদের সম্পর্ক মাঝে মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। পিতার কানেও সে কথা পৌঁছে যেত। তিনি ছুটে যেতেন এবং ধৈর্যের সাথে দু'জনের মধ্যে আপোষ রফা করে দিতেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসূলকে (সা) সন্ধ্যার সময় একটু ব্যস্ততার সাথে মেয়ের বাড়ীর দিকে যেতে দেখা গেল, চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাব। কিছুক্ষণ পর যখন সেখান থেকে বের হলেন তখন তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে এক অবস্থায় ঢুকতে দেখলাম, আর এখন বের হচ্ছেন হাসি-খুশী অবস্থায়!
তিনি জবাব দিলেন : আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় দু'জনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দিলাম তাতে আমি খুশী হবো না।[৩১]

---

৩০. কানয আল-'উম্মাল-১/৩০২; হায়াত আস-সাহাবা-১/৪৩
৩১. তাবাকাত-৮/৪৯৯; আল-ইসাবা-৪/৩৬৮; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১

আরেকবার ফাতিমা (রা) 'আলীর (রা) রূঢ়তায় কষ্ট পান। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নালিশ জানাবো– একথা বলে ঘর থেকে বের হন। 'আলীও (রা) তাঁর পিছে পিছে চলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর প্রতি যে কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন তা পিতাকে বলেন, মহান পিতা বেশ নরমভাবে বুঝিয়ে তাঁকে খুশী করেন। 'আলী (রা) স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বলেন : আল্লাহর কসম! তুমি অখুশী হও এমন কিছুই আমি আর কখনো করবো না।[৩২]

ফাতিমার বর্তমানে আলীর (রা) দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা

ফাতিমা (রা) না চাইলেও এমন কিছু ঘটনা ঘটতো যা তাঁকে ভীষণ বিচলিত করে তুলতো। তাঁর স্বামী আরেকটি বিয়ে করে ঘরে সতীন এনে উঠাবে ফাতিমা তা মোটেই মেনে নিতে পারেন না। 'আলী (রা) আরেকটি বিয়ের ইচ্ছা করলেন। তিনি সহজভাবে হিসাব কষলেন, শরী'আতের বিধান মতে আরেকটি বিয়ে করা তো বৈধ। অন্য মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন এক সাথে চারজনকে রাখা বৈধ তেমনিভাবে নবীর (সা) মেয়ের সাথেও অন্য আরেকজন স্ত্রীকে ঘরে আনাতে কোন দোষ নেই। তিনি ধারণা করলেন, এতে ফাতিমা তাঁর প্রতি তেমন ক্ষ্যাপবেন না। কারণ, তাঁর পিতৃগৃহেই তো এর নজীর আছে। 'আয়িশা, হাফসা ও উম্মু সালামা (রা) তো এক সাথেই আছেন। তাছাড়া একবার বানূ মাখযূমের এক মহিলা চুরি করলে তার শাস্তি মওকুফের জন্য মহিলার আত্মীয়রা উসামা ইবন যায়িদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন করে। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন : তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি রহিত করার জন্য সুপারিশ করছো? তারপর তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে এই জন্য যে, তাদের কোন সম্মানীয় ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর "হদ" বা র্নিধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে আমি তার হাত কেটে দেব।[৩৩] এ বক্তব্যের দ্বারা 'আলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফাতিমাও তো অন্য আর দশজন মুসলিম মেয়ের মত।

এমন একটি সরল হিসেবে 'আলী (রা) আরেকটি বিয়ের চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া যে এত মারাত্মক হবে 'আলীর (রা) কল্পনায়ও তা আসেনি। 'আমর ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন, একথা প্রকাশ করতেই ফাতিমা ক্ষোভে-উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। রাসূলও (সা) রাগান্বিত হলেন। 'আমর ইবন হিশাম তথা আবূ জাহলের মেয়ের সাথে 'আলীর বিয়ের প্রস্তাবের কথা ফাতিমার কানে যেতেই তিনি পিতার কাছে ছুটে যেয়ে অনুযোগের সুরে বলেন : আপনার

---

৩২. তাবাকাত-৮/২৬; আল-ইসাবা-৪/৩৬৮

৩৩. সাহীহ আল-বুখারী : আল-আম্বিয়া; মুসলিম : আল-হুদূদ; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬১৮

সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করে, আপনার মেয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলেও আপনি রাগ করেন না। এই 'আলী তো এখন আবূ জাহলের মেয়েকে বিয়ে করছে।[৩৪]

আসলে কথাটি শুনে রাসূল (সা) দারুণ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু বিষয়টি ছিল বেশ জটিল। কারণ, এখানে 'আলীর (রা) অধিকারের প্রশ্নও জড়িত ছিল। ফাতিমাকে রেখেও 'আলী আরো একাধিক বিয়ে করতে পারেন। সে অধিকার আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন। এ অধিকারে রাসূল (সা) কিভাবে বাধা দিবেন? অন্যদিকে কলিজার টুকরো মেয়েকে সতীনের ঘর করতে হবে এটাও বড় দুঃখের ব্যাপার। তাই বলে আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা কি তিনি হারাম করতে পারেন? না, তা পারেন না। তবে এখানে সমস্যাটির আরেকটি দিক আছে। তা হলো আলীর প্রস্তাবিত কনে আবূ জাহ্ল 'আমর ইবন হিশামের মেয়ে। 'আলীর গৃহে তাঁর স্ত্রী হিসেবে আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে এক সাথে অবস্থান করতে পারে?

এই সেই আবূ জাহ্ল, ইসলামের প্রতি যার নিকৃষ্ট শত্রুতা এবং নবী (সা) ও মুসলমানদের উপর নির্দয় যুলুম-নির্যাতনের কথা নবী (সা) ও মুসলমানদের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি। আল্লাহর এই দুশমন একদিন কুরাইশদেরকে বলেছিল : "ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! তোমরা এই মুহাম্মাদকে আমাদের উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে বেড়াতে, আমাদের পূর্বপুরুষকে গালিগালাজ করতে এবং আমাদের বুদ্ধিমান লোকদেরকে বোকা ও নির্বোধ বলে বেড়াতে দেখছো, তা থেকে সে বিরত হবে না। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আগামীকাল আমি বহন করতে সক্ষম এমন একটি বড় পাথর নিয়ে বসে থাকবো। যখনই সে সিজদায় যাবে অমনি সেই পাথরটি দিয়ে আমি তার মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। তখন তোমরা আমাকে বানূ আবদি মান্নাফের হাতে সোপর্দ অথবা তাদের হাত থেকে রক্ষা, যা খুশী তাই করবে।"[৩৫]

সে কুরাইশদের সমাবেশে নবী মুহাম্মাদকে (সা) বিদ্রূপ করে বলে বেড়াতো : 'ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! মুহাম্মাদ মনে করে দোযখে আল্লাহর যে সৈনিকরা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে এবং বন্দী করে রাখবে তাদের সংখ্যা মাত্র উনিশজন। তোমরা তো তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। তোমাদের প্রতি এক শো' জনে কি তাদের একজনকে রুখে দিতে পারবে না?' তখন নাযিল হয় কুরআনের এ আয়াত :

"وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا. (المدثر : ٣١)

'আমি ফেরেশতাগণকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি।[৩৬]

এই সেই আবূ জাহ্ল যে আখনাস ইবন শুরায়ককে যখন সে তার কাছে তার শোনা

---

৩৪. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২১৫

৩৫. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-১/৩১৯; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬১৯

৩৬. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-১/৩৩৩, ৩৩৫

কুরআন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, বলেছিল : তুমি কী শুনেছো? আমরা ও বানূ 'আবদি মান্নাফ মর্যাদা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করলাম। তারা মানুষকে আহার করালো, আমরাও করালাম। তারা মানুষের দায়িত্ব কাঁধে নিল আমরাও নিলাম। তারা মানুষকে দান করলো; আমরাও করলাম। এভাবে আমরা যখন বাজির দুই ঘোড়ার মত সমান সমান হয়ে গেলাম তখন তারা বললো : আমাদের মধ্যে নবী আছে, আকাশ থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে। এখন এ নবী আমরা কিভাবে পাব? আল্লাহর কসম! আমি কক্ষনো তার প্রতি ঈমানও আনবো না, তাকে বিশ্বাসও করবো না।[৩৭]

এ সেই আবূ জাহ্‌ল যে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনতে পেলে তাকে ভয়-ভীতি দেখাতো, হেয় ও অপমান করতো। বলতো : 'তুমি তোমার পিতাকে, যে তোমার চেয়ে ভালো ছিল, ত্যাগ করেছো? তোমার বুদ্ধিমত্তাকে আমরা নির্বুদ্ধিতা বলে প্রচার করবো, তোমার মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমরা ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠা করবো এবং তোমার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিব।'

আর যদি কোন ব্যবসায়ী ইসলাম গ্রহণ করতো, তাকে বলতো : 'আল্লাহর কসম! আমরা তোমার ব্যবসা লাটে উঠাবো, তোমার অর্থ-সম্পদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো।' আর ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল হলে দৈহিক শাস্তি দিয়ে তাকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিত।

এ সেই আবূ জাহ্‌ল যে মক্কার শি'আবে আবী তালিবের অবরোধকালে হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদকে তাঁর ফুফু খাদীজার (রা) জন্য সামান্য কিছু খাবার নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল : 'তুমি বানূ হাশিমের জন্য খাদ্য নিয়ে যাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এ খাবার নিয়ে তুমি যেতে পারবে না। মক্কায় চলো, তোমাকে আমি অপমান করবো। সে পথ ছাড়তে অস্বীকার করলো। সেদিন দু'জনের মধ্যে বেশ মারপিট হয়। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় :[৩৮]

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ-طَعَامُ الْأَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ -

'নিশ্চয় যাক্‌কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মত তাদের পেটে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত।'

এই আবূ জাহ্‌ল মক্কায় আগত নাজরানের একটি খ্রীস্টান প্রতিনিধি দলের মুখোমুখী হয়। তারা এসেছিল মক্কায় মুহাম্মাদের (সা) নুবুওয়াত লাভের খবর পেয়ে তাঁর সম্পর্কে আরো তথ্য লাভের উদ্দেশ্যে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর কথা শুনে ঈমান আনে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পরই আবূ জাহ্‌ল তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে :

'আল্লাহ তোমাদের কাফেলাটিকে ব্যর্থ করুন। পিছনে ছেড়ে আসা তোমাদের

---

৩৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২০

৩৮. সূরা আদ-দুখান-৪৩-৪৬; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-২/২২, ১২৬, ১৩২

স্বধর্মাবলম্বীরা তোমাদেরকে পাঠিয়েছে এই লোকটি সম্পর্কে তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। তার কাছে তোমরা একটু স্থির হয়ে বসতে না বসতেই তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বসলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলার কথা আমার জানা নেই।'[৩৯]

এই আবূ জাহ্‌ল রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের অব্যবহিত পূর্বে কুরাইশদেরকে বলেছিল, কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে একজন করে সাহসী ও চালাক-চতুর যুবক নির্বাচন করে তার হাতে একটি করে তীক্ষ্ণ তরবারি তুলে দেবে। তারপর একযোগে মুহাম্মাদের উপর হামলা চালিয়ে এক ব্যক্তির মত এককোপে তাকে হত্যা করবে। তাতে তার রক্তের দায়-দায়িত্ব কুরাইশ গোত্রের সকল শাখার উপর সমানভাবে বর্তাবে।[৪০]

রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। পরের দিন সকালে কুরাইশরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌লও ছিল। তারা আবূ বকরের (রা) বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিতে আরম্ভ করলো– আবূ বকরের (রা) মেয়ে আসমা' (রা) বেরিয়ে এলেন। তারা প্রশ্ন করলো : তোমার আব্বা কোথায়? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমার আব্বা কোথায় তা আমার জানা নেই। তখন যাবতীয় অশ্লীল ও দুষ্কর্মের হোতা আবূ জাহ্‌ল তার হাতটি উঠিয়ে সজোরে আসমা'র গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আসমা'র কানের দুলটি ছিট্‌কে পড়ে।

বদরে যখন দু'পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার তোড়-জোড় করছে তখন কুরাইশ বাহিনী একজন লোককে পাঠালো শত্রু বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আসার জন্য। সে ফিরে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদ গেলেন 'উতবা ইবন রাবী'আর নিকট এবং তাকে লোক-লস্করসহ ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। 'উতবা নিমরাজি ভাব প্রকাশ করে সে হাকীমকে আবূ জাহ্‌লের নিকট পাঠালো। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল যুদ্ধ ছাড়া হাকীমের কথা কানেই তুললো না।

এ সেই আবূ জাহ্‌ল, বদরের দিন রাসূল (সা) যে সাতজন কট্টর কাফিরের প্রতি বদ-দু'আ করেন, সে তাদের অন্যতম। এ যুদ্ধে সে অভিশপ্ত কাফির হিসেবে নিহত হয়। তার মাথাটি কেটে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আনা হলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন।[৪১] রাসূল (সা) আবূ জাহ্‌লের উটটি নিজের কাছে রেখে দেন। এর চার বছর পর 'উমরার উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে যাত্রা করেন তখন উটটি কুরবানীর পশু হিসেবে সংগে নিয়ে চলেন। পথে হুদায়বিয়াতে কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই উটটি কুরবানী করেন।[৪২]

---

৩৯. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত

৪০. তাবাকাত-২/১৫, ১৭

৪১. প্রাগুক্ত; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২১

৪২. তাবাকাত-২/৬৯

ইসলামের এহেন দুশমন ব্যক্তির মেয়ে কি রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ফাতিমার (রা) সতীন হতে পারে? তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূল (সা) রাগান্বিত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে যান এবং সোজা মিম্বরে গিয়ে ওঠেন। তারপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দেন :

'বানূ হিশাম ইবন আল-মুগীরা 'আলীর সাথে তাদের মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার অনুমতি চায়। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। তবে 'আলী ইচ্ছা করলে আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। কারণ, আমার মেয়ে আমার দেহের একটি অংশের মত। তাকে যা কিছু অস্থির করে তা আমাকেও অস্থির করে, আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। আমি তার দীনের ব্যাপারে সঙ্কটে পড়ার ভয় করছি।

তারপর তিনি তাঁর জামাই আবুল 'আসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তার সাথে বৈবাহিক আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন :

'সে আমাকে কথা দিয়েছে এবং সে কথা সত্য প্রমাণিত করেছে। সে আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে এবং তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারাম করতে পারবো না। তেমনিভাবে হারামকেও হালাল করতে পারবো না। তবে আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ের কখনো সহ অবস্থান হতে পারে না।'[৪৩]

'আলী (রা) মসজিদে ছিলেন। চুপচাপ বসে শ্বশুরের বক্তব্য শুনলেন। তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে ধীর পায়ে বাড়ীর পথ ধরলেন। এক সময় বাড়ীতে পৌঁছলেন, সেখানে দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত ফাতিমা বসা আছেন। 'আলী (রা) আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। কি বলবেন তা যেন স্থির করতে পারছেন না। যখন দেখলেন ফাতিমা কাঁদছেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আস্তে করে বলেন :

'ফাতিমা! 'তোমার অধিকারের ব্যাপারে আমার ভুল হয়েছে। তোমার মত ব্যক্তিরা ক্ষমা করতে পারে।' অনেক্ষণ কেটে গেল, ফাতিমা কোন জবাব দিলেন না। তারপর এক সময় বললেন : 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' এবার 'আলী (রা) একটু সহজ হলেন। তারপর মসজিদের সব ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করেন। তাঁকে একথাও বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ের সহঅবস্থান কক্ষনো সম্ভব নয়। ফাতিমার দু' চোখ পানিতে ভরে গেল। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।[৪৪]

---

৪৩. হাদীছটি সাহীহ আল-বুখারী, আল-মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে ইবন মাজাহ্, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আহমাদ (৬/৩২৬, ৩২৮) সহ হাদীছের প্রায় সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৪৪. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৪

Contents

দ্বিতীয় বিয়ের অভিপ্রায়ের এ ঘটনাটি ঘটেছিল কখন

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো– 'আলী (রা) কখন এই দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা করেছিলেন? ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহর (সা) উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি বর্ণিত হলেও কেউ তার সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। অথচ এটা নবীর (সা) জীবন ও তাঁর পরিবারের জন্য ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটা ছিল 'আলী-ফাতিমার (রা) বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। আর সুনির্দিষ্টভাবে তা হয়তো হবে হিজরী দ্বিতীয় সন, তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসান হওয়ার পূর্বে। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক মতামত; এর সপক্ষে কোন বর্ণনামূলক দলিল-প্রমাণ নেই।[৪৫]

হাসান-হুসায়নের জন্ম

'আলী-ফাতিমার (রা) জীবনে যে মেঘ ভর করেছিল তা কেটে গেল, জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তারা উৎরে গেলেন। অভাব ও টানাটানির সংসারটি আবার প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতায় ভরে গেল। এরই মধ্যে হিজরী তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসানের জন্ম হলো। ফাতিমার পিতা নবীকে (সা) এ সুসংবাদ দেয়া হলো। তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন এবং আদরের মেয়ে ফাতিমার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে দু'হাতে তুলে তার কানে আযান দেন এবং গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। গোটা মদীনা যেনো আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। রাসূল (সা) দৌহিত্র হাসানের মাথা মুড়িয়ে তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রূপা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করে দেন। শিশু হাসানের বয়স এক বছরের কিছু বেশী হতে না হতেই চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসে ফাতিমা (রা) আরেকটি সন্তান উপহার দেন। আর এই শিশু হলেন হুসায়ন।[৪৬]

আবূ জাহলের সেই কন্যার নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে "জুওয়ায়বিয়া"। তাছাড়া আল-'আওরা', আল-হানকা', জাহ্দাম ও জামীলাও বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বায়'আত হন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীছও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন।[৪৭]

'আলী (রা) তাঁর পয়গাম প্রত্যাহার করে নেন এবং আবূ জাহলের কন্যাকে 'উত্তাব ইবন উসায়দ বিয়ে করেন।

এ ঘটনার পর হযরত ফাতিমা (রা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'আলীর (রা) একক স্ত্রী হিসেবে অতিবাহিত করেন। ফাতিমার (রা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ফাতিমা হাসান, হুসায়ন, উম্মু কুলছূম ও যায়নাব– এ চার সন্তানের মা হন।

---

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব; মুসলিম-আল-ফাদায়িল

৪৭. আ'লাম-আন-নিসা'-৪/১১২; টীকা নং-১

তিনি শিশু হাসানকে দু'হাতের উপর রেখে দোলাতে দোলাতে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করতেন :[৪৮]

إن بني شبه النبي ليس شبيها بعلي.

'আমার সন্তান নবীর মত দেখতে, 'আলীর মত নয়।'

হাসান-হুসায়নের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ-আদর

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অতি আদরের এ দুই দৌহিত্র যেমন তাঁর অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে তেমনি তাঁদের মা আয-যাহ্‌রার দু' কোল ভরে দেয়। হযরত খাদীজার (রা) ওফাতের পর রাসূল (সা) বেশ কয়েকজন নারীকে বেগমের মর্যাদা দান করেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেননি। পুত্র সন্তানের যে অভাববোধ তাঁর মধ্যে ছিল তা এই দুই দৌহিত্রকে পেয়ে দূর হয়ে যায়। এ পৃথিবীতে তাঁদের মাধ্যমে নিজের বংশধারা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হন। এ কারণে তাঁর পিতৃস্নেহও তাঁদের উপর গিয়ে পড়ে। আর তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি তাঁদের দু'জনকে নিজের ছেলে হিসেবে অভিহিত করেছেন। আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) ফাতিমাকে (রা) বলতেন, আমার ছেলে দুটোকে ডাক। তাঁরা নিকটে এলে তিনি তাঁদের দেহের গন্ধ শুঁকতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন।[৪৯] হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেছেন, আমি একদিন কোন একটি প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। তিনি গায়ের চাদরে কিছু জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না চাদরে জড়ানো কি জিনিস। আমার কাজ শেষ হলে প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চাদরে ঢেকে রেখেছেন কি জিনিস?

তিনি চাদরটি সরালে দেখলাম, হাসান ও হুসায়ন। তারপর তিনি বললেন : এরা দু'জন হলো আমার ছেলে এবং আমার মেয়ের ছেলে। হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন। আর তাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসুন।[৫০]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ফাতিমা আয-যাহ্‌রা'র প্রতি বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে প্রিয় নবী মুসতাফার (সা) বংশধারা সংরক্ষণ করেছেন। তেমনিভাবে 'আলীর (রা) ঔরসে সর্বশেষ নবীর বংশধারা দান করে আল্লাহ তাঁকেও এক চিরকালীন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম জামাই। তাঁর দেহে পরিচ্ছন্ন হাশেমী রক্ত বহমান ছিল। রাসূল (সা) ও 'আলীর (রা) নসব 'আবদুল মুত্তালিবে গিয়ে মিলিত হয়েছে। উভয়ে ছিলেন তাঁর পৌত্র। 'আলীর (রা) পিতা আবূ তালিব মুহাম্মাদকে (সা) পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন।

৪৮. প্রাগুক্ত-৪/১১৩
৪৯. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৬
৫০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/২৫১

পরবর্তীতে মুহাম্মাদ (সা) সেই পিতৃতুল্য চাচার ছেলে 'আলীকে পিতৃস্নেহে পালন করে নিজের কলিজার টুকরা কন্যাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আলীর (রা) স্থান ও মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চে। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

একদিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলাম : আমি ও ফাতিমা– এ দু'জনের কে আপনার বেশী প্রিয়? বললেন : ফাতিমা তোমার চেয়ে আমার বেশী প্রিয়। আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে বেশী সম্মানের পাত্র।

এ জবাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমা ও 'আলীর (রা) স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণে শত ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যেতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এই দম্পতির গৃহে এবং অতি আদরের দৌহিত্রদ্বয়কে কোলে তুলে নিয়ে স্নেহের পরশ বুলাতেন। একদিন তাঁদের গৃহে যেয়ে দেখেন, 'আলী-ফাতিমা ঘুমিয়ে আছেন, আর শিশু হাসান খাবারের জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে। তিনি তাঁদের দু'জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না। হাসানকে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় বাধা একটি ছাগীর কাছে চলে যান এবং নিজ হাতে ছাগীর দুধ দুইয়ে হাসানকে পান করিয়ে তাকে শান্ত করেন।

আর একদিনের ঘটনা। রাসূল (সা) ফাতিমা-'আলীর (রা) বাড়ীর পাশ দিয়ে ব্যস্ততার সাথে কোথাও যাচ্ছেন। এমন সময় হুসায়নের কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে গেল। তিনি বাড়ীতে ঢুকে মেয়েকে তিরস্কারের সুরে বললেন : তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?[৫১]

কন্যা যায়নাব ও উম্মু কুলছুমের জন্ম

এরপর এ দম্পতির সন্তান সংখ্যা বাড়তে থাকে। হিজরী ৫ম সনে ফাতিমা (রা) প্রথম কন্যার মা হন। নানা রাসূল (সা) তার নাম রাখেন "যায়নাব"। উল্লেখ্য যে, ফাতিমার এক সহোদরার নাম ছিল "যয়নাব", মদীনায় হিজরাতের পর ইনতিকাল করেন। সেই যয়নাবের স্মৃতি তাঁর পিতা ও বোনের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। সেই খালার নামে ফাতিমার এই কন্যার নাম রাখা হয়। এর দু'বছর পর ফাতিমা (রা) দ্বিতীয় কন্যার মা হন। তারও নাম রাখেন নানা রাসূল (সা) নিজের আরেক মৃত কন্যা উম্মু কুলছূমের নামে। এভাবে হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর কন্যার মাধ্যমে নিজের মৃত দু'বোনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেন। ফাতিমার (রা) এ চার সন্তানকে জীবিত রেখেই রাসূল (সা) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

ফাতিমার (রা) সব সন্তানই ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কলিজার টুকরা। বিশেষতঃ হাসান ও হুসায়নের মধ্যে তিনি যেন নিজের পরলোকগত পুত্র সন্তানদেরকে খুঁজে পান। তাই তাদের প্রতি ছিল বিশেষ মুহাব্বত। একদিন তিনি তাদের একজনকে

৫১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৭

কাঁধে করে মদীনার বাজারে ঘুরছেন। নামাযের সময় হলে তিনি মসজিদে ঢুকলেন এবং তাকে খুব আদরের সাথে এক পাশে বসিয়ে নামাযের ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সিজদায় কাটালেন যে পিছনের মুক্তাদিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। নামায শেষে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত লম্বা সিজদা করেছেন যে, আমরা ধারণা করেছিলাম কিছু একটা ঘটেছে অথবা ওহী নাযিল হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন : না, তেমন কিছু ঘটেনি। আসল ঘটনা হলো, আমার ছেলে আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। আমি চেয়েছি তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তাই তাড়াতাড়ি করিনি।[৫২]

একদিন রাসূল (সা) মিম্বরের উপর বসে ভাষণ দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন হাসান ও হুসায়ন দুই ভাই লাল জামা পরে উঠা-পড়া অবস্থায় হেঁটে আসছে। তিনি ভাষণ বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদের দু'জনকে উঠিয়ে সামনে এনে বসান। তারপর তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন : আল্লাহ সত্যই বলেছেন :[৫৩]

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ।'

আমি দেখলাম, এই শিশু দু'টি হাঁটছে আর পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে এনেছি।

আরেকদিন তো দেখা গেল, শিশু হুসায়নের দু'কাঁধের উপর রাসূলের (সা) হাত। আর তার দু'পা রাসূলের দু'পায়ের উপর। তিনি তাকে শক্ত করে ধরে বলছেন, উপরে বেয়ে ওঠো। হুসায়ন উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় নানার বুকে পা রাখলো। এবার তিনি হুসায়নকে বললেন : মুখ খোল। সে হা করলো। তিনি তার মুখে চুমু দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি এবং সেও আমাকে ভালোবাসে। তাকে যারা ভালোবাসে আপনি তাদের ভালোবাসুন।[৫৪]

একদিন রাসূল (সা) কয়েকজন সাহাবীকে সংগে করে কোথাও দা'ওয়াত খেতে যাচ্ছেন। পথে হুসায়নকে তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে দেখলেন। রাসূল (সা) দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলেন। সে নানার হাতে ধরা না দেওয়ার জন্য একবার এদিক, একবার ওদিক পালাতে থাকে। রাসূল (সা) হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এক সময় তাকে ধরে নিজের একটি হাতের উপর বসান এবং অন্য হাতটি তার চিবুকের নীচে রেখে তাকে চুমু দেন। তারপর বলেন : হুসায়ন আমার অংশ এবং আমি হুসায়নের অংশ।[৫৫]

---

৫২. প্রাগুক্ত-৬৩০

৫৩. সূরা আত-তাগাবুন-১৫

৫৪. মুসলিম, আল-ফাদায়িল

৫৫. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩০

ফাতিমার বাড়ীর দরজায় আবূ সুফইয়ান

সময় গড়িয়ে চললো। ইসলামের আলোতে গোটা আরবের অন্ধকার বিদূরিত হতে চললো। এক সময় রাসূল (সা) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। মদীনায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। নারী-পুরুষ সবাই এ অভিযানে অংশ নিবে। মক্কায় এ খবর সময় মত পৌঁছে গেল। পৌত্তলিক কুরায়শদের হৃদকম্পন শুরু হলো। তারা ভাবলো এবার আর রক্ষা নেই। অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার পর তারা মদীনাবাসীদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার জন্য আবূ সুফইয়ান ইবন হারবকে মদীনায় পাঠালো। কারণ, ইতোমধ্যে তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবা রামলা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসূল (সা) তাঁকে বেগমের মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে দিয়েই এ কাজ সম্ভব হবে।

আলী ও ফাতিমা এ অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। যাত্রার পূর্বে একদিন রাতে তাঁরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। নানা স্মৃতি তাঁদের মানসপটে ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে তাঁরা স্মৃতিচারণও করছেন। আট বছর পূর্বে যে মক্কা তাঁরা পিছনে ফেলে চলে এসেছিলেন তা কি তেমনই আছে? তাঁদের স্মৃতিতে তখন ভেসে উঠছে মা খাদীজা (রা), পিতা আবূ তালিবের ছবি। এমনই এক ভাব-বিহ্বল অবস্থার মধ্যে যখন তাঁরা তখন অকস্মাৎ দরজায় টোকা পড়লো। এত রাতের আগন্তুক কে তা দেখার জন্য 'আলী (রা) দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফাতিমাও সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পেলেন আবূ সুফইয়ান ইবন হারব দাঁড়িয়ে। এই সেই আবূ সুফইয়ান, যিনি মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পতাকাবাহী এবং উহুদের শহীদ হযরত হামযার (রা) বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে চিবিয়েছিল যে হিন্দ, তার স্বামী।

আবূ সুফইয়ান বলতে লাগলেন, কিভাবে মদীনায় এসেছেন এবং কেন এসেছেন, সে কথা। বললেন : মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদের (সা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য, তাঁর সাথে একটা আপোষরফা করার উদ্দেশে তাঁকে পাঠিয়েছে। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে মদীনায় ঢুকে পড়েছেন এবং সরাসরি নিজের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা রামলার (রা) ঘরে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসার জন্য উদ্যত হতেই নিজ কন্যার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ, তিনি একজন অংশীবাদী, অপবিত্র। আল্লাহর রাসূলের (সা) পবিত্র বিছানায় বসার যোগ্যতা তাঁর নেই। কন্যা বিছানাটি গুটিয়ে নেন। মনে বড় ব্যথা নিয়ে তিনি নবীর (সা) নিকট যান এবং তাঁর সাথে অভিযানের ব্যাপারে কথা বলেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন জবাব পাননি। আবূ বকরের (রা) নিকট থেকেও একই আচরণ লাভ করেন। তারপর যান 'উমারের (রা) নিকট। তিনি তাঁর বক্তব্য শুনে বলেন : আমি যাব তোমার জন্য সুপারিশ করতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট? আল্লাহর কসম! ভূমিতে উদ্গত সামান্য উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই যদি না পাই, তা দিয়েই তোমাদের সাথে লড়বো।[৫৬]

---

৫৬. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ-৪/৩৮

এ পর্যন্ত বলার পর আবূ সুফইয়ান একটু চুপ থাকলেন, তারপর একটা ঢোক গিলে 'আলীকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন : ওহে আলী! তুমি আমার সম্প্রদায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী সদয়। আমি একটা প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি। অন্যদের নিকট থেকে যেমন হতাশ হয়ে ফিরেছি, তোমার নিকট থেকে সেভাবে ফিরতে চাইনে। তুমি আমার জন্য একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সুপারিশ কর।

'আলী (রা) বললেন : আবূ সুফইয়ান! তোমার অনিষ্ট হোক। আল্লাহর কসম! রাসূল (সা) একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সে ব্যাপারে আমরা কোন কথা বলতে পারি না।

এবার আবূ সুফইয়ান পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ফাতিমার দিকে তাকালেন এবং পাশের বিছানায় সদ্য ঘুম থেকে জাগা ও মায়ের দিকে এগিয়ে আসা হাসানের দিকে ইঙ্গিত করে ফাতিমাকে বললেন : ওহে মুহাম্মাদের মেয়ে! তুমি কি তোমার এ ছেলেকে বলবে, সে যেন মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার গোত্রের লোকদের নিরাপত্তার ঘোষণা দিক এবং চিরকালের জন্য সমগ্র আরবের নেতা হয়ে থাক?

ফাতিমা জবাব দিলেন : আমার এই এতটুকু ছেলের মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে কাউকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দেওয়ার বয়স হয়নি। আর রাসূলুল্লাহকে (সা) ডিঙ্গিয়ে কেউ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।

হতাশ অবস্থায় আবূ সুফইয়ান যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে একটু থামলেন। তারপর অত্যন্ত নরম সুরে বললেন : আবুল হাসান ('আলী)! মনে হচ্ছে বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে। তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দাও।

'আলী (রা) বললেন : আপনার কাজে আসবে এমন কোন পরামর্শ আমার জানা নেই। তবে আপনি হলেন কিনানা (কুরায়শ গোত্রের একটি শাখা) গোত্রের নেতা। আপনি নিজেই জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তার আবেদন করুন। তারপর নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যান।

আবূ সুফইয়ান বললেন : এটা কি আমার কোন কাজে আসবে? 'আলী (রা) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তা মনে করি না। কিন্তু আমি তো আপনার জন্য এছাড়া আর কোন পথ দেখছিনে।

আবূ সুফইয়ান 'আলীর (রা) পরামর্শ মত কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেলেন। আর এ দম্পতি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম ক্ষমতার কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন উম্মুল কুরা মক্কা, কা'বা, কুরায়শদের বাড়ীঘর ইত্যাদির কথা।[৫৭]

---

৫৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩৩

মক্কা বিজয় অভিযানে ফাতিমা (রা)

দশ হাজার মুসলমান সঙ্গীসহ রাসূল (সা) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। আট বছর পূর্বে কেবল আবূ বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় চলে আসেন। নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ফাতিমাও এই মহা বিজয় ও গৌরবজনক প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য এই কাফেলায় শরীক হলেন। আট বছর পূর্বে তিনি একদিন বড় বোন উম্মু কুলছূমের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তাঁর অন্য দুই বোন রুকাইয়্যা ও যয়নাবও হিজরাত করেছিলেন। কিন্তু আজ এই বিজয়ী কাফেলায় তাঁরা নেই। তাঁরা মদীনার মাটিতে চিরদিনের জন্য শুয়ে আছেন। আর কোনদিন মক্কায় ফিরবেন না। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ফাতিমা কাফেলার সাথে চলছেন। এক সময় কাফেলা "মাররুজ জাহ্‌রান" এসে পৌঁছলো এবং শিবির স্থাপন করলো। দিন শেষ হতেই রাতের প্রথম ভাগে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর নেতা আবূ সুফইয়ান ইবন হারব এসে উপস্থিত হলেন। মক্কাবাসীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সিদ্ধান্ত জানার জন্য সারা রাত তিনি তাঁর দরজায় অপেক্ষা করলেন। ভোর হতেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তারপর সেখান থেকে বের হয়ে সোজা মক্কার পথ ধরেন। মক্কায় পৌঁছে একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন : 'ওহে কুরায়শ বংশের লোকেরা! মুহাম্মাদ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছেন যার সাথে তোমরা কখনো পরিচিত নও। যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ, আর যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।'

ঘোষণা শুনে মক্কার অধিবাসীরা নিজ নিজ গৃহে এবং মসজিদুল হারামে ঢুকে পড়লো। রাসূল (সা) 'যী তুওয়া"-তে বাহনের পিঠে অবস্থান করে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগের একজন করে নেতা নিয়োগ করেন এবং কে কোন পথে মক্কায় প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করেন। একটি ভাগের নেতা ও পতাকাবাহী হন সা'দ ইবন 'উবাদা আল-আনসারী (রা)। তিনি আবার 'আলীকে (রা) বলেন : 'পতাকাটি আপনিই নিন। এটি হাতে করে আপনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।'[৫৮] এর পূর্বে 'আলী (রা) খায়বারে, বানী কুরায়জার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) এবং উহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন।[৫৯]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) 'আযাখির'-এর পথে মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) কবরের অনতিদূরে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। সঙ্গে কন্যা ফাতিমা আয-যাহ্‌রাও ছিলেন। মক্কা থেকে যেদিন ফাতিমা (রা) মদীনায় যাচ্ছিলেন সেদিন আল-হুওয়ায়রিছ ইবন মুনকিয তাঁকে তাঁর

---

৫৮. আত-তাবারী, তারীখ : ফাতহু মাক্কাহ
৫৯. তাবাকাত-২/২৭, ৭৭

বাহনের পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে ফেলেছিল। সেই স্মৃতি তাঁর দীর্ঘদিন পর জন্মভূমিতে ফিরে আসার আনন্দকে ম্লান করে দিচ্ছিল। রাসূলও (সা) সে কথা ভোলেননি। তিনি বাহিনীকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে একজন পরিচালক নির্ধারণ করে দেন। কারা কোন পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে তাও বলে দেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন অহেতুক কোন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তবে কিছু লোকের নাম উচ্চারণ করে বলেন, এরা যদি কা'বার গিলাফের নীচেও আশ্রয় নেয় তাহলেও তাদের হত্যা করবে। তাদের মধ্যে আল-'হুয়ায়রিছ ইবন মুনকিযও ছিল। তাকে হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত ফাতিমার (রা) স্বামী 'আলীর (রা) উপর।[৬০]

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো বোন উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব, মক্কার হুবায়রা ইবন আবী ওয়াহাবের স্ত্রী। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করার পর বানূ মাখযূমের দুই ব্যক্তি আল-হারিছ ইবন হিশাম ও যুহায়র ইবন আবী উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা পালিয়ে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়। আমার ভাই 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) আমার সাথে দেখা করতে এসে তাদেরকে দেখে ভীষণ ক্ষেপে যান। আল্লাহর নামে কসম করে তিনি বলেন : আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনি একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে গোসল করছেন এবং ফাতিমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাসূল (সা) গোসল সেরে আট রাক'আত চাশ্‌তের নামায আদায় করলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : উম্মু হানী, কি জন্য এসেছো? আমি তাঁকে আমার বাড়ীর ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছো আমিও তাদের আশ্রয় দিলাম। যাদের তুমি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আমিও তাদের নিরাপত্তা দান করলাম। 'আলী তাদের হত্যা করবে না।[৬১]

মক্কায় হযরত ফাতিমার (রা) প্রথম রাতটি কেমন কেটেছিল সে কথাও জানা যায়। তিনি বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। প্রিয়তমা মায়ের কথা, দুই সহোদরা যায়নাব ও রুকাইয়্যার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠছিল। মক্কার অধিবাসীরা তাঁর পিতার সঙ্গে যে নির্মম আচরণ করেছিল সে কথা, মক্কায় নিজের শৈশব-কৈশোরের নানা কথা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল। সারা রাত তিনি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। প্রভাতে মসজিদুল হারাম থেকে বিলালের কণ্ঠে ফজরের আযান ধ্বনিত হলো। 'আলী (রা) শয্যা ছেড়ে নামাযে যাবার প্রস্তুতির মধ্যে একবার প্রশ্ন করলেন : হাসানের মা, তুমি কি ঘুমাওনি? তিনি একটা গভীর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন : আমি সম্পূর্ণ সজাগ থেকে বিজয়ীবেশে এ প্রত্যাবর্তনকে উপভোগ করতে চাই। ঘুমিয়ে পড়লে গোটা ব্যাপারটিই না জানি স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়।

এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যান। নামায শেষে একটু ঘুমিয়ে নেন।

---

৬০. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩৫

৬১. প্রাগুক্ত; সাহীহ মুসলিম : সালাতুল মুসাফিরীন

ঘুম থেকে উঠে সেই বাড়ীটিতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন যেখান তাঁর জন্ম হয়েছিল। যে বাড়ীটি ছিল তাঁর নিজের ও স্বামী 'আলীর শৈশব-কৈশোরের চারণভূমি। কিন্তু সেই বাড়ীটি তাঁদের হিজরাতের পর 'আকীল ইবন আবী তালিবের অধিকারে চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন উসামা ইবন যায়িদ (রা) রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেন : মক্কায় আপনারা কোন বাড়ীতে উঠবেন? জবাবে তিনি বলেন : 'আকীল কি আমাদের জন্য কোন আবাসস্থল বা ঘর অবশিষ্ট রেখেছে?[৬২]

এই সফরে তাঁর দু'মাসের বেশী মক্কায় অবস্থান করা হয়নি। অষ্টম হিজরীর রামাদান মাসে মক্কায় আসেন এবং একই বছর যুল কা'দা মাসের শেষ দিকে 'উমরা আদায়ের পর পিতার সাথে মদীনায় ফিরে যান। এ সময়ে তিনি জান্নাতবাসিনী মা খাদীজার (রা) কবরও যিয়ারাত করেন।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) তৃতীয় কন্যা, হযরত 'উছমানের (রা) স্ত্রী উম্মু কুলছুম (রা) ইনতিকাল করেন। দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী মারিয়া আল-কিবতিয়্যার গর্ভজাত সন্তান হযরত ইবরাহীমও ইহলোক ত্যাগ করেন। এখন রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা আয-যাহ্‌রা ছাড়া আর কেউ জীবিত থাকলেন না।

পিতা অন্তিম রোগশয্যায়

এর পরে এলো সেই মহা মুসীবতের সময়টি। হিজরী ১১ সনের সফর মাসে ফাতিমার (রা) মহান পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী পরিবারের এবং অন্য মুসলমানরা ধারণা করলেন যে, এ হয়তো সামান্য অসুস্থতা, খুব শীঘ্রই সেরে উঠবেন। কেউ ধারণা করলেন না যে, এ তাঁর অন্তিম রোগ। পিতা মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর গৃহের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) শয্যাপাশে তখন হযরত 'আয়িশা (রা)সহ অন্য বেগমগণ বসা। এ সময় ধীর স্থির ও গম্ভীরভাবে কন্যা ফাতিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে পিতা তাঁকে স্বাগতম জানালেন এভাবে–

مَرْحَبًا يَا بِنْتِيْ – আমার মেয়ে! স্বাগতম। তারপর তাঁকে চুমু দিয়ে ডান পাশে বসান এবং কানে কানে বলেন, তাঁর মরণ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। তাঁর সেই কান্না থেমে যায় যখন পিতা তাঁর কানে কানে আবার বলেন :[৬৩]

إنك أول أهل بيتى لحوقابى. يافاطمة ألاترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين. أو سيدة نساء هذه الأمة؟

'আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। ফাতিমা! তুমি কি

---

৬২. তাবাকাত-২/৯৮

৬৩. তাবাকাত-৮/১৬' বুখারী : বাবু 'আলামাত আন-নুবুওয়াহ্; মুসলিম : ফাদায়িল আস-সাহাবা; কানয আল-'উম্মাল-১৩/৬৭৫

এতে সন্তুষ্ট নও যে, ঈমানদার মহিলাদের নেত্রী হও?' অথবা রাসূল (সা) একথা বলেন, 'তুমি এই উম্মাতের মহিলাদের নেত্রী হও তাতে কি সন্তুষ্ট নও?'

এ কথা শোনার সংগে সংগে ফাতিমার মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। তিনি কান্না থামিয়ে হেসে দিলেন। তাঁর এমন আচরণ দেখে পাশেই বসা হযরত 'আয়িশা (রা) বিস্মিত হলেন। তিনি মন্তব্য করেন :

"مارأيت كاليوم فرحا أقرب إلى حزن!"

'দুঃখের অধিক নিকটবর্তী আনন্দের এমন দৃশ্য আজকের মত আর কখনো দেখিনি।'

পরে তিনি ফাতিমাকে এক সুযোগে জিজ্ঞেস করেন : তোমার পিতা কানে কানে তোমাকে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন কথা প্রকাশ করতে পারিনে।[৬৪]

পিতার রোগের এ অবস্থা দেখে ফাতিমা (রা) সেদিন নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন। এদিকে রাসূল (সা) এ রোগের মধ্যেও নিয়ম অনুযায়ী পালাক্রমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (বেগম)দের ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন। যেদিন তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিছ আল-হিলালিয়্যার (রা) ঘরে সেদিন তাঁর রোগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তিনি অন্য বেগমদের ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি এ অসুস্থ অবস্থায় হযরত 'আয়িশার (রা) গৃহে অবস্থানের অনুমতি চান এবং তাঁদের অনুমতি লাভ করেন।

নবী কন্যা ফাতিমা (রা) সব সময়, এমনকি রাত জেগে অসুস্থ পিতার সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। ধৈর্যের সাথে সেবার পাশাপাশি অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্রভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে পিতার সুস্থতার জন্য দু'আ করতে থাকেন। এত কিছুর পরেও যখন উত্তরোত্তর রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে লাগলো এবং কষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে চললো, ফাতিমা (রা) তখন হাতে পানি নিয়ে অত্যন্ত দরদের সাথে পিতার মাথায় দিতে থাকেন। পিতার এ কষ্ট দেখে কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়ার উপক্রম হয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করেন : আব্বা! আপনার কষ্ট তো আমি সহ্য করতে পারছিনে। পিতা তাঁর দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত দরদের সাথে উত্তর দেন : আজকের দিনের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।[৬৫]

কন্যাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে পিতা মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাত্রা করলেন। আজ ফাতিমা (রা) সত্যিকারভাবে পিতৃ-মাতৃহারা এক দুঃখী এতীমে পরিণত হলেন। এ দুঃখ-বেদনায় সান্ত্বনা লাভের কোন পথই তাঁর সামনে ছিল না।

পিতাকে হারিয়ে ফাতিমা (রা) দারুণভাবে শোকাতুর হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় দু'দিনের

---

৬৪. তাবাকাত-৮/১৬

৬৫. বুখারী : বাবু মারদিহি ওয়া ওফাতিহি (সা) : ফাতহুল বারী-৮/১০৫; মুসনাদে আহমাদ-৩/১৪১; তাবাকাত-২/২

মধ্যেই সাকীফা বানূ সা'ইদা চত্বরে খলীফা হিসেবে হযরত আবূ বকরের (রা) হাতে বায়'আত সম্পন্ন হয়। ফাতিমা (রা) তাঁর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাকে একটু সামলে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে পিতার কবরের নিকট যান এবং কবর থেকে এক মুঠ মাটি উঠিয়ে নিয়ে অশ্রু বিগলিত দু'চোখের উপর বুলিয়ে দেন। তারপর তার ঘ্রাণ নিতে নিতে নিম্নের চরণ দু'টি আওড়াতে থাকেন।[৬৬]

مَاذا على مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أحمد　　ألا يشمَّ مدى الزّمان غواليا

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائب لو أنها　　صبت على الأيام عدن لياليا!

'যে ব্যক্তি আহমাদের কবরের মাটির ঘ্রাণ নেয় সারা জীবন সে যেন আর কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ না নেয়। আমার উপর যে সকল বিপদ আপতিত হয়েছে যদি তা হতো দিনের উপর তাহলে তা রাতে পরিণত হতো।'

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দাফন-কাফন শেষ করে হযরত ফাতিমার (রা) নিকট আসেন তাকে সান্ত্বনা দানের জন্য। তিনি হযরত আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করে বসেন : আপনারা কি রাসূলকে দাফন করে এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহকে (সা) মাটিতে ঢেকে দিতে আপনাদের অন্তর সায় দিল কেমন করে? তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্মরণে নিম্নের চরণগুলো আবৃত্তি করেন :[৬৭]

أغبرأفاق السماء وكورت　　شمس النهار وأظلم العصر ان

فالأرض من بعد النبى كئيبة　　اسفار عليه كثيرة الرجفان

فليبكه شرق البلاد وغربها　　ولتبكه مضروكل يمان

وليبكه الطود العظيم جوده　　والبيت ذو الأستار والأركان

ياخاتم الرسل المبارك ضوْه　　صلى عليك منزل القرآن.

'আকাশের দিগন্ত ধুলিমলিন হয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে এবং যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

নবীর (সা) পরে ভূমি কেবল বিষণ্ন হয়নি, বরং দুঃখের তীব্রতায় বিদীর্ণ হয়েছে।

তার জন্য কাঁদছে পূর্ব-পশ্চিম, মাতম করছে সমগ্র মুদার ও ইয়ামান গোত্র।

তাঁর জন্য কাঁদছে বড় বড় পাহাড়-পর্বত ও বিশালকায় অট্টালিকাসমূহ।

হে খাতামুন নাবিয়্যীন, আল্লাহর জ্যোতি আপনার প্রতি বর্ষিত হোক। আল-কুর'আনের নাযিলকারী আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'

---

৬৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৩৪; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৪

৬৭. উসুদুল গাবা-৫/৫৩২; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৩

অনেকে উপরোক্ত চরণগুলো হযরত ফাতিমার (রা), আর পূর্বোক্ত চরণগুলো 'আলীর রচিত বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

হযরত ফাতিমা (রা) পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ চরণ দু'টিও আবৃত্তি করেন :[৬৯]

إنا فقدناك فقد الأرض وإبلها   وغاب مذغبت عنا الوحي والكتب

فليت قبلك كان الموت صادفنا   لـما نعيت وحالت دونك الكثب.

'ভূমি ও উট হারানোর মত আমরা হারিয়েছি আপনাকে

আপনার অদৃশ্য হওয়ার পর ওহী ও কিতাব

আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হায়! আপনার পূর্বে যদি আমাদের মৃত্যু হতো! আপনার মৃত্যু সংবাদ শুনতে হতো না এবং মাটির ঢিবিও আপনার মাঝে অন্তরায় হতো না।

বিয়ের পরেও হযরত ফাতিমা (রা) পিতার সংসারের সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখতেন। অনেক সময় তাঁর সৎ মা'দের ছোটখাট রাগ-বিরাগ ও মান-অভিমানের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন। যেমন হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একথা গোটা সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) যেদিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন সেদিন তারা বেশী বেশী হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। এতে অন্য বেগমগণ ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁরা চাইতেন রাসূল (সা) যেন লোকদের নির্দেশ দেন, তিনি যেদিন যেখানে থাকেন লোকেরা যেন সেখানেই যা কিছু পাঠাবার, পাঠায়। কিন্তু সে কথা রাসূলকে (সা) বলার হিম্মত কারো হতো না। এই জন্য তাঁরা সবাই মিলে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলে কারীমের (সা) কলিজার টুকরা ফাতিমাকে (রা) বেছে নেন। রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) বক্তব্য শুনে বললেন, 'মা, আমি যা চাই, তুমি কি তা চাও না?' ফাতিমা (রা) পিতার ইচ্ছা বুঝতে পারলেন এবং ফিরে এলেন। তাঁর সৎ মায়েরা আবার তাঁকে পাঠাতে চাইলেন : কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।[৭০]

জিহাদের ময়দানে

জিহাদের ময়দানে হযরত ফাতিমার (রা) রয়েছে এক উজ্জ্বল ভূমিকা। উহুদ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) দেহে ও মুখে আঘাত পেয়ে আহত হলেন। পবিত্র দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোন কিছুতে যখন রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছিল না তখন ফাতিমা (রা) খেজুরের চাটাই আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে

---

৬৮. সাহাবিয়াত-১৫০

৬৯. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৪

৭০. বুখারী : ফাদায়িলু 'আয়িশা (রা); মুসলিম : ফাদায়িলুস সাহাবা (২৪৪১); আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-৫/৭৩

লাগিয়ে দেন।[৭১] এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-বায়হাকী বলেন : মুহাজির ও আনসার নারীগণ উহুদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁরা তাঁদের পিঠে করে পানি ও খাদ্য বহন করে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা)ও বের হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি যখন পিতাকে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় দেখলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল :[৭২]

اشتدَّ غضب الله على قوم دموا وجهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'আল্লাহর শক্ত ক্রোধ পতিত হয়েছে সেই জাতির উপর যারা আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখমণ্ডলকে রক্তরঞ্জিত করেছে।'

উহুদে হযরত ফাতিমার (রা) ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান সাহাবী সাহ্‌ল ইবন সা'দ বলেছেন : রাসূল (সা) আহত হলেন, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, মাথায় তরবারি ভাঙ্গা হলো, ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা) রক্ত ধুতে লাগলেন, আর 'আলী (রা) ঢালে করে পানি ঢালতে লাগলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন, যতই পানি ঢালা হচ্ছে ততই রক্ত বেশী বের হচ্ছে তখন তিনি একটি চাটাই উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করলেন– এবং সেই ক্ষতস্থানে লাগালেন। আর তখন রক্তপড়া বন্ধ হয়।[৭৩]

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা ও ফাতিমার (রা) দাদা হযরত হামযা (রা) শহীদ হন। তিনিই হযরত ফাতিমার (রা) বিয়ের সময় ওলীমা অনুষ্ঠান করে মানুষকে আহার করান। ফাতিমা (রা) তাঁর প্রতি দারুণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি আজীবন হযরত হামযার (রা) কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন।[৭৪]

অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত ফাতিমার (রা) যোগদানের কথা জানা যায়। যেমন খন্দক ও খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই খায়বার বিজয়ের পর তথাকার উৎপাদিত গম থেকে তাঁর জন্য রাসূল (সা) ৮৫ ওয়াসক নির্ধারণ করে দেন। মক্কা বিজয়েও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হন। মূতা অভিযানে রাসূল (সা) তিন সেনাপতি– যায়দ ইবন আল-হারিছা, জা'ফর ইবন আবী তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইব রাওয়াহাকে (রা) পাঠান। একের পর এক তাঁরা তিনজনই শহীদ হলেন। এ খবর মদীনায় পৌঁছলে ফাতিমা (রা) তাঁর প্রিয় চাচা জা'ফরের (রা) শোকে 'ওয়া 'আম্মাহ্' বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে উপস্থিত হন এবং মন্তব্য করেন 'যে কাঁদতে চায় তার জা'ফরের মত মানুষের জন্য কাঁদা উচিত।'[৭৫]

---

৭১. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৪
৭২. আল-বায়হাকী : দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৩/২৮৩
৭৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৯; তাবাকাত-২/৪৮; বুখারী : আল-মাগাযী; মুসলিম : আল-হুদূদ ওয়াস সিয়ার
৭৪. আল-বায়হাকী : দালায়িল আল-নুবুওয়াহ; আল-ওয়াকিদী : আল-মাগাযী-২/৩১৩
৭৫. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-২১৪

হযরত ফাতিমার (রা) মর্যাদা

তাঁর মহত্ব, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। নবী পরিবারের মধ্যে আরো অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে হযরত ফাতিমার (রা) অবস্থান এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে। সূরা আল-আহযাবের আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের আয়াত) এর নুযূল হযরত ফাতিমার (রা) বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে।

إِنَّمَا يَرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.[৭৬]

'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৭৭]

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখলাম, তিনি আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নকে (রা) ডাকলেন এবং তাদের মাথার উপর একখানা কাপড় ফেলে দিলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারের সদস্য। তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করুন!'

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূল (সা) এ আয়াত নাযিলের পর ছয়মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় ফাতিমার (রা) ঘরের দরজা অতিক্রম করাকালে বলতেন :

الصلاة يا أهل البيت، الصلاة.

'আস্-সালাত, ওহে নবী-পরিবার! আস-সালাত।'

তারপর তিনি পাঠ করতেন :[৭৮]

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

ইমাম আহমাদ (রহ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নের (রা) দিকে তাকালেন, তারপর বললেন :[৭৯]

أنا حربٌ لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم.

---

৭৬. সূরা আল-আহযাব-৩৩
৭৭. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৯৪
৭৮. উসুদুল গাবা, জীবনী নং-৭১৭৫; আদ-দুররুল মানছূর-৬/৬০৫; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২১৯
৭৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৩

'তোমাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে আমি তাদের জন্য যুদ্ধ, তোমাদের সাথে যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করে আমি তাদের জন্য শান্তি।'

এই নবী পরিবার সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অন্য একটি বাণীতে এসেছে :[৮০]

لايُبْغِضُنَا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار.

'যে কেউ 'আহলি বায়ত' বা নবী-পরিবারের সাথে দুশমনি করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।'

হিজরী ৯ম সনে নাজরানের একটি খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকট আসে এবং হযরত 'ঈসার (আ) ব্যাপারে তারা অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন নাযিল হয় আয়াতে 'মুবাহালা'। মুবাহালার অর্থ হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তাহলে তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এই মুবাহালা বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে করতে পারে এবং গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য পরিবার-পরিজনকেও একত্রিত করতে পারে। মুবাহালার আয়াতটি হলো :[৮১]

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

'তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে, তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে, তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত।'

এ আয়াত নাযিলের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতিনিধি দলকে মুহাবালার আহ্বান জানান এবং তিনি নিজেও ফাতিমা, আলী, হাসান ও হুসায়নকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং বলেন : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِيْ - 'হে আল্লাহ! এই আমার পরিবার-পরিজন। আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করুন।' এ কথাগুলো তিনবার বলার পর উচ্চারণ করেন :[৮২]

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل ممحد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

'হে আল্লাহ আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে দান করুন

৮০. প্রাগুক্ত
৮১. সূরা আলে ইমরান-৬১
৮২. সাহীহ মুসলিম : ফাদায়িল আস-সাহাবা; মুনসাদ-৪/১০৭; মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-১/২৮৭-২৮৯

যেমন আপনি করেছেন ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনকে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন ফাতিমাকে (রা) বলেন :[৮৩]

" إن الله تعالى يرضى لرضاكِ ويغضب لغضبك."

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমার খুশীতে খুশী হন এবং তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন।'

রাসূল (সা) যখন কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রথমে মসজিদে যেয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। তারপর ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বেগমদের নিকট যেতেন।[৮৪]

একবার হযরত ফাতিমা (রা) অসুস্থ হলে রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন : মেয়ে! কেমন আছ?

ফাতিমা বললেন : আমার কষ্ট আছে। সেটা আরো বেড়ে যায় এজন্য যে, আমার খাবার কোন কিছু নেই।

রাসূল (সা) বললেন : মেয়ে! তুমি বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী হও এতে কি সন্তুষ্ট নও?

ফাতিমা বললেন : আব্বা! তাহলে মারয়াম বিন্ত ইমরানের অবস্থান কোথায়?

জবাবে রাসূল (সা) বললেন : তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের নারীদের নেত্রী, আর তুমি হবে তোমার সময়ের নারীদের নেত্রী।

আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের একজন নেতার সাথে বিয়ে দিয়েছি।[৮৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে - سيدة نساء أهل الجنة -

'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন :[৮৬]

سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم أسية امرأة فرعون.

'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী হলেন ক্রমানুসারে মারয়াম, ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ (সা), খাদীজা ও ফির'আওনের স্ত্রী আসিয়া।'

একবার রাসূল (সা) মাটিতে চারটি রেখা টানলেন, তারপর লোকদের বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? সবাই বললো : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই (সা) ভালো জানেন। তিনি

---

৮৩. তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৪২; আল-ইসাবা-৪/৩৬৬

৮৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৩৫

৮৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৬

৮৬. সাহাবিয়াত-১৪০

বললেন : ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ, খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদ, মারয়াম বিনত 'ইমরান ও মাসিয়া বিন্‌ত মুযাহিম (ফির'আওনের স্ত্রী)। জান্নাতের নারীদের উপর তাদের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা।

হযরত ফাতিমার (রা) ব্যক্তিত্বের প্রতি যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা রাসূলের (সা) এই হাদীছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :[৮৭]

كفاكِ من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون.

'পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমার অনুসরণের জন্য মারয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সবচেয়ে বেশী স্নেহের ও প্রিয় পাত্রী ছিলেন ফাতিমা (রা)। একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয় মানুষটি কে? বললেন : ফাতিমা। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال على.

'নারীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন ফাতিমা (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে আলী (রা)।'

একবার হযরত আলী (রা) রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা ও আমি এ দুইজনের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। বললেন : তোমার চেয়ে ফাতিমা আমার বেশী প্রিয়।[৮৮]

আল্লাহর প্রিয় পাত্রী

হযরত ফাতিমা যে, আল্লাহরও প্রিয় পাত্রী ছিলেন কোন কোন অলৌকিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একবার সামান্য খাদ্যে আল্লাহ যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হলো, একদিন তাঁর এক প্রতিবেশিনী তাঁকে দুইটি রুটি ও এক খণ্ড গোশত উপহার হিসেবে পাঠালো। তিনি সেগুলো একটি থালায় ঢেলে ঢেকে দিলেন। তারপর রাসূলকে (সা) ডেকে আনার জন্য ছেলেকে পাঠালেন। রাসূল (সা) আসলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর সামনে থালাটি উপস্থাপন করলেন। এরপরের ঘটনা ফাতিমা (রা) বর্ণনা করেছেন এভাবে :

আমি থালাটির ঢাকনা খুলে দেখি সেটি রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। আমি দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক! বুঝলাম, এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর প্রশংসা

---

৮৭. তিরমিযী; আল-মানাকিব

৮৮. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-২১৬

করলাম এবং তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করলাম। তারপর খাদ্য ভর্তি থালাটি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি সেটি দেখে আল্লাহর প্রশংসা করে প্রশ্ন করলেন : মেয়ে! এ খাবার কোথা থেকে এসেছে?

বললাম : আব্বা! আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

রাসূল (সা) বললেন : আমার প্রিয় মেয়ে! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের নারীদের নেত্রীর মত করেছেন। আল্লাহ যখন তাঁকে কোন খাদ্য দান করতেন এবং সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি বলতেন : এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

সেই খাবার নবী করীম (সা), 'আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসায়ন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সকল বেগম খান। তাঁরা সবাই পেট ভরে খান। তারপরও থালার খাবার একই রকম থেকে যায়। ফাতিমা সেই খাবার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। আল্লাহ সেই খাবারে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ দান করেন।[৮৯]

নবী কারীম (সা) একবার দু'আ করেন, আল্লাহ যেন ফাতিমাকে ক্ষুধার্ত না রাখেন। ফাতিমা বলেন, তারপর থেকে আমি আর কখনো ক্ষুধার্ত হইনি। ঘটনাটি এরকম :

একদিন রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) ঘরে গেলেন। তখন তিনি যাতায় গম পিষছিলেন। গায়ে ছিল উটের পশমে তৈরী কাপড়। মেয়ের এ অবস্থা দেখে পিতা কেঁদে দেন এবং বলেন : 'ফাতিমা! আখিরাতের সুখ-সম্ভোগের জন্য দুনিয়ার এ তিক্ততা গিলে ফেল।' ফাতিমা উঠে পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : ফাতিমা! কাছে এসো। ফাতিমা পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিতা একটি হাত মেয়ের কাঁধে রেখে এই দু'আ উচ্চারণ করেন :[৯০]

اللهم مشبع الجاعة ورافع الضيق ارفع فاطمة بنت محمد.

'ক্ষুধার্তকে আহার দানকারী ও সংকীর্ণতাকে দূরীভূতকারী হে আল্লাহ! তুমি ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদের সংকীর্ণতাকে দূর করে দাও।'

কথাবার্তা, চালচলন, উঠাবসা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতিমা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতিচ্ছবি। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :

فاطمة تمشى ماتخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'ফাতিমা (রা) হাঁটতেন। তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটা থেকে একটুও এদিক ওদিক

---

৮৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৬/১১১; হায়াত আস-সাহাবা-৩/৬২৮; তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৩৬০
৯০. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১২৫

হতো না।'[৯১] সততা ও সত্যবাদিতায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলতেন :[৯২]

ماراأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذى ولدها.

'আমি ফাতিমার (রা) চেয়ে বেশী সত্যভাষী আর কাউকে দেখিনি। তবে তিনি যাঁর কন্যা (নবী সা.) তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

'আয়িশা (রা) আরো বলেন :[৯৩]

مارأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هى تصنع به.

'আমি কথাবার্তা ও আলোচনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ফাতিমার (রা) চেয়ে বেশী মিল আছে এমন কাউকে দেখিনি। ফাতিমা (রা) যখন রাসূলের (সা) নিকট আসতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু দিতেন, স্বাগত জানাতেন। ফাতিমাও পিতার সাথে একই রকম করতেন।'

রাসূল (সা) যে পরিমাণ ফাতিমাকে (রা) ভালোবাসতেন, সেই পরিমাণ অন্য কোন সন্তানকে ভালোবাসতেন না।

তিনি বলেছেন : فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى

'ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে।'

ইমাম আস-সুহাইলী এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেছেন, কেউ ফাতিমাকে (রা) গালিগালাজ করলে কাফির হয়ে যাবে। তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্টি এক করে দেখেছেন। আর কেউ রাসূলকে (সা) ক্রোধান্বিত করলে কাফির হয়ে যাবে।[৯৪]

ইবনুল জাওযী বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য সকল কন্যাকে ফাতিমা (রা) এবং অন্য সকল বেগমকে 'আয়িশা (রা) সম্মান ও মর্যাদায় অতিক্রম করে গেছেন।[৯৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন : একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ আমার সাক্ষাতের অনুমতি দেন। তিনি আমাকে এ সুসংবাদ দেন যে, ফাতিমা হবে আমার উম্মাতের সকল নারীর নেত্রী এবং হাসান ও হুসায়ন হবে

---

৯১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৩০
৯২. প্রাগুক্ত-১৩১
৯৩. আবূ দাউদ : বাবু মা জায়াফিল কিয়াম (৫২১৭); তিরমিযী : মানাকিবু ফাতিমা (৩৮৭১)
৯৪. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১২৫, টীকা-২
৯৫ প্রাগুক্ত-৪/১২৬

জান্নাতের অধিবাসীদের নেতা।[৯৬] এক প্রসঙ্গে তিনি 'আলীকে (রা) বলেন : 'ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। সুতরাং তার অসন্তুষ্টি হয় এমন কিছু করবে না।'

পিতার প্রতি ফাতিমার (রা) ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যেমন কন্যা ফাতিমাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি ফাতিমাও পিতাকে প্রবলভাবে ভালোবাসতেন। পিতা কোন সফর থেকে যখন ফিরতেন তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। তারপর কন্যা ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ঘরে যেতেন। এটা তাঁর নিয়ম ছিল। একবার রাসূল (সা) এক সফর থেকে ফিরে ফাতিমার ঘরে যান। ফাতিমা (রা) পিতাকে জড়িয়ে ধরে চোখে-মুখে চুমু দেন। তারপর পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। রাসূল (সা) বলেন : কাঁদছো কেন? ফাতিমা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং আপনার পরিধেয় বস্ত্রও ময়লা, নোংরা হয়েছে। এ দেখেই আমার কান্না পাচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন : ফাতিমা, কেঁদো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে একটি বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ধরাপৃষ্ঠের শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরে তিনি তা পৌঁছে দেবেন। সম্মানের সঙ্গে হোক বা অপমানের সঙ্গে।[৯৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) তিরস্কার ও সতর্ককরণ

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এত প্রিয়পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখলেও রাসূল (সা) তাঁকে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূল (সা) পার্থিব ঠাঁটবাট ও চাকচিক্য অপসন্দ করতেন। তিনি নিজে যা পসন্দ করতেন না তা অন্য কারো জন্য পসন্দ করতে পারেন না। একবার স্বামী 'আলী (রা) একটি সোনার হার ফাতিমাকে (রা) উপহার দেন। তিনি হারটি গলায় পরে আছেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং হারটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি বলেন, ফাতিমা! তুমি কি চাও যে, লোকেরা বলুক রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা আগুনের হার গলায় পরে আছে? ফাতিমা পিতার অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে হারটি বিক্রী করে দেন এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। একথা রাসূল (সা) জানার পর বলেন :[৯৮]

الحمد لله الذى نجّى فاطمة من النار.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি ফাতিমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন।'

আরেকটি ঘটনা। রাসূল (সা) কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ফাতিমার (রা) গৃহে যাবেন। ফাতিমা (রা) পিতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলালেন, দুই ছেলে হাসান ও হুসায়নের (রা) হাতে একটি করে রূপোর

---

৯৬. প্রাগুক্ত-৪/১২৭

৯৭. কানয আল-'উম্মাল-১/৭৭; হায়াত আস-সাহাবা-১/৬৫

৯৮. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-১/৫৫৭; মুসনাদ-৫/২৭৮, ২৭৯; নিসা' হাওলার রাসূল-১৪৯

চুড়ি পরালেন। ভাবলেন, এতে তাঁদের নানা রাসূল (সা) খুশী হবেন। কিন্তু ফল উল্টো হলো। রাসূল (সা) ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন। বুদ্ধিমতি কন্যা ফাতিমা (রা) বুঝে গেলেন, পিতা কেন ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্দা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং দুই ছেলের হাত থেকে চুড়ি খুলে ফেলেন। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের নানার নিকট চলে যায়। তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, এরা আমার পরিবারের সদস্য। আমি চাইনা পার্থিব সাজ-শোভায় তারা শোভিত হোক।[৯৯]

একবার রাসূল (সা) ফাতিমা, 'আলী, হাসান ও হুসায়নকে (রা) বললেন : যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ, তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ, যাদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি ও সন্ধি তাদের সঙ্গে আমারও শান্তি ও সন্ধি। অর্থাৎ যাদের প্রতি তোমরা অখুশী তাদের প্রতি আমিও অখুশী, আর যাদের প্রতি খুশী, তাদের প্রতি আমিও খুশী।

রাসূল (সা) অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে (রা) সব সময় স্পষ্ট করে বলে দিতেন যে, নবীর (সা) কন্যা হওয়ার কারণে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না। সেখানে মুক্তির একমাত্র উপায় হবে আমল, তাকওয়া ও খাওফে খোদা। একবার তিনি ভাষণে বলেন :[১০০]

يامعشر قريش اشتروا انفسكم لاأغنى عنكم من الله شيئا، ... يافاطمة بنت محمد سليني شئت ما مالي، لاأغني من الله شيئا.

'হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সত্তাকে ক্রয় করে নাও। আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না।... হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ! তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা আমার নিকট চেয়ে নাও। তবে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।'

তিনি একথাও বলেন :

يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار، فإنى لاأملك من الله ضرا ولانفعا.

'হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ, তুমি নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তোমার উপকার ও অপকার কিছুই করতে সক্ষম হবো না।'

এক মাখযূমী নারী' চুরি করলে তার গোত্রের লোকেরা রাসূলের (সা) প্রীতিভাজন উসামা ইবন যায়দের (রা) মাধ্যমে সুপারিশ করে শাস্তি মওকুফের চেষ্টা করে। তখন রাসূল (সা) বলেন :[১০১]

---

৯৯. সাহাবিয়াত-১৪৭

১০০. বুখারী-৬/১৬ (তাফসীর সূরা আশ্ শু'আরা); নিসা' হাওলার রাসূল-১৪৯

১০১. বুখারী : আল-হুদূদ; মুসলিম : বাবু কিত'উস সারিক (১৬৮৮)

وإيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها.

'আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদও যদি চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।

পিতার উত্তরাধিকার দাবী

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকাল করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দিল। ফাতিমা (রা) সোজা খলীফা আবূ বকরের (রা) নিকট গেলেন এবং তাঁর পিতার উত্তরাধিকার বণ্টনের আবেদন জানালেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীছটি শোনান :

"لانورث، ماتركنا صدقة."

'আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই সবই সাদাকা হয়। তার কোন উত্তরাধিকার হয় না।' তারপর তিনি বলেন, এরপর আমি তা কিভাবে বণ্টন করতে পারি? এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) একটু রুষ্ট হলেন।[১০২] ফাতিমা (রা) ঘরে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকরের (রা) এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) দুঃখ পান এবং আবূ বকরের (রা) প্রতি এত নারাজ হন যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর সাথে কোন কথা বলেননি। কিন্তু ইমাম আশ-শা'বীর (রহ) একটি বর্ণনায় জানা যায়, ফাতিমা (রা) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আবূ বকর (রা) তাঁর গৃহে যান এবং সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। 'আলী (রা) ফাতিমার (রা) নিকট গিয়ে বলেন, আবূ বকর (রা) তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) 'আলীকে (রা) প্রশ্ন করলেন : আমি তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিই তাতে কি তোমার সম্মতি আছে? 'আলী (রা) বললেন : হাঁ। ফাতিমা (রা) অনুমতি দিলেন। আবূ বকর (রা) ঘরে ঢুকে কুশল বিনিময়ের পর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি আমার অর্থ-বিত্ত, পরিবার-পরিজন, গোত্র সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) এবং আপনারা আহ্‌লি বায়ত তথা নবী পরিবারের সদস্যদের সন্তুষ্টির বিনিময়ে। আবূ বকরের (রা) এমন কথায় হযরত ফাতিমার (রা) মনের সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। তিনি খুশী হয়ে যান।[১০৩] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) এ তথ্য উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, স্বামীর গৃহে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে স্বামীর অনুমতি নিতে হয়– এ সুন্নাত সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা) অবহিত ছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা সেকথা জানা যায়।[১০৪] এখানে উল্লেখিত এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত ফাতিমার (রা) অন্তরে পূর্বে কিছু অসন্তুষ্টি থাকলেও পরে তা দূর হয়ে যায়। তাছাড়া একটি বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, ফাতিমা (রা) মৃত্যুর পূর্বে আবূ

---

১০২. মুসলিম : ফিল জিহাদ ওয়াস সায়র (১৭৫৯); বুখারী : ৬/১৩৯, ১৪১; ৭/২৫৯ ফিল মাগাযী : বাব : হাদীছু বানী আন-নাদীর; তাবাকাত-৮/১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা--২/১২০

১০৩. তাবাকাত-৮/২৭

১০৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২১

বকরের (রা) স্ত্রীকে অসীয়াত করে যান, মৃত্যুর পরে তিনি যেন তাঁকে গোসল দেন।[১০৫]

মৃত্যু

হযরত ফাতিমার (রা) অপর তিন বোন যেমন তাঁদের যৌবনে ইনতিকাল করেন তেমনি তিনিও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের আট মাস, মতান্তরে সত্তুর দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের দুই অথবা চার মাস অথবা আট মাস পরে তাঁর ইনতিকালের কথাও বলেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের ছয় মাস পরে হিজরী ১১ সনের ৩ রমাদান মঙ্গলবার রাতে ২৯ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী– 'আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে'– সত্যে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে যদি হযরত ফাতিমার (রা) জন্ম ধরা হয় তাহলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৯ বছর হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, নবুওয়াত লাভের এক বছর পর ফাতিমার (রা) জন্ম হয়, এই হিসাবে তাঁর বয়স ২৯ বছর হবে না। যেহেতু অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মৃত্যুকালে ফাতিমার (রা) বয়স হয়েছিল ২৯ বছর, তাই তাঁর জন্মও হবে নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে।[১০৬]

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, হিজরী ১১ সনের ৩ রমাদান ফাতিমার (রা) ইনতিকাল হয়। হযরত 'আব্বাস (রা) জানাযার নামায পড়ান। হযরত 'আলী, ফাদল ও 'আব্বাস (রা) কবরে নেমে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর অসীয়াত মত রাতের বেলা তাঁর দাফন করা হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আলী, মতান্তরে আবূ বকর (রা) জানাযার নামায পড়ান। স্বামী 'আলী (রা) ও আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) তাঁকে গোসল দেন।[১০৭]

হযরত ফাতিমার (রা) অন্তিম রোগ সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মারাত্মক কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। উম্মু সালমা (রা) বলেন, ফাতিমার (রা) ওফাতের সময় 'আলী (রা) পাশে ছিলেন না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমার গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা করুন। নতুন পরিচ্ছন্ন কাপড় বের করুন, পরবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে নতুন কাপড় বের করে দিলাম। তিনি উত্তমরূপে গোসল করে নতুন কাপড় পরেন। তারপর বলেন, আমার বিছানা করে দিন, বিশ্রাম করবো। আমি বিছানা করে দিলাম। তিনি কিবলামুখী হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর আমাকে বলেন, আমার বিদায়ের সময় অতি নিকটে। আমি গোসল করেছি। দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার পরিধেয় বস্ত্রও খোলার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

---

১০৫. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-২২৪; টীকা নং-১
১০৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৭
১০৭. আল-ইসতী'আব-৪/৩৬৭, ৩৬৮; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০২, ৪০৫

'আলী (রা) ঘরে আসার পর আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম। তিনি ফাতিমার (রা) সেই গোসলকেই যথেষ্ট মনে করলেন এবং তাঁকে সেই অবস্থায় দাফন করেন।[১০৮] এ রকম বর্ণনা উম্মু রাফি' থেকেও পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, 'আলী (রা), মতান্তরে আবূ বকরের (রা) স্ত্রী তাঁকে গোসল দেন।[১০৯]

জানাযায় খুব কম মানুষ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তার কারণ, রাতে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং হযরত 'আলী (রা) ফাতিমার অসীয়াত অনুযায়ী রাতেই তাঁকে দাফন করেন। তাবাকাতের বিভিন্ন স্থানে এ রকম বর্ণনা এসেছে। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবীর (সা) পরে ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন এবং রাতের বেলা তাঁকে দাফন করা হয়।[১১০]

লজ্জা-শরম ছিল হযরত ফাতিমার (রা) স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আসমা' বিন্‌ত 'উমাইসকে (রা) বলেন, মেয়েদের লাশ উন্মুক্ত অবস্থায় যে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ আমার পসন্দ নয়। এতে বেপর্দা হয়। নারী-পুরুষের লাশের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয় না। পুরুষরা যে মেয়েদের লাশ খোলা অবস্থায় বহন করেন, এ তাদের একটা মন্দ কাজ। আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূলের কন্যা! আমি হাবশায় একটি ভালো পদ্ধতি দেখেছি। আপনি অনুমতি দিলে দেখাতে পারি। একথা বলে তিনি খেজুরের কিছু ডাল আনলেন এবং তার উপর একটি কাপড় টানিয়ে পর্দার মত করলেন। এ পদ্ধতি হযরত ফাতিমার (রা) বেশ পসন্দ হলো এবং তিনি বেশ উৎফুল্ল হলেন।

হযরত ফাতিমার (রা) লাশ পর্দার মধ্য দিয়ে কবর পর্যন্ত নেওয়া হয়। ইসলামে সর্বপ্রথম এভাবে তাঁর লাশটিই নেওয়া হয়। তাঁর পরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশের লাশটিও এভাবে কবর পর্যন্ত বহন করা হয়।

হযরত 'আলী (রা) স্ত্রী ফাতিমার (রা) দাফন-কাফনের কাজ সম্পন্ন করে যখন ঘরে ফিরলেন তখন তাঁকে বেশ বিষণ্ন ও বেদনাকাতর দেখাচ্ছিল। শোকাতুর অবস্থায় বার বার নীচের চরণগুলো আওড়াচ্ছিলেন :[১১১]

أرى علل الدنيا على كثيرة　　　وصاحبها حتى الممات عليل
لكل اجتماع من خليلين فرقة　　　وكل الذى دون الفراق قليل
وإن افتقادى فاطمة بعد أحمد　　　دليل على أن لايدوم خليل.

'আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মধ্যে দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি প্রচুর পরিমাণে বাসা বেঁধেছে। আর একজন দুনিয়াবাসী মৃত্যু পর্যন্ত রোগগ্রস্তই থাকে।

---

১০৮. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১৩১
১০৯. তাবাকাত-৮/১৭, ১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৯
১১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৭
১১১. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১৩১

ভালোবাসার লোকদের প্রতিটি মিলনের পরে বিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদ ছাড়া মিলনের যে সময়টুকু তা অতি সামান্যই।

আহমাদের (সা) পরে ফাতিমার (রা) বিচ্ছেদ একথাই প্রমাণ করে যে, কোন বন্ধুই চিরকাল থাকে না।'

হযরত 'আলী (রা) প্রতিদিন ফাতিমার (রা) কবরে যেতেন, স্মৃতিচারণ করে কাঁদতেন এবং নিম্নের এ চরণ দু'টি আবৃত্তি করতেন :

مالى مررت على القبور مسلما   قبر الحبيب فلم يرد جوالى

ياقبر مالك لاتجيب مناديا   أملك بعدى خلة الأحباب.

'আমার একি দশা হয়েছে যে, আমি কবরের উপর সালাম করার জন্য আসি; কিন্তু প্রিয়ার কবর আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

হে কবর! তোমার কী হয়েছে যে, তোমার আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও না?

তুমি কি তোমার প্রিয়জনের ভালোবাসায় বিরক্ত হয়ে উঠেছো?'

দাফনের স্থান

আল-ওয়াকিদী বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আবিল মাওলাকে বললাম, বেশীর ভাগ মানুষ বলে থাকে হযরত ফাতিমার (রা) কবর বাকী' গোরস্তানে। আপনি কী মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন : বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়নি। তাঁকে 'আকীলের বাড়ীর এক কোনে দাফন করা হয়েছে। তাঁর কবর ও রাস্তার মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সাত হাত।[১১২]

হাদীছ বর্ণনা

হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আঠারোটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি অর্থাৎ হযরত 'আয়িশার (রা) সনদে বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ্ ও তিরমিযী তাঁদের নিজ নিজ সংকলনে ফাতিমা (রা) বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন। আর ফাতিমা (রা) থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : তাঁর কলিজার টুকরা দুই ছেলে– হাসান, হুসায়ন, স্বামী 'আলী ইবন আবী তালিব, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, সালমা উম্মু রাফি', আনাস ইবন মালিক, উম্মু সালামা, ফাতিমা বিন্‌ত আল-হুসায়ন (রা) ও আরো অনেকে। ইবনুল জাওযী বলেন, একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য কোন মেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।[১১৩]

---

১১২. সাহাবিয়াত-১৫৩

১১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৯; আ'লাম আন-নিসা'-১২৮, টীকা নং-১

উম্মুল ফাদল বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা, যিনি শুধু উম্মুল ফাদল নামেই পরিচিত। আরবের রীতি অনুযায়ী বড় ছেলে আল-ফাদল ইবন 'আব্বাসের নামে উপনাম ধারণ করেন। তাঁর পিতা আল-হারিছ ইবন হুয্‌ন আল-হিলালী এবং মাতা হিন্দ বিন্‌ত 'আওফ আল-কিনানিয়্যা। এই হিন্দ খাওলা নামেও পরিচিত।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারাম চাচা হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। সুতরাং উম্মুল ফাদল রাসূলুল্লাহর (সা) একজন গর্বিত চাচী। হযরত 'আব্বাসের ছেলে-মেয়ে : আল-ফাদল, 'আবদুল্লাহ, 'উবাইদুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম, 'আবদুর রহমান ও উম্মু হাবীবের গর্ভধারিনী মা। ইমাম আজ জাহাবী বলেছেন ঃ 'তিনি হযরত আব্বাসের (রা) ছয়জন মহান পুত্রের জননী'।[২] 'আরব কবি 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-হিলালী বলেছেন ঃ 'উম্মুল ফাদলের গর্ভের ছয় সন্তানের মত কোন সন্তান আরবের কোন মহিয়ষী নারী জন্মদান করেননি।'[৩]

তাঁর অনেকগুলো সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ছিলেন, যাঁদের অনেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। যেমন মায়মূনা বিনত আল-হারিছ, সহোদর বোন- রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনী। আল-'আসমা' বিন্‌ত আল হারিছ- যিনি লুবাবা আস-সুগরা নামে পরিচিত, প্রখ্যাত সাহাবী ও সেনানায়ক খালিদ ইবন আল ওয়ালিদের (রা) গর্বিত মা। 'আয্‌যা বিন্‌ত আল-হারিছ ও হুযাইলা-বিন্‌ত আল-হারিছ। শেষোক্ত তিনজন তাঁর বৈমাত্রেয় বোন। আর মাহমিয়্যা ইবন জাযাআ আয-যুবাইদী, সুলমা, আসমা' ও সালামা- সবাই তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই-বোন।[৪] সুতরাং দেখা গেল, তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনার আপন বোন ও সেনাপতি খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের খালা।

বোন সালমা ছিলেন হযরত হামযার (রা) স্ত্রী, এবং আসমা ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) ভাই প্রখ্যাত সেনানায়ক ও শহীদ সাহাবী হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিবের (রা) স্ত্রী। জা'ফারের শাহাদাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হন তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'আলী (রা) হন তাঁর তৃতীয় স্বামী। উম্মুল ফাদলের মা এদিক দিয়ে খুবই সৌভাগ্যবতী যে, তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ঘরের সর্বোত্তম সন্তানদেরকে কন্যাদের বর হিসেবে লাভ করেন। আর এ সৌভাগ্যের ব্যাপারে অন্য কোন নারী তাঁর সমকক্ষ নেই।[৫]

---

১. তাবাকাত-৮/২৭৭; আল-ইসাবা-৪/৩৯৮
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৪; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪৪৭
৩. তাবাকাত-৮/২৭৭; আল-ইসতী'আব, আল ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩৯৯
৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৩৯
৫. তাবাকাত-৮/২৭৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৯৯

তিনি মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ভাগে মুসলমান হন। বর্ণিত হয়েছে, তিনি মক্কার প্রথম মহিলা যিনি হযরত খাদীজার (রা) পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] তবে আল-ইসাবা গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি হিজরাতের পূর্বে মুসলমান হন।[৭] তবে মুহাদ্দিছগণ এ বর্ণনাটিকে দুর্বল এবং প্রথমোক্ত বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন।[৮] ইমাম জাহাবী তাঁকে প্রথম পর্বের মুসলমান বলেছেন।[৯]

রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম আবু রাফে' বলেছেন, আমি ছিলাম 'আব্বাসের দাস। আমাদের আহলি বায়তের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করে। 'আব্বাস ও উম্মুল ফাদল ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর আমিও ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু 'আব্বাস তাঁর ইসলাম গোপন রাখেন।[১০] এটাই সঠিক যে 'আব্বাস প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তা গোপন রাখেন।

মক্কার আদি পর্বের মুসলমান হলেও স্বামী হযরত 'আব্বাসের (রা) মদীনায় হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মক্কার মাটি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকেন। হযরত 'আব্বাস (রা) অনেক দেরীতে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং একেবারে শেষের দিকে মদীনায় হিজরাত করেন। আর তখনই উম্মুল ফাদল (রা) তাঁর সন্তানদের সহ মদীনায় হিজরাত করেন।[১১] তাই তাঁর ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) পরবর্তীকালে সূরা আন-নিসার ৭৫ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলতেন, এ আয়াতে যে দুর্বল নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, আমার মা ও আমি হলাম সেই নারী ও শিশু।[১২] আয়াতটির মর্ম এরূপ : 'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী!' হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় তাঁরা হযরত 'আব্বাসের (রা) আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাত করতে অক্ষম ছিলেন। একথা বলেছেন ইমাম আজ-জাহাবী।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুল ফাদল সহ তাঁর অন্য বোনদেরকে ঈমানদার বলে ঘোষণা দান করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে মায়মূনা, উম্মুল ফাদল, লুবাবা সুগরা, হুযাইলা, 'আয্যা, আসমা ও সালমা—এই বোনদের নাম আলোচনা করা হলো। রাসূল (সা) বললেন : এই সকল বোন মু'মিনা বা ঈমানদার।[১৪] রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের কিছু কিছু ঘটনা দ্বারা জানা যায়, তিনি চাচী উম্মুল ফাদলকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি

---

৬. তাবাকাত-৮/২৭৭
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
৮. সাহাবিয়াত-১৭৪
৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩০
১১. তাবাকাত-৮/২৭৮
১২. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আন-নিসা'
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
১৪. তাবাকাত-৮/২৭৮; আল-ইসাবা-৪/৪০১

গুরুত্বও দিতেন। চাচীও তাঁকে খুবই আদর করতেন। রাসূল (সা) প্রায়ই চাচীকে দেখার জন্যে তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম নিতেন।[১৫]

আল-আজলাহ্ যায়দ ইবন আলী ইবন হুসায়নের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পর একমাত্র উম্মুল ফাদল ছাড়া অন্য কোন মহিলার কোলে মাথা রাখেননি এবং তা রাখা তাঁর জন্যে বৈধও ছিল না। উম্মুল ফাদল রাসূলুল্লাহর (সা) মাথা নিজের কোলের উপর রেখে সাফ করে দিতেন এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে দিতেন। একদিন তিনি যখন সুরমা লাগাচ্ছেন, তখন হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি রাসূলুল্লাহর (সা) গণ্ডে পড়ে। তিনি মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করেন : কি হয়েছে? উম্মুল ফাদল বলেন : আল্লাহ আপনাকে মৃত্যু দান করবেন। যদি এ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা আমাদের মধ্যে থাকে অথবা অন্যদের হাতে চলে যায় তাহলে আমাদের মধ্যে কে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে তা যদি বলে যেতেন। রাসূল (সা) বললেন : আমার পরে তোমরা হবে ক্ষমতাহীন, দুর্বল।[১৬] ইমাম আহমাদের বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় এ ঘটনাটি ঘটে।[১৭]

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মুল ফাদলও হজ্জ করেন। আরাফাতে অবস্থানের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা অবস্থায় আছেন কিনা, সে ব্যাপারে সাহাবীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের সে দ্বিধার কথা উম্মুল ফাদলের নিকট প্রকাশ করেন। উম্মুল ফাদল বিষয়টি নিশ্চিত হবার জন্য এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পেশ করেন এবং তিনি তা পান করেন। এভাবে তাঁদের সব দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে যায়।[১৮]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা) একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার দেহের একটি অঙ্গ আমার ঘরে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : স্বপ্নের তাবীর ইনশাআল্লাহ ভালো। ফাতিমার একটি পুত্র সন্তান হবে এবং আপনি তাকে দুধ পান করাবেন। এভাবে আপনি হবেন তার তত্ত্বাবধায়িকা। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ফাতিমা হযরত হুসাইনকে (রা) জন্ম দেন এবং উম্মুল ফাদল (রা) তাঁকে দুধও পান করান। একদিন তিনি হুসাইনকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনেন। শিশু হুসাইন নানার কোলে পেশাব করে দেন। উম্মুল ফাদল তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে পেশাব করে দিয়েছো? রাসূল (সা) বলেন: আপনি আমার সন্তানকে ধমক দিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। তারপর পানি দিয়ে পেশাব ধোয়া হয়।[১৯]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তিরিশটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একথা ইমাম জাহাবী মুসনাদে বাকী ইবন মুখাল্লাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি

১৫. তাবাকাত-৮/২৭৭; উসুদুল গাবা-৫/৫৩৯
১৬. তাবাকাত-৮/২৭৮
১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩৭
১৮. তাবাকাত-৮/২৭৯
১৯. প্রাগুক্ত

মাত্র হাদীছ মুত্তাফাক ‘আলাইহি, একটি ইমাম বুখারী এবং তিনটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২০]

উম্মুল ফাদল থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : ‘আবদুল্লাহ, তাম্মাম, আনাস ইবন মালিক, ‘আবদুল্লাহ ইবন হারিছ, ‘উমাইর, কুরাইব ও ফাবূস।[২১]

হযরত উম্মুল ফাদল একজন উঁচু স্তরের ‘আবিদা এবং দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মহিলা ছিলেন। প্রতি সোম ও বুধবার রোযা রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। একথা তাঁর সুযোগ্য ছেলে মহান সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেছেন।[২২] তৃতীয় খলীফা হযরত ‘উছমানের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর স্বামী হযরত ‘আব্বাস (রা) জীবিত ছিলেন। হযরত ‘উছমান (রা) জানাযার নামায পড়ান।[২৩]

২০. সিয়ারু আ‘লাম আন-নুবালা-২/৩১৫; দ্র. বুখারী-২/২০৪, ৪/২০৬; মুসলিম, হাদীস নং ৪৬২, ১১২৩, ১৪৫১

২১. উসুদুল গাবা-৫/৫৪০

২২. তাবাকাত-৮/২৭৮; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১৭

২৩. সিয়ারু আ‘লাম আন-নুবালা-২/৩১৫ সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১৭

সাফিয়্যা (রা) বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব

হযরত সাফিয়্যা (রা) ও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বংশ ও পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন। কারণ হযরত সাফিয়্যা (রা) 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) মায়ের সৎ বোন হালা বিন্‌ত ওয়াহাব ছিলেন সাফিয়্যার মা। সুতরাং এ দিক দিয়ে সাফিয়্যার মা রাসূলুল্লাহর (সা) খালা।[১] উহুদের শহীদ সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা) তাঁর ভাই। দুইজন একই মায়ের সন্তান।[২]

জাহিলী যুগে আবু সুফইয়ান ইবন হারবের ভাই হারিছ ইবন হারবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তার ঔরসে এক ছেলের জন্ম হয়। হারিছের মৃত্যুর পর 'আওয়াম ইবন খুওয়াইলিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং এখানে যুবাইর, সায়িব ও 'আবদুল কা'বা— এ তিন ছেলের মা হন।[৩] উল্লেখ্য যে এই 'আওয়াম ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা'র (রা) ভাই। অতএব দেখা যাচ্ছে তিনি 'আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের গর্বিত মা এবং জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও স্বৈরাচারী ইয়াযীদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের দাদী।

হযরত সাফিয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। একমাত্র তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কোন দ্বিমত নেই। ইবন সা'দ আরওয়া, 'আতিকা ও অন্য ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন। তবে সত্য এই যে, একমাত্র সাফিয়্যা ছাড়া অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইবনুল আছীর একথাই বলেছেন।[৪] তাঁর হিজরাত সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি স্বামী 'আওয়ামের সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। ইবন সা'দ শুধু এতটুকু বলেছেন :[৫]

هاجرت إلى المدينة. 'তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ [৬] নাযিল হয় তখন তিনি দাঁড়িয়ে এভাবে সম্বোধন করেন :[৭]

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৯২; আল-ইসাবা-৪/৩৪৮
২. তাহজীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৯
৩. তাবাকাত-৮/৪২
৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৯২; তাহজীবুল আসমা' ওয়াললুগাত-১/৩৪৯,
৫. তাবাকাত-৮
৬. সূরা আশ-শু'আরা'-২১৪
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১

–'হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ, হে সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব, হে 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরেরা, আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। তোমরা আমার ধন-সম্পদ থেকে যা-খুশি চাইতে পার।'

তিনি কয়েকটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তা বিস্ময়কর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে আছে।

খন্দক, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিতের (রা) ফারে' দুর্গে নিরাপত্তার জন্যে রেখে যান। এই ফারে' দুর্গকে 'উতুম' দুর্গও বলা হতো। তাঁদের সাথে হযরত হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যাও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি দুর্গের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ গুণলেন, যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ, রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা অন্য ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান (রা) বললেন, আপনার জানা আছে, আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহস থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে (রা) বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[৮]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা (রা) লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সানকে বলেন, ধর, এটা দুর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন: এ আমার কাজ নয়। অতঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। আর ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাফিয়্যা (রা) বলতেন :

أنا أول إمرأةٍ قتلتُ رجلاً .

'আমিই প্রথম মহিলা যে একজন পুরুষকে হত্যা করেছে।' একথা উরওয়া বর্ণনা করেছেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধ হয় খন্দক যুদ্ধের পূর্বে। এই উহুদ যুদ্ধেও হযরত সাফিয়্যা অংশগ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানরা কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পালাতে থাকে। তখন মূলত এক রকম পরাজয়ই ঘটে গিয়েছিল। তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) হাতে একটি নিযা নিয়ে

---

৮. তাবাকাত-৮/৪১; কান্‌যুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪; আল-বিদায়া-৪/১০৮,

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭০, ৫২২; তাহজীবুল কামাল-৬/২৪

রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈনিকদের যাকে সামনে পাচ্ছিলেন, পিটাচ্ছিলেন, আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলেন– তোমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ফেলে পালাচ্ছো? এ অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়েন। রাসূল (সা) যুবাইরকে বলেন, তিনি যেন হামযার লাশ দেখতে না পান। কারণ, কুরায়শরা লাশের সাথে অমানবিক আচরণ করে। কেটে-কুটে তারা লাশ বিকৃত করে ফেলে। ভাইয়ের লাশের এমন বিভৎস অবস্থা দেখে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়তে পারেন, এমন চিন্তা করেই রাসূল (সা) যুবাইরকে এমন নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত যুবাইর (রা) মার নিকট এসে বলেন, মা, রাসূল (সা) আপনাকে ফিরে যাবার জন্য বলছেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ জানেন, আমার ভাইয়ের লাশের সাথে এমন আচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়, তবুও আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। ইন্‌শাআল্লাহ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো। মায়ের এসব কথা যুবাইর (রা) রাসূলকে (সা) জানালেন। তারপর তিনি সাফিয়্যাকে (রা) ভাইয়ের লাশের কাছে যাবার অনুমতি দান করেন। হযরত সাফিয়্যা ভাইয়ের লাশের নিকট যান এবং দেহের টুকরো টুকরো অংশগুলি দেখেন। নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। মুখে শুধু (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন) উচ্চারণ করে তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন। তিনি চলে যাবার পর রাসূল (সা) হযরত হামযার (রা) লাশ দাফনের নির্দেশ দান করেন।[১০]

রাসূল (সা) সেদিন বলেছিলেন, যদি সাফিয়্যার কষ্ট না হতো এবং আমার পরে এটা একটা রীতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে হামযার লাশ এভাবে ময়দানে ফেলে রাখতাম। পশু-পাখীতে খেয়ে ফেলতো।[১১]

হযরত সাফিয়্যার (রা) জীবিকার জন্যে রাসূল (সা) খাইবার বিজয়ের পর সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে বাৎসরিক চল্লিশ ওয়াসক শস্য নির্ধারণ করে দেন।[১২]

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে ৭৩ (তিয়াত্তর) বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। বাকী' গোরস্তানে মুগীরা ইবন শু'বার আঙ্গিনায় অজুখানার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। অনেকে বলেছেন, তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৩] কিন্তু একথা সঠিক নয়।

কাব্য প্রতিভা

হযরত সাফিয়া (রা) ছিলেন কুরায়শ গোত্রের হাশিমী শাখার একজন মহিলা কবি এবং একজন সুভাষিণী মহিলা। জিহাদ ও অন্যান্য সৎকর্মের অঙ্গনে তিনি যেমন চমক সৃষ্টি করেন, তেমনি শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষার জন্যেও খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষাকে বেশ ভালো মতই আয়ত্তে আনেন। তাঁর মুখ থেকে অবাধ গতিতে কবিতার শ্লোক বের হতো।

---

১০. তাবাকাত-৮/৪২; উসুদুল গাবা-৫/৪৯২,

১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৫,

১২. তাবাকাত-৮/৪১,

সেই সব শ্লোক হতো চমৎকার ভাব বিশিষ্ট, প্রাঞ্জল ও সাবলীল; কোমল, সত্য ও সঠিক আবেগ-অনুভূতি এবং চমৎকার বীরত্ব ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন তাঁর ছোট্ট শিশু সন্তান আয-যুবায়রকে কোলে নিয়ে দোলাতেন তখন তাঁর মুখ থেকে বীরত্ব ব্যাঞ্জক কবিতার শ্লোক অবাধে বের হতে থাকতো।[১৪]

ইতিহাস ও সীরাতের (চরিত অভিধান) গ্রন্থসমূহে হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর যে সকল কবিতা সংরক্ষিত দেখা যায় তাতে তিনি যে আরবের একজন বড় মহিলা কবি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ মরসিয়া রচনায় তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করার মত। এ কারণে অনেকে তাঁকে خنساء قريش বা 'কুরায়শ বংশের খানসা' অভিধায় ভূষিত করেন।[১৫]

আল্লামা সুয়ূতী 'আদ-দুররুল মানছুর' গ্রন্থে বলেছেন :[১৬]

'তিনি একজন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী কবি ছিলেন। কথা, কর্মে, সম্মান-মর্যাদা ও বংশ গৌরবে তিনি গোটা আরববাসীর নিকট বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন।'

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর সাফিয়্যা (রা) তাঁর বোনদের ও বানু হাশিমের মেয়েদের সমবেত করে একটি শোক অনুষ্ঠানের মত করেন। সেই অনুষ্ঠানে অনেক মহিলা স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করেন। হযরত সাফিয়্যাও একটি মরসিয়া পাঠ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই মরসিয়াটি সংকলিত হয়েছে।[১৭]

তার দুটি শ্লোক নিম্নরূপ :

أرقت لصوت نائحة بليل + على رجل بقارعة الصّعيد

فقاضت عند ذلكم دموعى + على خدى كمنحدر الفريد

উঁচু ভূমির এক ব্যক্তির জন্যে রাত্রিকালীন
বিলাপকারিণীর আওয়াজে আমি জেগে উঠি
অতঃপর আমার দু'গণ্ড বেয়ে এমনভাবে অশ্রু গড়িয়ে
পড়লো যেমন ঢালু স্থান থেকে মতি গড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তার কিছু অংশ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। তার কয়েকটি শ্লোক এখানে তুলে ধরা হলো :[১৮]

---

১৩. প্রাগুক্ত-৮/৪২; তাহজীবুল আসমা' ওয়াললুগাত-১/৩৪৯; আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-৪/৩৪৫

১৪. সিয়ারু আ'লাম আনা-নুবালা-১/৪৫,

১৫. নিসা' মিন 'আসরিন নুবুওয়াহ্-৪১৯.

১৬. আদ-দুর্রুল মানছুর-২৬১,

১৭. দ্রষ্টব্য : সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৯-১৭৪

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১; দ্রষ্টব্য : হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৭-৩৪৮

عينُ جودى بدمعة وسهود + واندبى خير هالك مفقود

واندبى المصطفى بحزن شديد + خالط القلب فهو كالمعمود

كدت أقضى الحياة لما أتاه + قدَرٌ خطَّ فى كتاب مجيد

ولقد كان بالعباد رؤوفًا + ولهم رحمة، وخير رشيد

رضى الله عنه حيًا وميتًا + وجزاهُ الجنان يوم الخلود.

'হে আমার চক্ষু! অশ্রু বর্ষণ ও রাত্রি জাগরণের
ব্যাপারে বদান্যতা দেখাও। একজন সর্বোত্তম মৃত,
হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্যে বিলাপ কর।
প্রচণ্ড দুঃখ- বেদনা সহকারে মুহাম্মাদ আল-মুসতাফার
স্মরণে বিলাপ কর। যে দুঃখ-বেদনা অন্তরে মিলে
মিশে একাকার হয়ে তাকে ঠেস দিয়ে বসানো
রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত করে দিয়েছে।

আমার জীবন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল–
যখন তাঁর সেই নির্ধারিত মৃত্যু এসে যায়,
যা একটি মহা সম্মানিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি কোমল,
দয়ালু ও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক।

জীবন ও মৃত্যু– সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় থাকুন
এবং সেই চিরন্তন দিনে আল্লাহ তাঁকে দান করুন জান্নাত।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর স্মরণে রচিত আরেকটি শোকগাঁথার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ :[১৯]

ألا يارسول الله كنت رجاءنا + وكنت بنا برًا ولم تك جافيا

وكنت رحيما هاديا معلما + لبيك عليك اليوم من كان باكيا

فدىً لرسول الله أمى وخالتى + وعمى وخالى ثم نفسى وماليا

فلو أن ربَّ الناس أبقى نبيّنا + سعدنا ولكن أمره كان ماضيا

عليك من الله السلام تحية + وأدخلت جنات من العدن راضيا.

---

১৯. শা'ইরাতুল 'আরাব-২০২-২০৫

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-ভরসা। আপনি ছিলেন আমাদের সাথে সদাচরণকারী এবং ছিলেন না কঠোর।
আপনি ছিলেন দয়ালু, পথের দিশারী ও শিক্ষক। যে কোন বিলাপকারীর আজ আপনার জন্যে বিলাপ করা উচিত।
আল্লাহর রাসূলের জন্যে আমার মা, খালা, চাচা, মামা এবং আমার জীবন ও ধন-সম্পদ সবই উৎসর্গ হোক।
মানব জাতির প্রতিপালক যদি আমাদের নবীকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতেন, আমরা সৌভাগ্যবান হতাম। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত তো পূর্বেই হয়ে আছে।
আপনার সম্মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! আর সন্তুষ্টচিত্তে আপনি চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করুন।'
উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈনিকরা বিপর্যস্ত অবস্থায় রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন হযরত সাফিয়্যা যে সাহসের পরিচয় দেন তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে সময় তিনি হামযার (রা) স্মরণে একটি কবিতাও রচনা করেন। তাতে একটি চিত্র তুলে ধরেন। তার একটি বয়েত নিম্নরূপ :[২০]

إن يومًا أتى عليك ليوم + كورت شمسه وكان مضيئًا.

'আজ আপনার উপর এমন একটি দিন এসেছে– যে দিনের সূর্য অন্ধকার হয়ে গেছে, অথচ তা ছিল আলোকোজ্জ্বল।'

২০. আল-ইসাবা-৪/৩৪৯

উম্মু আয়মান বারাকা (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাসী উম্মু আয়মান। তাঁর ভালো নাম 'বারাকা'। হাবশী কন্যা। পিতার নাম সা'লাবা ইবন 'আমর। রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত পিতা 'আবদুল্লাহর, মতান্তরে মাতা আমিনার দাসী ছিলেন।[১] উত্তরাধিকার সূত্রে রাসূল (সা) দাসী হিসেবে উম্মু আয়মানকে লাভ করেন। খাদীজার সাথে বিয়ের পর রাসূল (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[২] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) কোলে-কাঁখে করে যাঁরা বড় করেন, তিনি তাঁদের একজন।[৩] রাসূলুল্লাহর (সা) সাতটি ছাগী ছিল, উম্মু আয়মান সেগুলো চরাতেন।[৪]

রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন ছয় বছর তখন মা আমিনা তাঁকে সংগে করে মদীনায় যান স্বামীর কবর যিয়ারতের জন্য। এ সফরে সাথে ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিব ও উম্মু আয়মান।[৫]

'উবাইদ ইবন 'আমর আল-খাজরাজী ইয়াছরিব থেকে মক্কায় এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি উম্মু আয়মান বারাকাকে বিয়ে করেন। তারপর সস্ত্রীক ইয়াছরিবে ফিরে যান। সেখানে ছেলে আয়মানের জন্ম হয়। কিছু দিন পর 'উবাইদ মারা গেলে তিনি আবার মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারে ফিরে আসেন। বালাজুরী বলেন, 'উবাইদের সাথে উম্মু আয়মানের এ বিয়ে হয় জাহিলী যুগে। রাসূলুল্লাহর (সা) সংসারে তিনি বিধবা অবস্থায় জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দেন। অতঃপর রাসূল (সা) একদিন মক্কায় তাঁর সাহাবীদের বললেন : 'তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের অধিকারিণী কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মু আয়মানকে বিয়ে করে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) পালিত পুত্র এবং অতি প্রীতিভাজন যায়দ ইবন হারিছ তাঁকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাসূল (সা) নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর সাথে উম্মু আয়মানের বিয়ে দেন। যায়দের ঘরে পরবর্তীকালের বিখ্যাত সেনানায়ক উসামার জন্ম হয়। প্রথম স্বামীর ঘরের সন্তান আয়মানের নাম অনুসারে আরবের রীতি অনুযায়ী তিনি উম্মু আয়মান উপনাম গ্রহণ করেন এবং এ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর আসল নাম 'বারাকা'। এই আয়মান মুসলমান হন এবং হুনাইন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৬]

উম্মু আয়মান (রা) ইসলামের প্রথম পর্বেই মুসলমান হন। যেসব ব্যক্তি হাবশা ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরতের গৌরব অর্জন করেন, তিনি তাঁদের একজন। প্রথমে হাবশায়

---

১. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৩
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬, ৪৭৬
৪. প্রাগুক্ত-১/৫১৩
৫. প্রাগুক্ত-১/৯৪
৬. প্রাগুক্ত-১/৪৭২-৪৭৩; তাবাকাত-৮/২২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৪

হিজরাত করেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে আবার স্বামী যায়দ ইবন হারিছার সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[৭] তিনি উহুদ ও খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদে সৈনিকদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।[৮]

বালাজুরী বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী উম্মু আয়মান (রা) উহুদ যুদ্ধে আনসার মহিলাদের সাথে মুসলিম মুজাহিদদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে হিব্বান ইবন 'আরাকা একটি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর কাপড়ের ঝালরে লাগে এবং তাঁর দেহের কিছু অংশ বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে তীর নিক্ষেপকারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অতঃপর রাসূল (সা) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাতে একটি তীর ধরিয়ে দিয়ে বলেন : এটি মার। সা'দ তীরটি ছুড়ে মারলেন এবং তা হিব্বানের গায়ে লাগে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তা দেখে রাসূল (সা) এমনভাবে হেসে দেন যে তাঁর দাঁত দেখা যায়।[৯]

আল-হারিছ ইবন হাতিব, ছা'লাবা ইবন হাতিব, সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা, সা'দ ইবন 'উছমান ও আরো কয়েক ব্যক্তি উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসেন। উম্মু আয়মান তাঁদেরকে ভীষণ তিরস্কার করেন। তাঁদের মুখে ধুলো ছুড়ে মারতে লাগেন এবং তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন : যাও, চরকা আছে, সুতা কাট।[১০]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) আজীবন রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারের লোকদের সাথেই তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।[১১] 'আলী ও ফাতিমার বিয়ের সময়ও আমরা উম্মু আয়মানকে (রা) সবার অগ্রভাগে দেখি। রাসূল (সা) আদরের কন্যা ফাতিমাকে স্বামীগৃহে পাঠালেন, পরদিন সকালেই মেয়ে-জামাইকে দেখার জন্য ছুটে গেলেন জামাই বাড়ি। দরজায় টোকা দিলেন। বিয়ে বাড়িতে মহিলাদের বেশ ভিড়। রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি টের পেয়ে সবাই বেশ সতর্ক হয়ে পড়েছে। উম্মু আয়মান দরজা খুলে দিলে রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : আমার ভাইকে ডেকে দাও। উল্লেখ্য যে, জামাই 'আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। উম্মু আয়মান (রা) রাতে 'আলীর বাড়িতেই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আলীকে ভাই বলছেন কেন। সে কি আপনার মেয়ের স্বামী নয়?[১২]

হিজরী ৮ম সনে যায়নাব বিন্তু রাসূলিল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলে অন্য মহিলাদের সাথে তাঁর গোসলে অংশগ্রহণ করেন। তার পূর্বে বদর যুদ্ধের সময় রুকাইয়্যা বিন্ত রাসূলিল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলে তাঁকেও গোসল দেন উম্মু আয়মান। আল-কালবী বলেন : উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে গোসল দেন উম্মু আয়মান ও উম্মুল ফাদল।[১৩]

---

৭. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১১
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২০ ৯. প্রাগুক্ত-১/৩২০
১০. প্রাগুক্ত-১/৩২৬
১১. আল-ইসাবা-৪/৪৫০; আল-ইসতী'আব-৪/৪৫০; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৯
১২. হায়াতুস সাহাব-২/৬৬৮
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০, ৪০১, ৪০৬

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু আয়মানকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করতেন। মাঝে মধ্যে মা বলেও সম্বোধন করতেন। তিনি একথাও বলতেন : 'এই পরিবারের অবশিষ্ট ব্যক্তি।'[১৪] উম্মু আয়মান (রা) একটু সরল বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে একটু হাসি-তামাশাও করতেন। একদিন উম্মু আয়মান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন বাহনের পিঠে চড়ার ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল (সা) বললেন : আমি আপনাকে মাদী উটের বাচ্চার উপর চড়াবো। উম্মু আয়মান বললেন : বাচ্চা তো আমার ভার বহন করতে পারবে না। রাসূল (সা) বললেন : আমি আপনাকে বাচ্চার উপরই চড়াবো। আসলে রাসূল (সা) তাঁর সাথে একটু তামাশা করছিলেন। হাদীছে এসেছে রাসূল (সা) অহেতুক কোন হাসি-তামাশা করতেন না। তার মধ্যেও সত্য নিহিত থাকতো। এক্ষেত্রেও তাই। কারণ, সব উট– তা ছোট হোক বা বড়, কোন না কোন মাদী উটেরই বাচ্চা।[১৫]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) সবগুলো আরবী বর্ণধ্বনি ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারতেন না। এক ধ্বনির স্থলে অন্য ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলতেন। তাতে অনেক সময় অর্থের বিকৃতি ঘটতো। যেমন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলতে চাইলেন, ثَبَّتَ اللهُ أَقْدَامَكُمْ
– আল্লাহ আপনাদের পদসমূহ সুদৃঢ় করুন। কিন্তু তিনি ثَبَّتَ -এর স্থলে বললেন– سَبَّتَ। ফলে অর্থ বিকৃতি ঘটলো। তাই রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : أَسْكُتِي
আপনি চুপ করুন। কারণ, আপনি আরবী ভাষার বর্ণধ্বনি উচ্চারণ করতে পারেন না।[১৬]

আবু জা'ফার আল-বাকির বলেছেন, একদিন উম্মু আয়মান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন এবং সালাম দিতে গিয়ে উচ্চারণ করলেন এভাবে : سَلاَمَ لاَ عَلَيْكُمْ (সালামা লা 'আলাইকুম)। সেদিন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে শুধু اَلسَّلاَمُ (আস্-সালামু) বলার অনুমতি দান করেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুবরণ করলে উম্মু আয়মান ভীষণ দুঃখ পান এবং কাঁদতে শুরু করেন। লোকেরা বললো : আপনি কাঁদছেন? জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, আমি জানতাম তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আজ থেকে আমাদের নিকট আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আবু বকর (রা) 'উমারকে (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু আয়মানের সাথে মাঝে মধ্যে যেমন দেখা করতেন, চলো যাই আমরাও তাঁর সাথে একটু দেখা করে আসি। তাঁরা দুইজন উম্মু আয়মানের (রা) নিকট

১৪. তাবাকাত-৮/২২৩; আল-হাকিম-৪/৬৩
১৫. আল-বিদায়া-৬/৪৬; আল-আদাব আল মুফরাদ লিল বুখারী- ৪১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৫
১৬. তাবাকাত-৮/২২৫
১৭. প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৫

পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা বললেন : আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা তাঁর রাসূলের (সা) জন্য উত্তম। উম্মু আয়মান বললেন : আমি সে কথা না জেনে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ কথা শুনে আবু বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে কাঁদা শুরু করলেন।[১৮] এমনিভাবে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) শাহাদাত বরণ করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, "আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে গেল।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর আনসারগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অনেক খেজুর বাগান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে যখন মদীনার ইহুদী গোত্র বানু কুরায়জা ও বানু নাদীর মদীনা থেকে বিতাড়িত হয় এবং তাদের সবকিছু মুসলমানদের হাতে আসে তখন তিনি আনসারদের সেই বাগ-বাগিচা ফেরত দিতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে হযরত আনাসেরও (রা) কিছু ছিল। রাসূল (সা) সেই বাগান উম্মু আয়মানকে দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) যখন সেই বাগান ফেরত নেওয়ার জন্য উম্মু আয়মানের নিকট গেলেন তখন তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। পরে রাসূল (সা) সেই বাগানের পরিবর্তে তাঁকে দশগুণ বেশী দান করেন।[২০]

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন উম্মু আয়মানের বাড়িতে যান। উম্মু আয়মান পান করার জন্য শরবত পেশ করেন। রাসূল (সা) রোযা অবস্থায় ছিলেন। এ কারণে পান করতে ইতস্তত: করেন। এতে উম্মু আয়মান খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[২১] সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) রোযার কথা জানতেন না। আর সে কথা প্রকাশ করা রাসূলুল্লাহ (সা) জরুরী কোন বিষয় বলেও মনে করেননি।

হযরত উম্মু আয়মান (রা) রাসূল্লাল্লাহর (সা) হাদীছও বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায়।[২২] তাঁর সূত্রে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, হান্‌শ ইবন 'আবদিল্লাহ সান'আনী এবং আবু ইয়াযীদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর প্রথম স্বামীর পক্ষে আয়মান এবং দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে উসামা– এই দুই ছেলে ছিল। তাঁরা দুইজনই সাহাবী ছিলেন। উসামা অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। আয়মানের এক ছেলে ছিলেন হাজ্জাজ ইবন আয়মান। একদিন তিনি মসজিদে ঢুকে রুকু-সিজদা দায়সারাভাবে করে খুব তাড়াতাড়ি নামায শেষ করেন। পাশে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বসা

---

১৮. সাহীহ মুসলিম; ফাদায়িলস সাহাবা (২৪৫৪); ইবন মাজা: আল-জানায়িয (১৬৩৫); কানয আল-'উম্মাল-৪/৪৮; আল-বিদায়া-৫/২৭৪

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭

২০. সহীহ আল-বুখারী; আল-মাগাযী-৭/৩১৬; মুসলিম; আল-জিহাদ ও সায়র-২/৩৪১

২১. মুসলিম-২/৩৪১

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭

২৩. সাহাবিয়াত-২০০

ছিলেন। তিনি ইবন আয়মানকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মনে করেছো যে, তোমার নামায হয়েছে? তোমার নামায হয়নি। যাও, আবার পড়। ইবন আয়মান চলে যাওয়ার পর ইবন 'উমার (রা) লোকদের নিকট জিজ্ঞেস বরেন, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো : হাজ্জাজ ইবন আয়মান– উম্মু আয়মানের পৌত্র। ইবন 'উমার (রা) তখন মন্তব্য করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখলে আদর করতেন।[২৪]

খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে হযরত উম্মু আয়মান (রা) ইনতিকাল করেন। আর ইবনুল আছীর যে বলেছেন, তিনি রাসূলাল্লাহর (সা) ওফাতের পাঁচ অথবা ছয় মাস পরে ইনতিকাল করেছেন, তা সঠিক নয়।[২৫]

উম্মু আয়মানের (রা) সাথে সম্পর্কিত একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তিনি যখন হিজরাত করছিলেন তখন পথিমধ্যে এক স্থানে সন্ধ্যা হলো এবং তিনি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। ধারে কাছে কোথাও পানি ছিল না। এমন সময় আকাশ থেকে সাদা রশিতে ঝোলানো এক বালতি পানি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি পেট ভরে সেই পানি পান করলেন। ফল এই দাঁড়ায় যে, তিনি জীবনে আর কখনো পিপাসায় কাতর হননি। তিনি বলতেন, প্রচণ্ড গরমের দুপুরেও রোযা অবস্থায় আমার পিপাসা হয়না।[২৬]

তাবারানী বর্ণনা করেছেন। একবার আল-গিফার গোত্রের একদল লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলো। এ দলটির মধ্যে জাহ্জাহ্ আল গিফারীও ছিলেন। তারা মসজিদে রাসূল্লুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায় করলেন। নামাযে সালাম ফেরানোর পর রাসূল (সা) ঘোষণা দিলেন : মুসল্লীদের প্রত্যেকেই তার পাশের অতিথিকে সাথে করে নিয়ে যাবে। জাহ্জাহ্ আল-গিফারী বলেন : সবাই চলে গেল। মসজিদে কেবল আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গেলাম। আমি ছিলাম একজন দীর্ঘদেহী মোটা মানুষ। রাসূল (সা) আমাকে সংগে করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার জন্যে একটি ছাগীর দুধ দুইয়ে আনলেন। আমি তা এক চুমুকে শেষ করে ফেললাম। তারপর হাঁড়িতে রান্না করা খাবার আনলেন, তাও সাবাড় করে ফেললাম। এভাবে আমি একের পর এক সাতটি ছাগীর দুধ শেষ করে ফেললাম। এ অবস্থা দেখে উম্মু আয়মান (রা) মন্তব্য করলেন : আজ রাতে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) অভুক্ত রাখলো, আল্লাহ যেন তাকে অভুক্ত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : উম্মু আয়মান, চুপ করুন। সে তার রিযিক খেয়েছে। আর আমাদের রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে।

রাত পোহালো। পরদিন দলটির সকলে একত্র হলো। প্রত্যেকেই তার খাবারের কথা বলতে লাগলো। জাহ্জাহ্ও তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। দিন কেটে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। আগের দিনের মত

---

২৪. তাবাকাত-৮/২২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৬

২৫. তাবাকাত-৮/২২৭; সাহাবিয়াত-২০০

২৬. তাবাকাত-৮/২২৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১৮

রাসূল (সা) একই ঘোষণা দিলেন। সবাই যার যার অতিথি সংগে করে চলে গেল। জাহ্জাহ্ বলেন, আজো আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গেলাম। আসলে আমার এ বিরাট বপু দেখে কেউ আমাকে নেওয়ার আগ্রহ দেখাতো না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। তারপর একটি ছাগী দুইয়ে দুধ আনলেন। আমি পান করলাম এবং তাতেই পরিতৃপ্ত হলাম। আমার আজকের এ অবস্থা দেখে উম্মু আয়মান (রা) বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কি আমাদের সেই মেহমান নয়? তিনি বললেন : হাঁ, সেই মেহমান। তবে আজ রাতে সে খেয়েছে মু'মিনের পেটে, আর গতরাতে খেয়েছিল কাফিরের পেটে। কাফির খায় সাতটি পেটে, আর মু'মিন খায় একটিতে।[২৭]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) রাসূল্লাল্লাহর (সা) জন্য খাবার তৈরি করতেন। একদিন তিনি আটা চাললেন এবং সেই চালা আটা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রুটি তৈরি করলেন। রুটি দেখে রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন। এ কি? উম্মু আয়মান বলেন : আমাদের দেশে আমরা এরূপ রুটি তৈরি করে থাকি। তাই আপনাকে এরূপ রুটি খাওয়াতে চেয়েছি। উল্লেখ্য যে, উম্মু আয়মানের (রা) জন্মভূমি ছিল হাবশা। রাসূল (সা) বললেন : এই রুটিগুলো চেলে বের করা ভূষির সাথে মিশিয়ে দিন। তারপর চটকিয়ে আবার আটার দলা বানিয়ে ফেলুন।[২৮]

---

২৭. কানয আল-'উম্মাল-১/৯৩; আল-ইসাবা-১/২৫৩; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৭-১৯৮

২৮. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৫/১৫৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২৭৩

উম্মু হানী বিন্ত আবী তালিব (রা)

ইতিহাসে তিনি উম্মু হানী– এ ডাকনামে প্রসিদ্ধ। আসল নাম ফাখ্তা, মতান্তরে হিন্দ। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুহতারাম চাচা আবূ তালিব এবং মুহতারামা চাচী ফাতিমা বিন্ত আসাদের কন্যা। 'আকীল, জা'ফার, তালিব ও 'আলীর (রা) সহোদরা।[১] তাঁর শৈশব-কৈশোর জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বিয়ে সম্পর্কে দু'একটি বর্ণনা দেখা যায়। যেমন রাসূল (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চাচা আবূ তালিবের নিকট উম্মু হানীর বিয়ের পয়গাম পাঠান। একই সংগে হুবায়রা ইবন 'আমর ইবন 'আয়িয আল-মাখযূমীও পাঠান। চাচা হুবায়রার প্রস্তাব গ্রহণ করে উম্মু হানীকে তার সাথে বিয়ে দেন। নবী (সা) বললেন : চাচা! আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হুবায়রার সাথে তার বিয়ে দিলেন? চাচা বললেন : ভাতিজা! আমরা তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করেছি। সম্মানীয়দের সমকক্ষ সম্মানীয়রাই হয়ে থাকে।[২] এতটুকু বর্ণনা। এর অতিরিক্ত কোন কথা কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে হুবায়রা ইবন 'আমরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, সে কথা বিভিন্নভাবে জানা যায়।[৩]

উম্মু হানী কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে একটু ভিন্নতা দেখা যায়। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[৪]

تأخر اسلامها وأسلمت يوم الفتح

'তাঁর ইসলাম গ্রহণ বিলম্বে হয়। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।'

তবে রাসূলুল্লাহর (সা) মি'রাজ সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে উম্মু হানীর (রা) একটি বর্ণনাও বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। তাতে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মি'রাজ উম্মু হানীর ঘর থেকে হয়েছিল এবং তিনি তখন একজন মুসলমান। আর এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) ইসরা' (মক্কা থেকে বাইতুল মাকদাসে রাত্রিকালীন ভ্রমণ) আমার ঘর থেকেই হয়। সে রাতে তিনি 'ঈশার নামায আদায় করে আমার ঘরে ঘুমান। আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাদের ঘুম থেকে জাগান। তারপর তিনি ফজরের নামায পড়েন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়ি। তারপর তিনি বলেন : উম্মু হানী! তুমি দেখেছিলে, গতরাতে আমি এই উপত্যকায় 'ঈশার নামায আদায় করেছিলাম। তারপর আমি বাইতুল মাকদাসে যাই এবং সেখানে নামায আদায় করি। আর এখন আমি ফজরের নামায তোমাদের সাথে

---

১. সীরাতু ইবন হিশাম, ২/৪২০; আ'লাম আন-নিসা', ৪/১৪ আল-ইসতী'আব, ২/৭৭২

২. আ'লাম আন-নিসা-৪/১৪

৩. উসুদুল গাবা-৫/৬২৪

৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১২

আদায় করলাম, যা তোমরা দেখতে পেলে। তারপর তিনি বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের এক কোনা টেনে ধরলাম। ফলে তাঁর পেটের একাংশ বেরিয়ে যায়। তখন তা মিসরীয় কিবতী ভাঁজ করা কাতান বস্ত্রের মত দেখাচ্ছিল। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! একথা আর কাউকে বলবেন না। এমন কথা তারা বিশ্বাস করবে না এবং তারা আপনাকে কষ্ট দিবে। বললেন : আল্লাহর কসম! একথা আমি তাদেরকে বলবই।

আমি আমার হাবশী দাসীকে বললাম : তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) পিছে পিছে যাও এবং শোন তিনি মানুষকে কি বলেন এবং লোকেরা তাঁকে কি বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে গেলেন এবং মানুষকে ইসরার কথা বললেন। লোকেরা শুনে তো বিস্ময়ে হতবাক! তারা বললো : মুহাম্মাদ! তোমার এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ কি? আমরা তো এমন কথা আর কখনো শুনিনি। বললেন : আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে গিয়েছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, আমি সে উটের সন্ধান দিয়েছি। আমি তখন শাম অভিমুখী ছিলাম। তারপর আমি "দাজনান"– এ অমুক গোত্রের কাফেলাকে পেয়েছি। আমি যখন তাদের অতিক্রম করি তখন তারা ঘুমিয়ে। তাদের একটি পানির পাত্র কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি পাত্র থেকে পানি পান করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। আমার এ দাবীর প্রমাণ হলো এখন সেই কাফেলা বায়দা থেকে তান'ঈমের বাঁকের পথে আছে। যার অগ্রভাগে রয়েছে একটি ধূসর বর্ণের উট। লোকেরা সংগে সংগে তান'ঈমের দিকে ছুটে গেল এবং তাদেরকে দেখতে পেল। তারা তাদেরকে পাত্রে ঢাকা দেওয়া পানির কথা বললো, তারা তার সত্যতা স্বীকার করলো। আর যে কাফেলার উট হারিয়ে গিয়েছিল তারা মক্কায় ফিরে এলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও কথাটি সত্য বলে স্বীকার করলো।[৫]

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মু হানীকে ইতিহাসের দৃশ্যপটে দেখা যায়। তাঁকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বামী মক্কা থেকে পালিয়ে নাজরানের দিকে চলে যান।[৬] স্ত্রী উম্মু হানীর ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁকে তিরস্কার করে একটি কবিতা তিনি রচনা করেন। কবিতাটির কিছু অংশ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়।[৭] নিম্নের চরণগুলোতে মক্কা থেকে পালিয়ে যাবার কারণ স্ত্রীর নিকট ব্যাখ্যা করেছেন :[৮]

لعمرك ماوليت ظهرى محمدا + وأصحابه جبنا ولاخيفة القتل

ولكننى قلبت أمرى فلم أجل + لسيفى عناء ان ضربت ولاتبلى

---

৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪০২-৪০৩; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/২৯৫

৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬২

৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪২০; উসুদুল গাবা-৫/৬২৮; ইবন দুরাইদ, আল-ইশতিকাক-১৫২

৮. আ'লাম আন-নিসা-৪/১৪

وقفت فلما خفت ضيقة موقفى + رجعت لعود كالهزبرإلى الشبل -

'তোমার জীবনের শপথ! আমি ভীরুতার কারণে ও হত্যার ভয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে আসিনি। তবে আমি নিজের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, তাতে বুঝেছি এ যুদ্ধে আমার তীর ও তরবারি যথেষ্ট নয়। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি। কিন্তু যখন আমার অবস্থান সংকীর্ণ হওয়ার ভয় করেছি তখন ফিরে এসেছি যেমন বাঘ তার শাবকের কাছে ফিরে আসে।'

অনেকে তাঁর এই ফিরে আসাকে ইসলামের দিকে ফিরে আসা বলেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ, তিনি কুফরীর উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেন।

এই মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থলে যান এবং তাঁকে গোসল করে চাশ্‌তের আট রাক'আত নামায আদায় করতে দেখেন। এ দিন তিনি দু'জন আত্মীয়কে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন এবং সে কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনিও তাদের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। নিম্নে সেই বর্ণনাগুলো তুলে ধরা হলো।

মক্কা বিজয়ের দিন আল-হারিছ ইবন হিশাম উম্মু হানীর গৃহে আশ্রয় নেয়। এ সময় উম্মু হানীর ভাই 'আলী (রা) সেখানে যান। তিনি আলীকে (রা) আল-হারিছের বিষয়টি অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'আলী (রা) তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি হাতে তুলে নেন। উম্মু হানী তাঁকে বলেন, ভাই! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কিন্তু 'আলী (রা) তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন উম্মু হানী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর দু'হাত শক্তভাবে মুঠ করে ধরে বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পার না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। 'আলী (রা) এক পাও এগোতে পারলেন না। তাঁর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না।

এ সময় নবী (সা) উপস্থিত হলেন। উম্মু হানী (রা) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুককে আশ্রয় দিয়েছি, আর 'আলী তাঁকে হত্যা করতে চায়। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। তুমি 'আলীর উপর রাগ করো না। কারণ, 'আলী রাগ করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। তাকে ছেড়ে দাও। উম্মু হানী আলীকে ছেড়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন : একজন নারী তোমাকে পরাভূত করেছে। আলী বললেন : আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মাটি থেকে আমার পা উঠাতেই পারলাম না। রাসূল (সা) হেসে দিলেন।[৯]

ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে : উম্মু হানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করলেন তখন আমার শ্বশুরের গোত্র বনূ মাখযূমের দুই ব্যক্তি আল-হারিছ ইবন হিশাম ও 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ পালিয়ে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়। এ সময় আমার ভাই 'আলী এসে উপস্থিত হয় এবং

---

৯. প্রাগুক্ত-৪/১৫; মুসনাদে আহমাদ-৬/২৪২

তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। আমি দরজা বন্ধ করে মক্কার উঁচু ভূমিতে রাসূলুল্লাহর নিকট (সা) ছুটে গেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন : উম্মু হানী! কি উদ্দেশ্যে এসেছো? আমি তখন ঐ দুই ব্যক্তি ও 'আলীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। তুমি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমরাও তাদেরকে নিরাপত্তা দিলাম। অতএব সে তাদেরকে হত্যা করবে না।[১০]

উম্মু হানী বলেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যাই। দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং ফাতিমা কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে আছেন। আমি সালাম দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : কে তুমি? বললাম : আবূ তালিবের মেয়ে উম্মু হানী। বললেন : উম্মু হানী! তোমাকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম! গোসল সেরে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। একখানা মাত্র কাপড় পরে ও গায়ে জড়িয়ে আট রাকা'আত নামায আদায় করেন। তারপর আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর 'আলী এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। বললেন : উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। সেটা ছিল চাশতের নামায।[১১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল উম্মু হানীর (রা) দারুণ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন রাসূল (সা) তাঁর গৃহে যান। উম্মু হানী (রা) তাঁকে শরবত পান করতে দিলে তিনি কিছু পান করে উম্মু হানীর দিকে এগিয়ে দেন। উম্মু হানী সেদিন নফল রোযা রেখেছিলেন। তিনি রোযা ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সা) পানকৃত অবশিষ্ট শরবত পান করেন। রাসূল (সা) তাঁর এভাবে রোযা ভাঙ্গার কারণ জানতে চাইলে জবাব দেন : আমি আপনার মুখ লাগানো শরবত পানের সুযোগ ছেড়ে দিতে পারি না। রাসূল (সা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি বলেন : উম্মু হানী, বকরী গ্রহণ কর। এ অত্যন্ত বরকতের জিনিস।[১২]

উম্মু হানীর (রা) স্বামী হুবায়রা কুফরীর উপর অটল থাকে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। উম্মু হানী ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ের পয়গাম দেন। জবাবে উম্মু হানী বলেন : আল্লাহর কসম! আমি তো জাহিলী যুগেই আপনাকে ভালোবাসতাম। এখন ইসলামী যুগে তো সে ভালোবাসা আরো গভীর হয়েছে। তবে আমি এখন একজন বিপদগ্রস্ত নারী। আমার অনেকগুলো ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। আমার ভয় হয় তারা আপনাকে কষ্ট দেবে। রাসূল (সা) বলেন : বাহনের পিঠে আরোহণকারিণীদের মধ্যে কুরাইশ রমণীরা উত্তম। তারা

---

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪১১; হায়াতুস সাহাবা-১/১৮২; ৩/১৪৫, ১৪৬

১১. সহীহ বুখারী-৩/৪৩; বাবু সালাতিল ফাজরি ফিস সাফর-৬/১৯৫, ১৯৬; কিতাবুল মাগাযী; বাবু মানযিলিন নাবিয়্যি ইউমাল ফাতহি; সাহীহ মুসলিম (৩৩৬) বাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা; বাবু ইসতিহবাবি সালাতিদ দুহা; আল-মুওয়াত্তা-১/১৫২; বাবু সালাতিদ দুহা।

১২. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৩

তাদের শিশুদের প্রতি সর্বাধিক মমতাময়ী এবং স্বামীদের অধিকারের ব্যাপারে অধিক যত্নশীলা।[১৩] অপর একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে, তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কান এবং চোখ থেকেও আপনি আমার অধিক প্রিয়। স্বামীর অধিকার অনেক বড় জিনিস। স্বামীর দিকে মনোযোগী হলে আমার নিজের এবং আমার সন্তানদের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। আর সন্তানদের দিকে মনোযোগ দিলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। তাঁর একথা শুনে রাসূল (সা) বলেন : উটের পিঠে আরোহণকারিণীদের মধ্যে কুরাইশ রমণীরা সর্বোত্তম। তারা তাদের শিশু সন্তানদের প্রতি যেমন অধিক মমতাময়ী তেমনি স্বামীর অধিকারের প্রতিও বেশী যত্নশীলা। এরপর রাসূল (সা) বিষয়টি নিয়ে আর উচ্চ-বাচ্চ করেননি।[১৪]

একবার উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আরজ করেন : আমাকে এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে করতে পারি। তিনি তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন।[১৫]

উম্মু হানী বর্ণনা করেছেন, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, তাঁর পিতা ইয়াসির, ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসির এবং মা সুমাইয়্যাকে আল্লাহর রাস্তায় থাকার কারণে শাস্তি দেওয়া হতো। একদিন তাঁদের পাশ দিয়ে রাসূল (সা) যাওয়ার সময় বলেন : ওহে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের ঠিকানা হল জান্নাত। অতঃপর নির্যাতনে ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন। সুমাইয়্যা আবূ জাহলকে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করেন। আবূ জাহল তাঁর যৌনাঙ্গে বর্শাঘাত করলে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। আর 'আবদুল্লাহকে তীর নিক্ষেপ করলে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১৬]

এমনিভাবে উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) যেমন দেখেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁতের চেয়ে সুন্দর দাঁত আর কারো দেখিনি। রাসূলুল্লাহর (সা) পেট দেখে ভাঁজ করা কাগজের কথা মনে হতো। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার কেশ চারটি গুচ্ছে ভাগ করা দেখেছি।[১৭] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা আবূ বকরের (রা) নিকট নবী দুহিতা হযরত ফাতিমার পিতার উত্তরাধিকার দাবীর বিষয়টিও উম্মু হানী (রা) বর্ণনা করেছেন।[১৮]

---

১৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪২০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৫৯

১৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৬/৮৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৪; আনসাব-১/৪৫৯; আ'লাম আন-নিসা-৪/১৬

১৫. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৩

১৬. আনসাবুল আশরাফ-১/১৬০

১৭. প্রাগুক্ত-১/৩৯৩

১৮. প্রাগুক্ত-১/৫১৯

হযরত উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ৪৬ (ছেচল্লিশটি) হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর একটি হাদীছ সংকলিত রয়েছে।[১৯] তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন : জা'দা, ইয়াহইয়া, হারূন, আবূ মূররা, আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইবন 'আয়্যাশ, আবদুল্লাহ ইবন আল হারিছ ইবন নাওফাল, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, শা'বী, 'আতা, কুরাইব, মুজাহিদ, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবন 'উকবা প্রমুখ।[২০]

হযরত উম্মু হানীর (রা) মৃত্যুসন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে "আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা" গ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি 'আলীর (রা) মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী বলেন : তিনি হিজরী ৫০ (পঞ্চাশ) সনের পরেও জীবিত ছিলেন।[২১] তাঁর কয়েকজন সন্তানের নাম হলো : 'আমর, হানী, ইউসুফ ও জা'দা। তাঁরা সকলে হযরত 'আলীর (রা) ভাগ্নে। জা'দাকে হযরত 'আলী (রা) খুরাসানের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন।[২২]

হযরত উম্মু হানীর (রা) জন্য বিশেষ মর্যাদার বিষয় এই যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর নিকট খাবার চেয়ে খেয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। একদিন রাসূল (সা) উম্মু হানীকে বললেন : তোমার নিকট খাবার কোন কিছু আছে কি?

উম্মু হানী : কিছু শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তা আপনার সামনে দিতে লজ্জা পাচ্ছি।

রাসূল (সা) বললেন : সেগুলোই নিয়ে এসো।

উম্মু হানী হাজির করলেন। রাসূল (সা) সেগুলো টুকরো টুকরো করে লবন-পানি মিশালেন। তারপর বললেন : কিছু তরকারি আছে? উম্মু হানী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু সিরকা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। রাসূল (সা) সিরকা আনতে বললেন। তিনি রুটির টুকরোগুলোতে সিরকা মিশিয়ে আহার করলেন। তারপর আল্লাহর হামদ জ্ঞাপন করে বললেন : সিরকা অতি উত্তম তরকারি। উম্মু হানী! যে গৃহে সিরকা থাকে সে গৃহ অভাবী হয় না।[২৩]

---

১৯. বুখারী-৬/১৯৫, ১৯৬ : বাবু আমান আন-নিসা ওয়া জাওযারিহিন্না; মুসলিম (৩৩৬) বাবু ইসতিহবাব সালাতিদ দুহা

২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১২; আ'লাম আন-নিসা-৪/১৬

২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৩

২২. প্রাগুক্ত-২/৩১২, ৩১৩; সাহাবিয়াত-২২৯

২৩. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ-৩/৪২; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৯৮

Contents

হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা)

জাহিলী যুগে অভিজাত আরবদের মধ্যে এ প্রথা ও রীতি প্রচলিত ছিল যে, তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা ভিন্ন গোত্রের কোন ধাত্রীর হাতে তুলে দিত। তারা মনে করতো, এতে সন্তানের মধ্যে আভিজাত্য ও ভাষার বিশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়। মক্কার অভিজাত লোকেরা তাদের শিশু সন্তানকে মরুবাসী বেদুঈনদের নিকট পাঠিয়ে দিত। সেখানে তারা বেদুঈন ধাত্রীদের নিকট দুধ পানের বয়সটি কাটাতো। তারা সন্তানদের জন্য স্বভাবগত বুদ্ধিমতী ও সুরুচির ধাত্রী নির্বাচন করতো। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধাত্রীদের উন্নত নৈতিকতা, সুঠাম দৈহিক কাঠামো, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা, সামাজিক সম্মান ও অবস্থানের দিকগুলো প্রাধান্য দিত। এসব গুণ যে মহিলার মধ্যে থাকতো সেই ধাত্রী পেশায় সফল হতো।

দুগ্ধবতী শিশু সন্তানের মায়েরা মরুভূমি থেকে বিভিন্ন শহর ও জনপদে আসতো দুধ পান করাবে এমন শিশুর খোঁজে। সেখান থেকে পারিশ্রমিকের শর্তে শিশু সন্তান সংগ্রহ করে আবার মরুভূমিতে ফিরে যেত। তারা দুধ পান করানোর সাথে সাথে শিশুদেরকে বেদুঈনদের খেলাধুলা, তাঁবু স্থাপনের কলাকৌশল, আদব-আখলাক ও বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা দিত। এ কারণে, নবী (সা) তাঁর অননুকরণীয় বিশুদ্ধ ভাষিতার প্রেক্ষাপট হিসেবে কুরাইশ গোত্রে জন্ম ও বানূ সা'দে দুধ পান ও প্রতিপালিত হওয়ার কথা উল্লেখ করতেন।[১]

তিনি সাহাবীদেরকে বলতেন : 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। কারণ, আমি কুরাইশ গোত্রের সন্তান এবং বানূ সা'দ গোত্রে দুধ পান করে বেড়ে উঠেছি।' একবার আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার চেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন : এমনটি হতে আমার বাধা কোথায়? আমি কুরাইশ গোত্রের সন্তান এবং বানূ সা'দে দুধ পান করেছি।[২]

আমাদের আলোচ্য হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা) ছিলেন বানূ সা'দ গোত্রের রাসূলুল্লাহর (সা) ভাগ্যবতী ধাত্রী তথা দুধ মা। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে কবি শায়খ ইউসুফ আন-নাবহানী (রহ) বলেছেন :[৩]

وارضعته ذات حظٍّ وافرٍ + حليمة من غرر العشائر

كان لديها القوتُ غير ياسر + فأصبحت أيسر أهل الحاضر

سعيدة قد سعدت من سعد.

---

১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭

২. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-১/১১৫; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৪৬

৩. আন-নাবহানীর "হুজ্জাতুল্লাহি 'আলাল 'আলামীন" গ্রন্থের সূত্রে "নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ" গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১

'তাঁকে দুধ পান করান পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারিণী, গোত্রসমূহের মধ্যে উজ্জ্বল চিহ্ন বিশিষ্ট গোত্রের হালীমা।

তাঁর কাছে খাদ্য ছিল অপর্যাপ্ত। অতঃপর তিনি শহরবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সচ্ছল ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তিনি একজন সৌভাগ্যবতী। ভাগ্যগুণে যিনি একজন ভাগ্যবতীতে পরিণত হন।'[৪]

এই ভাগ্যবতী মহিলা হলেন হালীমা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হারিছ আস-সা'দিয়্যা (রা)। রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী মাতা। তাঁর স্বামীর নাম আল-হারিছ ইবন 'আবদিল 'উয্‌যা ইবন রিফা'আ আস-সা'দী। তাঁর সন্তানরা হলেন : 'আবদুল্লাহ, উনাইসা ও খুযাইমা, মতান্তরে হুযাফা। শেষোক্তজন আশ-শায়মা নামেও পরিচিত। এঁরা সবাই আল-হারিছের ঔরসজাত সন্তান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই ও বোন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আবদুল্লাহ একই সাথে দুধ পান করেন। উল্লেখ্য যে, এই আল-হারিছের ডাকনাম আবূ যুওয়ায়িব ও আবূ কাবশা ছিল।[৫]

হালীমা রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবন আল-হারিছ ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের ধাত্রী ও দুধ মা ছিলেন। বানূ সা'দ গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের ধাত্রী ও দুধ মা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হালীমার কাছে তখন একদিন হামযার (রা) দুধ মা তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হালীমার নিকট যাওয়ার আগে কিছু দিন আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। ছুওয়াইবা কিছুদিন হামযাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। তাই হামযা বানূ সা'দ ও ছুওয়াইবা দু'দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই।[৬]

হালীমা রাসূলুল্লাহকে (সা) দুধ পান করিয়েছেন। এ কারণে তিনি দুধ পানকারিণী হিসেবে আরবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) তিনি দুধের শিশু হিসেবে যেভাবে লাভ করেন তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন : সে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছর। আমি বানূ সা'দের আরো দশজন মহিলার সাথে সাদা রঙ্গের একটি দুর্বল মাদি গাধার উপর সওয়ার হয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে বের হলাম। আমাদের সাথে একটা বুড়ো মাদি উটও ছিল। আল্লাহর কসম! তার ওলান থেকে এক কাৎরা দুধও বের হচ্ছিল না। ক্ষিদের জ্বালায় আমাদের শিশুদের কান্নাকাটির কারণে আমরা রাতে মোটেও ঘুমোতে পারতাম না। আমার বুকের ও আমাদের উটনীর দুধে আমার শিশু পুত্র 'আবদুল্লাহর পেট ভরতো না। তবে আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা করতাম। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। আমাদের প্রত্যেকের সামনে শিশু রাসূলুল্লাহকে (সা) উপস্থাপন করা হলো। তিনি ইয়াতীম শিশু– একথা শোনার পর কেউ আর তাঁকে নিতে আগ্রহ

---

৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬০

৫. প্রাগুক্ত; আনসাবুল আশরাফ-১/৯০-৯১

৬. রিজালুন মুবাশ্‌শিরূন বিল জান্নাহ্‌-১/৭, ২/১৮৯; নিসা' মিন আসর আন-নুবুওয়াহ পৃ. ১১; সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬১; টীকা নং-৬

দেখালো না। কারণ, আমরা শিশুর পিতা-মাতার নিকট থেকে ভালো কিছু লাভের আশা করতাম। আমরা বলাবলি করতাম : শিশুটি ইয়াতীম। তার মা ও দাদা তেমন কী আর দিতে পারবে? এ কারণে আমরা তাকে অপসন্দ করলাম। এর মধ্যে দলের একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই স্তন্যপায়ী শিশু পেয়ে গেল। যখন আমরা আমাদের গোত্রে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আমি আমার স্বামীকে বললাম : আল্লাহর কসম! অন্যরা স্তন্যপায়ী শিশু নিয়ে ফিরবে আর আমি শূন্য হাতে ফিরবো, এ আমার মোটেই পসন্দ নয়। আমি এই হাশিমী ইয়াতীম শিশুটির নিকট যাব এবং তাকেই নিয়ে ফিরবো। তিনি বললেন : হাঁ, তুমি তাই কর। হতে পারে আল্লাহ তার মধ্যে আমাদের জন্য বরকত ও সমৃদ্ধি রেখেছেন। অতঃপর তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।[৭]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। হালীমা বলেন : আমি উপস্থিত হলে 'আবদুল মুত্তালিব স্বাগতম জানিয়ে প্রশ্ন কলেন : তুমি কে? বললাম : বানূ সা'দের এক মহিলা। বললেন : তোমার নাম কি? বললাম : হালীমা।

'আবদুল মুত্তালিব একটু হেসে বললেন : সাবাশ! সাবাশ! সৌভাগ্য ও বুদ্ধিমত্তা। এমন দু'টি গুণ যার মধ্যে সে যেন সকল যুগের কল্যাণ ও চিরকালের সম্মান। আবদুল মুত্তালিব سَعْدٌ ও হালীমা حُلْمٌ শব্দ দু'টির প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেন। তিনি হালীমাকে নবীর (সা) জননী আমিনার ঘরে নিয়ে যান। তাঁর নিকট থেকেই হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে গ্রহণ করেন।[৮] হালীমার ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন ছিল তা সূচনাতেই বিভিন্নভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হালীমা যখন আবদুল মুত্তালিবের সাথে নবীর (সা) নিকট পৌঁছেন তখন আবদুল মুত্তালিব এক অদৃশ্য কণ্ঠে নিম্নের শ্লোকগুলোর আবৃত্তি শুনতে পান :[৯]

إنّ ابن أمنة الأمين محمدا — خير الأنام وخيرة الأخيار

ماإن له غير الحليمة مرضع — نعم الأمينة، هى على الأبرار

مأمونة من كل عيب فاحش — نقية الأثواب والأوزار

لاتسلمنه إلى سواها إنه — أمرٌ وحُكْمٌ جاء من جبار.

"নিশ্চয় আমিনার ছেলে মুহাম্মাদ পরম বিশ্বস্ত, সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং ভালোদের মধ্যে উত্তম।

হালীমা ছাড়া তাঁকে অন্য কেউ দুধ পান করাবে না। সে পুণ্যবানদের জন্য কত না বিশ্বস্ত!

---

৭. আনসার আল-আশরাফ-১/৯৩-৯৪

৮. প্রাগুক্ত; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্-১/১১২-১১৩; আয-যাহাবী, তারীখ আল-ইসলাম-১/৪৫, ৪৬

৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্ পৃ.-১২

অশ্লীল দোষ-ত্রুটি থেকে সে মুক্ত এবং যাবতীয় পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন।
তুমি তাকে তার নিকট ছাড়া আর কারো নিকট সমর্পণ করবে না। মহাপরাক্রমশালী সত্তার নিকট থেকে এ আদেশ ও সিদ্ধান্ত এসেছে।"

নবীকে (সা) গ্রহণের সাথে সাথে হালীমা ও তাঁর স্বামীর নিকট কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নেমে এলো। হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে (সা) কোলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরার সাথে সাথে তাঁর শুকনো বুক দুধে ভরে গেল। তিনি পেট ভরে পান করলেন। তারপর হালীমা তাঁর নিজের শিশু সন্তান 'আবদুল্লাহকে স্তন দিলেন, সেও পেট ভরে পান করলো। তারপর দু'শিশুই ঘুমিয়ে পড়লো।

হালীমা ও তাঁর স্বামী দু'জনই ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর ছিলেন। যেহেতু তাঁদের মাদী উটটির ওলান ছিল শুকনো। তাঁরা খাবার বা দুধ পাবেন কোথায়? কিন্তু হঠাৎ করে তাদের অবস্থা বদলে গেল। এ সম্পর্কে হালীমা নিজেই বলছেন : 'আমার স্বামী আমাদের উষ্ট্রীটির কাছে গিয়ে দেখলেন তার ওলানটি দুধে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি দুধ দুইলেন এবং আমরা দু'জন পেট ভরে পান করলাম, সে রাতটি আমাদের পরম সুখে কাটলো। সকালে স্বামী আমাকে বললেন : আল্লাহর কসম, হালীমা! জেনে রাখ, তুমি একটি কল্যাণময় শিশু গ্রহণ করেছো।

আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তাই আশা করি। তারপর আমরা আমাদের পল্লীতে ফেরার জন্য বের হলাম। আমি শিশু মুহাম্মাদকে (সা) নিয়ে আমার মাদী গাধাটির উপর উঠে বসলাম। কী আশ্চর্য! সেটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে আমাদের দলের অন্য কারো গাধা তার সাথে পেরে উঠছিল না। এক সময় আমার সঙ্গী-মহিলারা আমাকে বললো : যুওয়ায়িবের মেয়ে! আচ্ছা বলতো, এটা কি তোমার সেই গাধী যার উপর সোয়ার হয়ে তুমি গিয়েছিলে? আমি বললাম : নিশ্চয়, এটা সেই গাধী। তারা বললো : আল্লাহর কসম, তাহলে অন্য কোন ব্যাপার আছে।[১০]

কাফেলা বানূ সা'দের পল্লীতে পৌঁছলো। সে বছর সেখানে অভাব ও দারিদ্র্যের একটা ছাপ সর্বত্র বিরাজমান ছিল। হালীমা এই ইয়াতীম শিশুর বরকত ও কল্যাণ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। সবকিছুতেই তাদের বরকত ও সমৃদ্ধি হতে লাগলো। তাঁর ছাগল-ভেড়া শুকনো চারণভূমিতে অন্যদের ছাগল-ভেড়ার সাথে চরতে যেত। যখন ফিরতো তখন তাঁর গুলোর ওলান দুধে পূর্ণ থাকতো, কিন্তু অন্যদের গুলো যেমন যেত তেমনই ফিরতো। তাই তাঁর গোত্রের লোকেরা তাদের নিজ নিজ রাখালদেরকে বলতো : তোমাদের কী হয়েছে, আবূ যুওয়ায়িবের মেয়ের রাখাল যেখানে তাঁর ছাগল চরায় সেখানে তোমরা চরাতে পার না? কিন্তু তা করেও তারা দেখলো, তাতে কোন লাভ হয় না।

হালীমার এভাবে দুটি বছর কেটে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতি দিনই তিনি কল্যাণ ও

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৪; উসুদুল গাবা-৫/৪২৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২৫৫

সমৃদ্ধি দেখতে পেলেন। এর ভিতর দিয়ে নবীর (সা) দুধ পানের সময় সীমা পূর্ণ হয়ে গেল।

নবী (সা) এমনভাবে বেড়ে উঠলেন যা সচরাচর অন্য শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। হালীমা মনে করলেন, এখন তাঁকে মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি এই শিশুর মধ্যে যে শুভ ও কল্যাণ এ দু'বছর প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে স্বভাবতই তাঁকে আরো কিছু দিন নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা করতেন। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে গেলেন।

মা আমিনা তাঁর প্রিয় সন্তানকে ফিরে পেয়ে দারুণ খুশী হলেন। বিশেষতঃ যখন দেখলেন, তাঁর সন্তান এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যেন সে চার বছরের কোন শিশু। অথচ তার বয়স এখনো দু'বছর অতিক্রম করেনি। হালীমা শিশুকে আরো কিছু দিন পল্লীতে তাঁর নিকট রাখার জন্য মা আমিনার নিকট আবদার জানালেন। মা রাজী হলেন। হালীমা উৎফুল্ল চিত্তে শিশুকে নিয়ে পল্লীতে ফিরে এলেন। শিশুটিও পল্লী প্রকৃতিতে ফিরে আসতে পেরে দারুণ খুশী। এভাবে নবী (সা) বানূ সা'দে দ্বিতীয় বারের জন্য ফিরে এলেন। আর এখানেই তাঁর বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে যখন তাঁর বয়স চার অথবা পাঁচ বছর।

ইমাম মুসলিম তাঁর নিজস্ব সনদে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য শিশুদের সাথে একদিন খেলছেন, এমন সময় জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আসেন। তারপর তাঁকে ধরে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকটি ফেঁড়ে ফেলেন। তারপর তাঁর হৃৎপিণ্ডটি (কাল্‌ব) বের করে তার থেকে একটি রক্তপিণ্ড পৃথক করে বলেন : এ হলো তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। তারপর সেটা একটি সোনার গামলায় যমযমের পানি দিয়ে ধুইয়ে যথাস্থানে স্থাপন করেন। খেলার সঙ্গীরা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে তার ধাত্রী মা হালীমার কাছে যেয়ে বলে : মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। সবাই ছুটে আসে এবং তাঁকে বিবর্ণ অবস্থায় দেখতে পায়।[১১]

এ ঘটনার পর হালীমা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি নবীকে (সা) তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন।

ইবন ইসহাক বলেন, শিশু মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে কোন কোন আলিম আমাকে একথা বলেছেন যে, দুধ ছাড়ার বয়স হওয়ার পর দ্বিতীয় বার যখন হালীমা (রা) মুহাম্মাদকে নিয়ে যান তখন হাবশার কিছু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী লোক তাঁকে দেখে তাঁর পরিচয় জানতে চায় এবং তাঁকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তারা তাঁকে তাদের দেশে, তাদের রাজার নিকট নিয়ে যেতে চায়। তারা বলে, এই শিশু ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে। আমরা তাঁর মধ্যে সেসবের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। হালীমা

---

১১. সহীহ মুসলিম-১/১০১-১০২; ইবন কাীছর, আস-সীরাহ্-১/১৩; আস-সীরাহ্ আল-হাসবিয়্যাহ্-১/১৫০; আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩৫

ভয় পেলেন, তারা হয়তো তাঁকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। তাই তিনি তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন।[১২] ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হন। তারপর মা ইনতিকাল করেন।

একটি বর্ণনা এ রকম এসেছে যে, হালীমা যখন শিশু মুহাম্মাদকে (সা) শেষ বারের মত তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে আসছিলেন তখন মক্কার উঁচু ভূমিতে পৌছার পর তাঁকে হারিয়ে ফেলেন। পরে ওয়ারাকা ইবন নাওফাল ও কুরাইশ গোত্রের অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে পান। তাঁরা দু'জন তাঁকে নিয়ে 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট এসে বলেন : এই আপনার ছেলে। আমরা তাকে মক্কার উঁচু ভূমিতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। আমরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে : আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব। তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।[১৩] তারপর আবদুল মুত্তালিব তাকে কাঁধে তুলে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কা'বা তাওয়াফ করেন। কবিতাটির একটি শ্লোক নিম্নরূপ :[১৪]

أعيذه بالله بارى النسم + من كل من يسعى بساق وقدم.

'যারা পায়ের নলা ও পাতার সাহায্যে চলে, এমন প্রত্যেকের থেকে আমি তার জন্য মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

নবীকে (সা) তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিয়ে হালীমা তাঁর জনপদে ফিরে গেলেন। বহু বছর চলে গেল। এ দিকে নবী (সা) যুবক হলেন, বিয়ে করলেন। কিন্তু মা হালীমার স্মৃতি কোন দিন ভোলেননি। তাঁর স্নেহ-মমতার কথা, লালন-পালনের কথা প্রায়ই তিনি স্ত্রী খাদীজার (রা) কাছে বলতেন। খাদীজার (রা) মনেও হালীমাকে একটু দেখার ইচ্ছা জাগতো। একবার এক অভাবের বছর তিনি আসলেন। রাসূল (সা) তাঁকে সসম্মানে বাড়ীতে রাখলেন ও সমাদর করলেন। হালীমা অনাবৃষ্টির কথা বললেন, জীব-জন্তু মারা যাবার কথা শোনালেন এবং তীব্র অভাবের বর্ণনা দিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে সাহায্যের ব্যাপারে খাদীজার (রা) সাথে কথা বললেন। খাদীজা (রা) অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে চল্লিশটি ছাগল এবং পানি বহন ও এদিক ওদিক যাওয়ার জন্য একটি উট দান করেন। এ যাত্রায় হালীমা তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন নিয়ে ফিরে যান।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদকে (সা) মানবজাতির জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে নির্বাচন করে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিলেন তখন হালীমা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৬] ইবন হাজার "শারহুল হামযিয়্যা" গ্রন্থে বলেন : হালীমার সৌভাগ্য এই

---

১২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭
১৩. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্-১/১৫
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৫
১৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৫; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-১/৩২
১৬. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/৩২

যে, তিনি, তাঁর স্বামী ও সন্তানগণ– 'আবদুল্লাহ, আশ-শায়মা' ও উনাইসা– সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। "আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা"-র লেখক বলেন : তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বেশীর ভাগ আলিমের কোন সন্দেহ নেই। ইবন হিব্বান একটি সহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়। হাফিজ মুগলাতায়-এর হালীমার ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ আছে যার শিরোনাম হলো : "আত-তুহফাতুল জাসীমাহ্ ফী ইসলামি হালীমা।[১৭]

নবী (সা) ছিলেন কোমল মনের দয়াপ্রবণ মানুষ। নিজের আশে পাশের লোকদেরকে শুধু নয়, বরং নিকট ও দূরের সবাইকে ভালোবাসতেন এবং হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। আর এর থেকে তাঁর দুধ মা হালীমা বাদ পড়তে পারেন না। নবী (সা) সারা জীবন হালীমার স্নেহ-মমতার কথা মনে রেখেছেন। নবীর (সা) অন্তরের গভীরে ছিল মা হালীমার স্থান। তাই চল্লিশ বছরের বেশী বয়সেও তাঁকে "মা মা" বলে ডাকতে শোনা যায়, নিজের গায়ের চাদরটি খুলে বিছিয়ে তাঁর বসার স্থান করে দিতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর ভালো-মন্দ ও অভাব-অভিযোগের কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে দেখা যায়। আরো দেখা যায় মায়ের একান্ত অনুগত সন্তানের মত হৃষ্টচিত্তে হাসি মুখে তাঁর সাথে কথা বলতে।[১৮]

কাজী 'আয়্যাজ "আশ-শিফা" গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হালীমা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের স্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আবুত তুফায়ল বলেছেন : আমি আমার কিশোর বয়সে নবীকে (সা) "জি'রানা[১৯] নামক স্থানে একদিন গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। সে সময় এক বেদুইন মহিলা আসলেন এবং নবীর (সা) একেবারে কাছে চলে গেলেন। নবী (সা) নিজের চাদরটি বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। মহিলাটি বসলেন। আমি লোকদের কাছে প্রশ্ন করলাম : এই মহিলা কে? লোকেরা বললো : ইনি রাসূলুল্লাহর মা, তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন।[২০]

'উমার ইবন আস-সায়িব বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বসে আছেন। এমন সময় তাঁর দুধ-পিতা আসলেন। তিনি নিজের এক খণ্ড কাপড়ের এক পাশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। একটু পরে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ আসলেন। রাসূল (সা) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সামনে বসালেন।[২১]

বালাযুরী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ বোন আশ-শায়মা' তাঁর মা হালীমার সাথে তাঁকে কোলে নিতেন এবং তাঁর সাথে খেলতেন। এই আশ-শায়মা' হুনায়ন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করা হয়, তখন তিনি বলেন

---

১৭. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৫
১৮. আল-ইসাবা-৪/২৭৪
১৯. "জি'রানা" তায়িফ ও মক্কার পথে, তবে মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। (তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-৩/৫৯)
২০. আ'লাম আন-নিসা'-১/২৯০
২১. তাবাকাত-১/১১৪; আল-ইসতী'আব-৪/২৬২; আশ-শিফা-১/২৬০; উসুদুল গাবা-৫/৪২৮

: ওহে জনগণ! আপনারা জেনে রাখুন, আমি আপনাদের নবীর বোন। তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনা হলে তিনি বললেন : আমি আপনার বোন। আমি আপনাকে আমার মায়ের সাথে কোলে নিতাম, আপনি আমাকে কামড়ে দিতেন। রাসূল (সা) তাঁকে চিনতে পারেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দেন। তাঁকে একটি দাস ও একটি দাসীসহ অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে মুক্তি দেন।[২২]

হযরত হালীমার (রা) মৃত্যু সম্পর্কে শায়খ আহমাদ যীনী দাহলান বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, হিজরাত করেন, মদীনায় মারা যান এবং বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়। তাঁর কবরটি সেখানে প্রসিদ্ধ।[২৩] তবে বালাযুরীর একটি বর্ণনায় বুঝা যায় তিনি মদীনায় হিজরাত করেননি এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বর্ণনাটি এ রকম : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন "আবতাহ" উপত্যকায় অবস্থান করছেন তখন তাঁর নিকট হালীমার বোন তাঁর স্বামীর বোনকে সংগে নিয়ে আসেন। তিনি রাসূলকে (সা) এক পাত্র পনীর ও একপাত্র ঘি উপহার দেন। রাসূল (সা) তাঁর নিকট হালীমার অবস্থা জানতে চান। তিনি তাঁর মৃত্যুর খবর দেন। তখন রাসূলের (সা) দু' চোখ পানিতে ভিজে যায়। তারপর রাসূল (সা) তাঁদের অবস্থা জানতে চান। তাঁরা অভাব ও দারিদ্র্যের কথা জানান। রাসূল (সা) তাঁকে পরিধেয় বস্ত্র, একটি ভারবাহী পশু ও দু'শো দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। যাবার বেলায় তিনি নবীকে (সা) লক্ষ্য করে বলে যান : আপনি ছোট ও বড় উভয় অবস্থায় চমৎকার দায়িত্বশীল।[২৪]

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা) বর্ণনা করেছেন।[২৫]

---

২২. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৩

২৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ.-১৭

২৪. আনসাবুল আশরাফ, পৃ. ৯১; দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩৩

২৫. আল-ইসতী'আব-৪/২৬২

আশ-শায়মা’ বিন্‌ত আল-হারিছ আস-সা‘দিয়্যা (রা)

আশ-শায়মা’র আসল নাম হুযাফা, মতান্তরে জায্‌যামা। ডাকনাম আশ-শায়মা’ ও আশ-শাম্মা’। বানূ সা‘দের এক বেদুঈন মহিলা। তিনি তাঁর গোত্রে কেবল ডাকনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১] সম্ভবত তাঁর দেহে অতিরিক্ত তিল থাকার কারণে তিনি এ নামে আখ্যায়িত হন।[২] উল্লেখ্য যে, মহিলা সাহাবীদের মধ্যে আশ-শায়মা’ নামে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর পিতা আল-হারিছ ইবন ‘আবদিল ‘উয্‌যা ইবন রিফা‘আ আস-সা‘দিয়্যা এবং মাতা মহানবীর (সা) দুধমাতা হযরত হালীমা আস-সা‘দিয়্যা (রা)। আশ-শায়মা’র বড় পরিচয় তিনি মহানবীর (সা) দুধ বোন।[৩] উল্লেখ্য যে, হযরত হালীমার (রা) সন্তান ‘আবদুল্লাহ, উনায়সা ও আশ-শায়মা’– এ তিনজন হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ-ভাই-বোন। আশ-শায়মা’ তাঁর মা হালীমাকে শিশু মুহাম্মাদের (সা) প্রতিপালনে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

হযরত হালীমা (রা) শিশু মুহাম্মাদকে (সা) দুই বছর দুধ পান ও লালন-পালনের পর মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। কয়েক দিন মক্কায় থাকার পর উভয় পক্ষের আগ্রহ ও সম্মতিতে হযরত হালীমা (রা) তাঁর দুধ-সন্তান মুহাম্মাদকে (সা) নিয়ে আবার তাঁর গোত্রে ফিরে যান। তখন তিনি হাঁটতে শিখেছেন, দুধ-ভাই-বোনদের সাথে খেলা করতে শিখেছেন। অন্যসব বেদুঈন ছেলে-মেয়েদের মত হালীমার ছেলে-মেয়েরাও তাদের জনপদের আশে-পাশের চারণভূমিতে ছাগল-ভেড়া চরাতো। তারা তাদের দুধ-ভাই শিশু মুহাম্মাদকেও (সা) মাঝে মধ্যে সঙ্গে নিয়ে যেত। এ সময় আশ-শায়মা’ তাঁকে দেখাশুনা করতেন। পথ দীর্ঘ হলে, রোদের তাপ বেশী হলে তাঁকে কোলে তুলে নিতেন। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে চলতেন। একটু চলার পর আবার ছোট্ট ভাইটিকে বুকে তুলে নিতেন। আবার কখনো তাঁকে নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং দু’হাতে তুলে নাচাতে নাচাতে সুর করে নীচের চরণ দু’টি গাইতেন :[৪]

يا ربنا أبق لنا محمدًا + حتى أراه يافعًا وأمردا

ثم أراه سيّدًا مسوّدا + وأكتب أعاديه معًا والحُسَّدا

وأعطِه عزًّا يدوم أبدًا

---

১. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩২

২. নিসা’ মিন ‘আসর আন্-নুবুওয়াহ্-৩৩৭, টীকা-২

৩. আল-ইসাবা-৪/৩৩৫

৪. প্রাগুক্ত, ৪/৩৩৬; আহমাদ যীনী দাহলান, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-৪/৩৬৬

'হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আপনি আমাদের জন্য মুহাম্মাদকে

বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমরা তাঁকে একজন যুবক হিসেবে দেখতে পাই।

অতঃপর আমরা তাঁকে এমন একজন সম্মানিত নেতা হিসেবে দেখতে পাই যে, তাঁর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী শত্রুর মাথা নত হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে চিরস্থায়ী সম্মান ও মর্যাদা দান করুন।'

কোন কোন বর্ণনায় প্রথম শ্লোকটি এভাবে এসেছে :[৫]

يا ربنا أبق أخي محمدًا.

'হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমার ভাই মুহাম্মাদকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

কী চমৎকার দু'আই না ছিল যার প্রতিটি কথা। আল্লাহ পাকের দরবারে সেসব দু'আ কবুল হয়েছিল।

শিশু মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে যে শুভ ও কল্যাণ বিদ্যমান ছিল আশ-শায়মা' ও তাঁর পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্য তা প্রত্যক্ষ করতেন। তাই তাঁর প্রতি সবার তীব্র আবেগ ও ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। মা হালীমা সবসময় তাঁকে নজরে নজরে রাখতেন। দূরে কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। আশ-শায়মা' কখনো তাঁকে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে চাইলে মা তাকে বার বার সতর্ক করে দিতেন মুহাম্মাদ (সা) যেন দৃষ্টির আড়ালে না যায়। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতেন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে গিয়ে দেখে আসতেন মুহাম্মাদ (সা) কোথায় এবং কি করছে।

একদিন দুপুরের প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত হয়ে মা হালীমা বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটু পরেই তিনি টের পেলেন আশ-শায়মা' ও মুহাম্মাদ কেউ আশে-পাশে নেই। এই প্রচণ্ড রোদে তারা কোথায় গেল? তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। খুঁজতে বের হলেন। দেখলেন বাড়ীর অদূরে আশ-শায়মা' মুহাম্মাদকে কোলে করে নাচাচ্ছে, আর এ গানটি গাইছে :

هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى

فأنمه اللهم فيما تنمى

'এ আমার ভাই, আমার মা তাকে প্রসব করেনি। সে আমার বাবা-চাচার বংশেরও কেউ নয়। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে সমৃদ্ধি দাও।'

মা হালীমা তিরস্কারের সুরে বললেন : আশ-শায়মা', তুমি তাঁকে নিয়ে এই রোদের মধ্যে খেলছো? আশ-শায়মা' বললেন : মা, আমার ভাইয়ের গায়ে রোদ লাগেনি। আমি দেখছি, মেঘ তার মাথার উপর ছায়া দান করছে। সে দাঁড়ালে মেঘ দাঁড়াচ্ছে, সে চললে

৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৩৮

মেঘও চলছে। এভাবে আমরা এখানে এসেছি। অবাক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

একথা কি ঠিক? আশ-শায়মা' বললেন ঃ আল্লাহর কসম! সত্যি। আল্লাহর কসম! সত্যি।[৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমার সাথে বনী সা'দের পল্লীতে অতিবাহিত করেন। মরুভূমিতে নির্মল আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের নির্ভেজাল বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও আয়ত্ত করেন। একথা তিনি পরবর্তী জীবনে অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন :

أنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر.

'আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী, কারণ, আমি কুরাইশ বংশের সন্তান এবং বানূ সা'দে দুধ পান করে বেড়ে উঠেছি।' তিনি প্রথম জীবনের এই পাঁচটি বছরের স্মৃতি জীবনে কোনদিন ভুলেননি। মা হালীমা, বোন আশ-শায়মা' এবং তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের আদর-যত্ন, ও স্নেহ-ভালোবাসার কথা সারা জীবন মনে রেখেছেন।

সময় গড়িয়ে চললো, সে দিনের সেই ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ বড় হলেন। এক সময় নবুওয়াত লাভ করলেন। মদীনায় হিজরাত করলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। হাওয়াযিন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলে বানূ সা'দের আরো অনেক নারী-পুরুষ সদস্যের সাথে আশ-শায়মা'ও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। বন্দী হওয়ার সময় তিনি মুসলিম মুজাহিদদেরকে বলেন : 'আল্লাহর কসম! তোমরা জানতে পারবে যে, আমি তোমাদের নেতার দুধ-বোন।' কিন্তু তারা তাঁর কথা বিশ্বাস না করে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করে। আশ-শায়মা' বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দুধ-বোন। রাসূল (সা) বললেন : তোমার দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ বা চিহ্ন উপস্থাপন করতে পারবে? বললেন : আমি একদিন আপনাকে পিঠে উঠিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কামড় দিয়েছিলেন, এই তার দাগ।[৭] রাসূল (সা) চিহ্নটি চিনতে পারলেন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার উপর তাঁকে বসালেন ও তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে আদর-যত্ন ও সম্মানের সাথে আমার নিকট থেকে যেতে পার। আবার ইচ্ছা করলে তোমার গোত্রে ফিরে যেতে পার।

আশ-শায়মা' বললেন : আমি আমার গোত্রে ফিরে যেতে চাই। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেন। রাসূল (সা) মাকহূল[৮] নামের একটি দাস, একটি দাসী, বহু ছাগল-ভেড়া ও উট উপঢৌকনসহ

---

৬. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-১/১৬৭, ১৬৮

৭. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/২৬৫

৮. মাকহূল রাসূলুল্লাহর (সা) দাস। ইবন ইসহাক বলেন, নবীর (সা) দুধ-বোন আশ-শায়মা' মাকহূলকে

তাঁকে তাঁর গোত্রে পাঠিয়ে দেন।[৯] ইবনুল কালবী বলেন, আশ-শায়মা' একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন এবং পরিচিতি হিসেবে তাঁর দেহে শিশুকালে রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁতের চিহ্ন দেখান।[১০]

মানবতার মহান নবী দুধ-বোন আশ-শায়মা'র প্রতিই কেবল মহানুভবতা দেখাননি, বরং তাঁর ক্ষমা ও মহানুভবতা গোটা বানূ সা'দকে পরিবেষ্টন করে। উল্লেখ্য বানূ সা'দ ছিল বিশাল হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা গোত্র। হিজরী ৮ম সনে হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র পরাজিত হলে তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে এবং তাদের নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়। তখন হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসে এবং তাদের আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। এই দলে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ-চাচাও ছিলেন। তারা ক্ষমা ভিক্ষা চায়, বন্দীদের মুক্তি দাবী করে এবং তাদের জব্দকৃত ধন-সম্পদ ফেরত চায়। এই দলটির মুখপাত্র যুহায়র ইবন সুরাদ উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر من كان يكفلُك من عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا، وأرضعناك بثديِّنا... لقد رأيتك مُرضَعًا، فما رأيت مُرضَعًا خيرا منك، ورأيتك فطيمًا، فما رأيت فطيمًا خيرا منك ثم رأيت شابا فيما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك فامنن علينا من الله عليك.

'হে আল্লাহর রাসূল! এই বন্দীদের মধ্যে আপনাকে লালন-পালনকারী আপনার চাচী, ফুফু, খালা ও কোলে-পিঠে বহনকারী রক্ষণাবেক্ষণকারীও রয়েছে। আমরা আপনাকে কোলে-পিঠে করে লালন-পালন করেছি, আমাদের স্তনের দুধ পান করিয়েছি।... আমি আপনাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখেছি। আপনার চেয়ে ভালো কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু আমি আর দেখিনি। আমি আপনাকে দুধ পান বন্ধ করা শিশু দেখেছি। আপনার চেয়ে দুধ পান বন্ধ করা ভালো আর কাউকে দেখিনি। তারপর দেখেছি যুবক হিসেবে। আপনার চেয়ে ভালো যুবক আর দেখিনি। আপনার মধ্যে শুভ ও কল্যাণ স্বভাব পূর্ণতা লাভ করেছে। সবকিছু সত্ত্বেও আমরা হলাম আপনার মূল, শেকড় ও গোত্র। অতএব আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' তারপর তিনি নিম্নের এই চরণগুলো আবৃত্তি করেন :

এই দাসীর সাথে বিয়ে দেন। তাদের বংশধারা বিদ্যমান আছে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৬৩, আল-ইসাবা-৩/৪৩৫; আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩

৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-৩/৩৬৩; তারীখ আত-তাবারী-২/১৭১; আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩; আ'লাম আন-নিসা'-২/৩১৭ আল-আ'লাম-৩/১৮৪

১০. আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩

منن علينا رسول الله فى كرم + فإنك الـمرءُ نرجوه وننتظر

منن على نسوة قد كنت يرضعها + إذفوك يملؤه من محضها درر

فألبسِ العفو من قد كنت ترضعه + من أمهاتك إنَّ العفو مشتهر

إنَّا نؤمل عفوا منك تلبسه + هذى البرية إذ تعفو وتنتصرُ.

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর নিকট আমরা আশা করি ও যার অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করি।

আপনি সেই মহিলাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যাদের দুধ পান করেছেন। যখন তাদের বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ দুধে আপনার মুখ পূর্ণ হয়ে গেছে।

আপনার সেই মায়েদেরকে ক্ষমা করুন যাদের দুধ পান করেছেন। নিশ্চয় ক্ষমার গুণটা খুবই প্রসিদ্ধ।

আমরা আপনার ক্ষমার আশা করি। যখন আপনি বিজয়ী হন এবং ক্ষমা করেন তখন এই সৃষ্টিজগত তা পরিধান করে।'

হযরত রাসূলে করীম (সা) তার এই মনোমুগ্ধকর বর্ণনা ও সুমিষ্ট কবিতা শুনার পর বলেন : আমার ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের যা কিছু আছে তা সবই তোমাদের জন্য।

কুরাইশরা বলে উঠলো : আমাদের যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

আনসাররা বললো : আমাদের যা কিছু তা সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

ইবন কাছীর বলেন, এরপর রাসূল (সা) দুধ-পিতার গোত্রের সকলকে সম্মানের সাথে মুক্তি দেন।[১১]

হযরত আশ-শায়মা'র (রা) জীবনের আর কোন কথা জানা যায় না। তিনি কখন, কোথায় ইন্তেকাল করেছেন তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেছে। আয-যিরিক্‌লী হি. ৮/খ্রী. ৬৩০ সনের পর তার মৃত্যু হয়েছে এমন কথা বলেছেন।[১২]

---

১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৬৩, ৩৬৪; তারীখ আত-তাবারী-২/১৭৩; 'উয়ূন আল-আছার-২/২২৩; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৭০

১২. আল-আ'লাম-৩/১৮৪

আসমা' বিন্‌ত আবী বকর (রা)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওফাতের পর তাঁর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আসমার (রা) পিতা। মাতা কুতাইলা বিনত 'আবদিল 'উয্‌যা। এই 'আবদুল 'উয্‌যা ছিলেন কুরায়শ বংশের একজন বিখ্যাত সম্মানীয় নেতা। আবূ বকরের (রা) সম্মানিত পিতা আবূ কুহাফা বা আবূ 'আতীক তাঁর পিতামহ। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর তাঁর সহোদর ভাই ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সৎ বোন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী তথা বিশেষ সাহায্যকারী যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) স্বামী এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে শহীদ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর পুত্র। হিজরাতের ২৭ (সাতাশ) বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) বয়স বিশ বছরের কিছু বেশী।[১] এ হলো হযরত আসমা' বিন্‌ত আবী বকরের (রা) সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর আরো কিছু পরিচয় আছে। স্বামী যুবায়র ইবন 'আওয়াম (রা) দুনিয়াতে জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম, আর তাঁর শাশুড়ী হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারামা ফুফু হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব (রা)। উল্লেখ্য যে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং 'আয়িশার (রা) চেয়ে দশ বছরের কিছু বেশী দিনের বড়।[২] বংশ ও ইসলাম উভয় দিক দিয়ে এ মহিলা সাহাবী উঁচু সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। বংশগত দিক দিয়ে মক্কার কুরায়শ খান্দানের তাইম শাখার সন্তান। অন্যদিকে তাঁর পিতা, পিতামহ, ভগ্নি, স্বামী, শাশুড়ী, পুত্র সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্ট সাহাবী। একজন মুসলমানের এর চাইতে বেশী সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় কী হতে পারে?

হযরত আসমার (রা) লকব বা উপাধি ছিল 'যাতুন নিতাকাইন'। এ উপাধি লাভের একটি ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাস এই রকম :

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করার পর তথাকার পৌত্তলিক প্রতিপক্ষ তাঁর উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। দিনে দিনে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা রাসূলকে (সা) হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তিনি মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় পর্যন্ত মক্কায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবূ বকর (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অতি বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। একদিন রাতের বেলা সকলের অগোচরে চুপে চুপে আবূ বকরকে (রা) সঙ্গে করে রাসূল (সা) মক্কা থেকে বের হন এবং মক্কার উপকণ্ঠে 'ছুর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নেন। এজন্য আবূ বকরকে (রা) 'রফীকুল গার' বা গুহার বন্ধু বলা হয়।

---

১. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৮/৪৪৯; উসুদুল গাবা-৫/৩৭২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৭

২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৮

মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁদের খোঁজে পর্বতের এ গুহার মুখ পর্যন্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (সা) বিশেষ ব্যবস্থায় রক্ষা করেন। এ সময় গোপনে যাঁরা তাঁদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা ও সাহায্য করতেন হযরত আসমা (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে একাকী বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে গুহায় যেতেন এবং তাঁদেরকে আহার করিয়ে আবার ফিরে আসতেন।

হযরত আসমার (রা) ভাই 'আবদুল্লাহ (রা) যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, সারাদিন মক্কার এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে পৌত্তলিকদের পরামর্শ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন এবং রাতের আঁধারে তা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানিয়ে আসতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) বিশ্বস্ত রাখালের নাম ছিল 'আমির। তিনি "ছুর" পর্বতের আশেপাশে ছাগল চরাতেন এবং পাল নিয়ে গুহার মুখে চলে যেতেন এবং দুধ দুইয়ে তাঁদেরকে দিয়ে আসতেন। আর এই ছাগলের পাল নিয়ে যাওয়াতে আসমা (রা) ও আবদুল্লাহর (রা) যাওয়া-আসার পদচিহ্ন মুছে যেত। ফলে পৌত্তলিকরা কোনভাবেই সন্ধান পায়নি।

মক্কার পৌত্তলিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন তাঁদের কোন খোঁজ পেল না তখন ঘোষণা করে দিল যে, কেউ তাঁদের সন্ধান দিতে পারলে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় রাতে হযরত আসমা' তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে গেলে রাসূল (সা) বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে 'আলীকে (রা) বলবে, সে যেন আগামী কাল রাতে তিনটি উট এবং একজন পথ প্রদর্শক নিয়ে এই গুহায় আসে। নির্দেশমত 'আলী (রা) তিনটি উট ও একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে হাজির হন। আর হযরত আসমা' (রা) তাঁদের দুই-তিন দিনের পাথেয় সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূল (সা) দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলেন। পাথেয় সামগ্রীর পুটলার ও পানির মশকের মুখ বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে হাতের কাছে কোন রশি পাওয়া গেল না। তখন আসমা' (রা) নিজের 'নিতাক' বা কোমর বন্ধনী খুলে দুই টুকরো করেন। একটি দিয়ে পাথেয় সামগ্রী ও অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বাঁধেন। তা দেখে রাসূলের (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত হয় :

قد أبدلكِ الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة.

'আল্লাহ যেন এই একটি 'নিতাকের' বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে দুইটি 'নিতাক' দান করেন।'

এভাবে তিনি 'জাতুন নিতাকাইন' (দুইটি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী) উপাধি লাভ করেন।[৩] রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত এ উপাধিটি আল্লাহ কবুল করেন। আর তাই আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও তিনি বিশ্ববাসীর নিকট এ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

---

৩. তাবাকাত-৮/৪৫০; আল-ইসতী'আব-৪/২২৯; উসুদুল গাবা-৫/৩৭২ (৬৬৯৮); আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৪৭২; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭

আসমার 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভের কারণ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মত আছে। কেউ বলেছেন, তিনি একটি কোমর বন্ধনীর উপর আরেকটি কোমরবন্ধনী বাঁধতেন, তাই এ উপাধি লাভ করেছেন। কেউ বলেছেন, তাঁর দুইটি নিতাক বা কোমরবন্ধনী ছিল। একটি কোমরে বাঁধতেন, আর অন্যটি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রী বেঁধে গুহায় নিয়ে যেতেন। তাই তিনি এই উপাধি পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কোমরবন্ধনী বাঁধা আরব নারীদের সাধারণ অভ্যাস।[৪]

ইবন হাজার (র) বলেন, তিনি তাঁর নিতাকটি ছিঁড়ে দু' টুকরো করেন। একটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকরের (রা) পাথেয় বাঁধেন, আর অন্যটি দ্বারা নিজের কোমর বন্ধনীর কাজ চালান। আর সেখান থেকেই তাকে বলা হতে থাকে 'যাতুন নিতাক' বা 'যাতুন নিতাকাইন' অর্থাৎ একটি কোমর বন্ধনী বা দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী।[৫]

'নিতাক'-এর এই ঘটনাটি 'ছূর' পর্বতের গুহায় ঘটেছিল, না রাসূল (সা) ও আবূ বকরের (রা) মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় আবূ বকরের (রা) বাড়ীতে, সে সম্পর্কে বর্ণনার ভিন্নতা দেখা যায়। ইমাম বুখারী ও ইবন ইসহাকের সীরাতের একটি বর্ণনায় বুঝা যায়, এটি মক্কায় আবূ বকরের (রা) গৃহ থেকে রাতের অন্ধকারে বের হওয়ার সময়ের ঘটনা।

যেমন একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার মুসলমানদের আল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিলে মক্কার অত্যাচারিত, নির্যাতিত মুসলমানগণ দলে দলে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে থাকে। পৌত্তলিকরা তাতে বাধা দিতে আরম্ভ করলে মুসলমানরা গোপনে একাকী বা ছোট ছোট দলে মক্কা ত্যাগ করতে থাকে। সকলে হিজরাতের অতি বড় ফযীলতের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই সেই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য যেন পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) একদিন প্রিয় নবীর (সা) নিকট গিয়ে হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) বললেন : 'لاتعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا. - এত তাড়াহুড়ো করবেন না, আল্লাহ আপনাকে একজন সঙ্গী দিবেন।' আবূ বকর (রা) বুঝলেন, তাঁর সফরের সেই সঙ্গী হবেন খোদ নবী (সা)। আনন্দে আবূ বকরের (রা) হৃদয় মন ভরে গেল। রাসূলুল্লাহর (সা) দারুল হিজরাহ মদীনায় যাবার সফরসঙ্গী হবেন তিনি, এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কী হতে পারে?

রাসূলুল্লাহর (সা) এই ইঙ্গিতময় বাণী শোনার পর আবূ বকর (রা) সে কথা তাঁর দুই কন্যা– আসমা' ও আয়িশাকে (রা) বলেন। তাঁরাও খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন একথা জেনে যে, তাঁদের পিতা হবেন আল্লাহর রাসূলের (সা) হিজরাতের সফরসঙ্গী। এরপর থেকে তাঁরা সেই শুভ ক্ষণটির প্রতীক্ষায় কাটাতে থাকেন।

এরপর একদিন আল্লাহ তাঁর নবীকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দেন। নবী (সা) ঠিক দুপুরের সময় কুরায়শ পৌত্তলিকদের সকল প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আবূ বকরের (রা)

---

৪. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৩৮, টীকা-১

৫. বানাত আস-সাহাবা -৫০

বাড়ীর পথ ধরেন। নবী (সা) তাঁর স্বাভাবিক গতিতে আবূ বকরের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আসমা' (রা) বাড়ীর ভিতর থেকে সর্বপ্রথম তা দেখতে পান এবং দৌড়ে পিতার নিকট যেয়ে বলেন : আব্বু! এই যে রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা-মুখ ঢেকে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছেন। এমন সময় তো তিনি কখনও আসেন না। আবূ বকর (রা) বললেন : আমার মা-বাবা তাঁর জন্য কুরবান হোন! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়া এ সময় তিনি আসেননি।

আবূ বকর (রা) নবীকে (সা) স্বাগত জানানোর জন্য ছুটে গেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আবূ বকর (রা) অনুমতি দিলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আবূ বকরকে (রা) বললেন : আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে একটু বের করে দিন। সেখানে আসমা' ও আয়িশা ছিলেন। আবূ বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা আমার দুই কন্যা।

নবী (সা) বললেন : আমাকে বের হওয়ার (হিজরাত করার) অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খুশীর আতিশয্যে আবূ বকর (রা) কেঁদে দেন। বলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য কি হবে? বললেন : হাঁ। 'আয়িশা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! কেউ যে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে পারে আমি সেই দিনের পূর্বে কখনো ভাবতে পারিনি। সেদিন আমি আবূ বকরকে কাঁদতে দেখেছি।[৬]

'আয়িশা (রা) 'যাতুন নিতাক' ঘটনা সম্পর্কে আরো বলেছেন : আমরা দুই বোন তাঁদের দু'জনের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস একটি চামড়ার থলিতে ভরলাম। তারপর আসমা' তাঁর নিতাকটি কেটে থলির মুখ বাঁধেন। আর সেখান থেকে তিনি লাভ করেন 'যাতুন নিতাক' উপাধি।[৭]

উপরের এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আসমার (রা) 'নিতাক' ছিড়ে দু'ভাগ করা এবং 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভ করার ঘটনাটি হযরত আবূ বকরের (রা) গৃহে ঘটে যখন রাসূল (সা) ও আবূ বকর (রা) 'ছূর' পর্বতের দিকে যাত্রা করেন।

আসমার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) পরবর্তীকালে উমাইয়্যা খলীফাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন শামের অধিবাসীরা তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন'-এর ছেলে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। একথা আসমার (রা) কানে গেলে তিনি ছেলেকে বলেন : তারা তোমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? বললেন : হাঁ। আসমা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! তারা যা বলে, সত্য। এরপর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন আসমার (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে বলেন : তোমরা কিভাবে আবদুল্লাহকে 'যাতুন নিতাকাইন' বলে অপমান করার চেষ্টা কর? হাঁ, আমার একটি মাত্র নিতাক ছিল। আর তা মেয়েদের অবশ্যই থাকতে হয়। আর অন্য একটি নিতাক দিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খাদ্য সামগ্রী বেঁধেছিলাম।[৮]

---

৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৮; সাহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং-৩৯০৫; তাবাকাত-৮/২৫
৭. সাহীহ আল-বুখারী-হাদীছ নং-৩৯০৫
৮. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭

বিয়ে ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত আসমা’ (রা) হযরত আবূ বকরের (রা) জ্যেষ্ঠ সন্তান। মক্কায় ইসলামী দা‘ওয়াতের সূচনা পর্বে পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট ইসলামের দা‘ওয়াত পেশ করে থাকবেন, আর তাঁরাও দা‘ওয়াত কবুল করেছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, আসমা’ (রা) সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী। আর যেহেতু তিনি হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর বয়স তখন দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি হবে। তিনি তখন একজন কিশোরী মাত্র। ইমাম নাওবী (র) বলেন :[৯]

أسلمت أسماء قديمًا بعد سبعة عشر إنسانًا.

‘আসমা’ (রা) বহু আগে সতেরোজন মানুষের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।’ ইবন ‘আবদিল বার (র) বলেন :[১০]

‘كان اسلامها قديما بمكة.’ - তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মক্কায় বহু আগে।’ ইবন ‘আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, আসমা (রা) ‘আয়িশার (রা) চেয়ে দশ বছরের বড়। তারপর তিনি মুহাজিরদের ইসলাম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :[১১]

ثم أسلم ناس من قبائل العرب منهم : أسماء بنت أبى بكر وهى صغيرة.

‘তারপর আরব গোত্রগুলোর কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্যতম হলেন আসমা’ বিনত আবী বকর (রা)। তিনি তখন অল্প বয়স্কা তবে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী মহিলাদের ক্রমধারা এ রকম : খাদীজা, উম্মু আয়মান আল-হাবশিয়্যাহ, হযরত ‘আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদ্বল ও হযরত ‘উমারের (রা) বোন ফাতিমা বিনৃত খাত্তাব (রা)।[১২]

মক্কায় যখন ইসলামের দা‘ওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, পৌত্তলিক কুরায়শদের যুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে চলছে, আর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে নির্যাতিত মুসলমানগণ মক্কা থেকে একে একে হিজরাত করছে, এমনই এক সময়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ফুফাতো ভাই যুবায়র ইবনুল ‘আওয়াম (রা) আসমাকে (রা) বিয়ের পয়গাম পাঠান।

ইসলামের প্রথম পর্বে হযরত আবূ বকরের (রা) দা‘ওয়াতে যে সকল যুবক সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন যুবায়র তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম পর্বের অন্য মুসলমানদের ন্যায় ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং প্রতিপক্ষ পৌত্তলিকদের

---

৯. তাহযীবুল আসমা’ ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭; বানাত আস-সাহাবা-৪০
১০. আল-ইসতী‘আব-১২/১৯৬
১১. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক, (তারাজিম আন-নিসা’) ১০
১২. বানাত আস-সাহাবা-৪১

নানা রকম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। ইসলামকে বিশ্বে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে সকল নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেন। আর তাই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত সাহায্যকারী ও অশ্বারোহী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

যুবায়র (রা) একজন সাহসী যুবক। তিনি দুনিয়ার উপর দীনকে অগ্রাধিকার দেন। পরকালীন জীবনকে পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দেন। তবে তিনি যখন আবূ বকরের (রা) মত একটি ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান তখন সম্পদের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আবূ বকরের (রা) পরিবার এই প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান এবং আসমা'-যুবায়রের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।

আসমার চাতুরী ও কৌশল

হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নগদে তাঁর হাতে প্রায় এক লাখ দিরহাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নিজের সব ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। এ কারণে হিজরাতের সময় তাঁর হাতে দেড় মতান্তরে পাঁচ অথবা ছয় হাজারের মত যে অর্থ ছিল তার সবগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর যিম্মাদারিতে ছেড়ে যান। 'ছূর' পর্বত থেকে রাসূল (সা) ও আবূ বকরকে (রা) বিদায় দিয়ে আসমা' (রা) ঘরে ফিরে আসেন। আবূ বকরের (রা) পিতা আবূ কুহাফা, আসমা'র (রা) দাদা– যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, বয়সের ভারে বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সকালে লোকমুখে ছেলের নিরুদ্দেশের কথা শুনে ছেলের বাড়ীতে আসেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেন, আফসোস! আবূ বকর নিজেও চলে গেল এবং সব অর্থ-সম্পদ সংগে নিয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে বিপদে ফেলে গেল। হযরত আসমা (রা) সংগে সংগে বলে উঠলেন, না দাদা, তিনি আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন।

একথা বলে আসমা (রা) বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দানের জন্য একটি থলিতে পাথর ভরে মুখ বেঁধে সেখানে রাখেন যেখানে আবূ বকর (রা) তাঁর সঞ্চিত অর্থ রাখতেন। তারপর সেটি একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর তিনি দাদাকে বলেন, আমাদের আব্বা আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন। তিনি দাদার হাত ধরে সেই অর্থভাণ্ডারের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁর একটি হাত ধরে সেই পাথর ভর্তি থলের উপর আস্তে করে ঘোরাতে থাকেন। বৃদ্ধ ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ জমা আছে মনে করে আশ্বস্ত হলেন। হযরত আসমা (রা) বলেছেন, আমি কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এমনটি করেছিলাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের জন্য কোন কিছুই রেখে যাননি।[১৩]

---

১৩. আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ)-২০/২৮২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৮; নিহায়াতুল আবির-১৬/৩৩২

ফির'আউনুল উম্মাহ্ আবূ জাহলের হাতের থাপ্পড়

সকাল বেলা যখন মক্কার অলি-গলিতে একথা ছড়িয়ে পড়লো যে, মুহাম্মাদ (সা) ও আবূ বকর (রা) রাতের অন্ধকারে মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন তখন পৌত্তলিকদের যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই উম্মাতের ফির'আউনতুল্য আবূ জাহল ও মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ মক্কার উঁচু ও নীচু ভূমিতে অবস্থিত বানূ হাশিম ও তার শাখা গোত্রগুলোর বাড়ীঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। অভিশপ্ত দুর্বৃত্ত আবূ জাহলের নেতৃত্বে কুরায়শদের একদল মানুষ আবূ বকরের (রা) বাড়ী ঘেরাও করে। দলটির নেতা আবূ জাহল এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দেয়। বাড়ীতে তখন আসমা', তাঁর বোন 'আয়িশা ও 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমান (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। আসমা' (রা) বলেন : আমি দরজা খুলে তাদের সামনে গেলাম। তারা বললো : আবূ বকরের মেয়ে, তোমার আব্বা কোথায়?

বললাম : আল্লাহর কসম! আমার আব্বা কোথায় তা আমি জানিনে। সাথে সাথে আবূ জাহল তার একটি হাত উঁচু করে। সে ছিল একজন নীচ প্রকৃতির দুষ্কর্মকারী। সে আমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আর তাতে আমার কানের দুলটি ছিটকে পড়ে।[১৪]

আবূ জাহল যে কত বড় নীচ পাপাচারী ছিল তা এই ঘটনা দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায়। যে গৃহে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন সেই গৃহে কোন পুরুষ ছিল না। আসমা' (রা) তখন গর্ভবতী এবং তাঁর মহান স্বামী যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) তখন অনুপস্থিত। তিনি এ ঘটনার আগেই মদীনায় হিজরাত করেছেন।[১৫] এই যুবায়র (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা। তাঁর উপস্থিতিতে মক্কার কোন পাষণ্ডের এমন বুকের পাটা ছিল না যে, তাঁর স্ত্রীর দিকে চোখ উঁচু করে তাকায়, হাত উঠানো তো দূরের কথা।

হিজরাত ও মুহাজিরদের প্রথম সন্তান

হযরত নবী কারীম (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মদীনা পৌঁছে নতুন স্থানের প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে একটু স্থির হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কা থেকে মহিলাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হযরত আসমার স্বামী যুবায়র (রা) নবীর (সা) পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেছেন। নবী (সা) যায়দ ইবন হারিছা (রা) ও স্বীয় দাস রাফি'কে মক্কায় পাঠালেন। আর এদিকে আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন।

আবূ বকরের (রা) ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মা, দুই বোন আসমা' ও 'আয়িশা এবং পরিবারের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মদীনার পথ ধরেন। আসমা (রা) তখন আসন্ন প্রসবা মহিলা। মদীনার কুবা পল্লীতে পৌঁছার পর গর্ভস্থ সন্তান 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়।[১৬]

---

১৪. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (তারাজিম আন-নিসা'-) পৃ. ৩

১৫. বানাত আস-সাহাবা-৫৩

১৬. তাবাকাত-৮/১২৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯২

এ সম্পর্কে আসমার (রা) বর্ণনা এ রকম :

'আমার তখন পূর্ণ গর্ভাবস্থা। এ অবস্থায় আমি মদীনায় পৌঁছে কুবায় ঠাঁই নিলাম। তারপর আবদুল্লাহকে প্রসব করলাম। তাকে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আনিয়ে চিবালেন এবং সেই থুথু তার মুখে দিলেন। এভাবে জন্মের পর রাসূলুল্লাহর (সা) থুথুই প্রথমে তার পেটে যায়।

রাসূল (সা) তার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে দু'আও করেন।[১৭] সে ছিল মদীনার মুহাজিরদের ঘরে জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু। মদীনার কোন মুহাজির দম্পতির কোন সন্তান না হওয়ায় লোকেরা বলাবলি করতো যে, ইহুদীরা তাদের জাদু করেছে তাই তাদের কোন সন্তান হবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলে মুহাজিরদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ইহুদীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানায়।[১৮] রাসূল (সা) সন্তানের নানা আবূ বকরকে (রা) নির্দেশ দেন তার দু'কানে আযান দেওয়ার জন্য। তিনি আযান দেন। রাসূল (সা) শিশুর নাম রাখেন আবদুল্লাহ এবং কুনিয়াত বা ডাকনাম রাখেন নানার ডাক নামে– আবূ বকর। পরবর্তীকালে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) একটু গর্বের সাথে বলতেন : هَاجَرْتُ وَأَنَا فِيْ بَطْنِ أُمِّي 'আমি আমার মায়ের পেটে থাকতেই হিজরাত করেছি।' তিনি আরো বলতেন : আমার মা আমাকে পেটে নিয়ে হিজরাত করেছেন। তিনি যত ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন তার সবই আমিও সহ্য করেছি।[১৯]

হযরত আসমা' (রা) তাঁর এই সন্তান আবদুল্লাহকে অন্তর উজাড় করা স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন যাতে পরবর্তীকালে ইসলামের একজন সেরা সন্তান হতে পারে। আসমার (রা) সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। এ পৃথিবীতে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জীবন দান করে গেছেন তাঁদের সেই তালিকায় আসমার (রা) এই সন্তানও নিজের নামটি অন্তর্ভুক্ত করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিশুকে হাতের উপর দোলাতেন, আর শুভ্র-উজ্জ্বল অসির সাথে তার তুলনা করে কবিতার পংক্তি আওড়াতেন। সেই কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[২০]

---

১৭. সাহীহ আল-বুখারী-১/৫৫৫

১৮. সাহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং-৩৯০৯, ৫৪৬৭; আত-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক-২/১০; পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে শহীদ হলে শামের অধিবাসীরা সে খবর শুনে আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দেয়। সে ধ্বনি শুনে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) প্রশ্ন করেন : এ তাকবীর কিসের জন্য? বলা হলো : শামের অধিবাসীরা 'আবদুল্লাহর (রা) হত্যার খবর শুনে আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছে। তিনি বললেন : যাঁরা তাঁর জন্মের কথা শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন তাঁরা এদের চেয়ে উত্তম যারা আজ তাঁর নিহত হওয়ার কথা শুনে তাকবীর দিচ্ছে। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, ৪/৪১৯; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-৩/৭৩, ৭৫)

১৯. আল-ইসাবা-৫/২২৯; নাসাবু কুরায়শ-২৩৭

২০. আনবাউ নুজাবা' আল-আবনা'-৮৫; আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯; বানাত আস-সাহাবা-৫৫

أبيض كالسيف الحسام الإبريق + بين الحوارى وبين الصديق

ظني به وربَّ ظن تحقيق + واللّهُ أهل الفضل أهل التوفيق

أنْ يحكم الخطبة يعيى المُسليق + ويفرج الكربة فى ساع الضيق

إذا نبت بالمقل الحماليق + والخيل تعدو زيمًا برازيق.

'পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী এবং নানা আবূ বকর সিদ্দীকের মাঝখানে সে হবে ধারালো চকচকে তরবারির মত শ্বেত-শুভ্র।

তার সম্পর্কে এ আমার ধারণা। আর অনেক ধারণাই বাস্তবে রূপ নেয়। আল্লাহ মর্যাদার অধিকারী, ক্ষমতা দানের অধিকারী।

তিনি তাঁকে এমন বক্তৃতা-ভাষণে পারদর্শী করবেন যে, সে বড় বাগ্মীদেরও অক্ষম করে দিবে এবং অসহায়-অক্ষমদের বিপদাপদ দূরীভূত করবে। যখন চোখের পুত্তলীর পাশে ভ্রূ গজাবে এবং বিচ্ছিন্ন ও দলবদ্ধভাবে ঘোড়া দৌড়াবে।'

হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের (রা) ঔরসে এবং আসমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন : পুত্র আবদুল্লাহ, আল-মুনযির; 'উরওয়াহ, 'আসিম, আল-মুহাজির এবং কন্যা খাদীজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান ও 'আয়িশা।[২১]

দৃঢ় ঈমান

ইসলামী জীবন গ্রহণ করার পর ঈমান তাঁর অন্তরে এমন দৃঢ়মূল হয় যে, শিরক ও কুফরীর সাথে বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি। এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে চিন্তা করে নিজের অতি নিকটের অমুসলিম আপনজনদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আসমার (রা) পিতা তাঁর মাকে তালাক দিলে সেই জাহিলী যুগেই তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আসমার (রা) মা তাঁদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং আসমার গোটা পরিবার ইসলামী পরিবারে পরিণত হলো। একদিন আসমার (রা) মা তাঁর মেয়েকে দেখার জন্য আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জানতে চান, তাঁর এই মুশরিক মায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন কিনা? তখন এ আয়াত নাযিল হয় :[২২]

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين.

তখন রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন : হাঁ তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।[২৩] 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ তাঁর পিতা

---

২১. হিলয়াতুল আওলিয়া'-২/২৫৫

২২. সূরা আল-মুমতাহিনা-৮

২৩. তাফসীর আল-কুরতুবী-১০/২৩৯; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৫

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : একবার কুতাইলা বিন্‌ত 'আবদিল 'উয্‌যা কিছু কিসমিস, ঘি, পনির ইত্যাদি উপহার নিয়ে কন্যা আসমা'র গৃহে আসলেন। আসমা (রা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। 'আয়িশা (রা) বিষয়টি রাসূলকে (সা) অবহিত করে তাঁর মতামত জানতে চান। তখন নাযিল হয় সূরা আল-মুমতাহিনার উপরোক্ত আয়াতটি। তখন আসমা (রা) মাকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে বসান এবং তাঁর উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন।[২৪]

হযরত আসমা (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী মানুষ। সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতে কোন লজ্জাবোধ করতেন না। হযরত আসমা (রা) নিজেই তাঁর স্বামী হযরত যুবায়রের (রা) সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দৈন্যদশা এবং সেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজ হাতে সম্পন্ন করার কাহিনী আমাদেরকে এভাবে শুনিয়েছেন :

যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের সংগে যখন আমার বিয়ে হয় তখন অর্থ-বিত্ত বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। ছিল না কায়িক শ্রমের জন্য কোন দাস। ভীষণ হতদরিদ্র অভাবী মানুষ ছিলেন। থাকার মধ্যে ছিল শুধু একটি ঘোড়া ও একটি উট। আমি নিজেই তার রাখালী করতাম। মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে তিন ফারসাখ দূরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক খণ্ড খেজুর বাগান যুবায়রকে দান করেছিলেন। সেখান থেকে খেজুরের বীচি কুড়িয়ে থলিতে ভরে মাথায় করে বাড়ী আনতাম। তারপর নিজ হাতে তা পিষে উট-ঘোড়াকে খাওয়াতাম। কূয়া থেকে বালতি ভরে পানি উঠিয়ে মশকে ভরে বাড়ীতে আনতাম। এছাড়া বাড়ীর যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতাম। যেহেতু আমি ভালো রুটি বানাতে পারতাম না, এ কারণে আটা চটকিয়ে দলা বানিয়ে রেখে দিতাম। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিলেন আনসারদের স্ত্রীরা। তাঁরা ছিলেন খুবই সরল ও সহজ প্রকৃতির। তাঁরা আমাদের ভীষণ ভালোবাসতেন। অন্যের কাজে সাহায্য করতে পারলে দারুণ খুশী হতেন। তাঁরা আমার রুটি বানিয়ে সেঁকে দিতেন। প্রতিদিন আমাকে এ সকল বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতো।

প্রতিদিনের মত একদিন আমি বাগান থেকে খেজুরের বীচির বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে দেখা। তাঁর সংগে তখন আরো কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর উট বসিয়ে আমাকে তাঁর পিছনে বসার জন্য ডাকলেন। আমি আমার স্বামী যুবায়রের মান-মর্যাদার কথা ভেবে লজ্জা পেলাম। তিনি আমার লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন। আমি বাড়ী ফিরে একথা যুবায়রকে জানালাম। তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ জানেন তোমার এভাবে মাথায় করে বোঝা আনা রাসূলের (সা) সাথে তাঁর বাহনের পিঠে বসার চাইতে আমার নিকট বেশী পীড়াদায়ক। এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে আমার পিতা আবূ বকর (রা) আমার জন্য একটি দাস পাঠান। সেই

---

২৪. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৪; দুররুল মানছূর-৮/১৩১

আমাকে ঘোড়ার রাখালী থেকে মুক্তি দেয় এবং সব বিপদ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি লাভ করি।[২৫]

দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কারণে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে দারুণ হিসেবী ছিলেন। প্রতিটি জিনিস প্রয়োজন মত মেপে মেপে খরচ করতেন। একথা রাসূল (সা) অবগত হয়ে তাঁকে এভাবে মেপে মেপে খরচ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, এভাবে মেপে খরচ করবে না। অন্যথায় আল্লাহ ততটুকু পরিমাণই দিবেন। এরপর তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন।

জীবনের এক পর্যায়ে হযরত আসমা' (রা) প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হন। তবে এই প্রাচুর্য তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারার উপর কোন রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমরণ মোটা কাপড় পরেছেন এবং শুকনো রুটি দ্বারা উদরপূর্তি করে একেবারে ভোগ-বিমুখভাবে জীবন কাটিয়েছেন। ইরাক বিজয়ের পর তাঁর ছেলে মুনযির যখন ঘরে ফিরলেন তখন উন্নতমানের পাতলা, মোলায়েম ও নকশা করা কিছু মহিলাদের পোশাক সংগে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো মায়ের হাতে তুলে দেন। বয়সের কারণে তখন হযরত আসমা (রা) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই কাপড়গুলোর উপর হাত বুলিয়ে তার মান বুঝার চেষ্টা করেন। যখন বুঝতে পারেন এগুলো অতি উন্নম মানের তখন তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। মুনযির যখন মোটা কাপড় নিয়ে এলেন তখন তিনি তা গ্রহণ করেন এবং খুশী হন। তারপর বলেন : ছেলে! আমাকে এমন মোটা কাপড়ই পরাবে।[২৬]

দানশীলতা

হযরত আসমার (রা) চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দানশীতা। আর এ গুণটি তিনি অর্জন করেন আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান ও পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে। পিতা আবূ বকরের (রা) দানশীলতার গুণটি তাঁর তিন কন্যা– আসমা', 'আয়িশা ও উম্মু কুলছূম (রা) পূর্ণরূপে ধারণ করেন। দানশীলতার এ গুণটি তাঁদের সত্তায় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। এমনকি তাঁদের সময়ে এ ক্ষেত্রে তাঁরা দৃষ্টান্তে পরিণত হন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর মা ও খালার দানশীলতার কথা বলছেন এভাবে :[২৭]

مارأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودُهما مختلـف، أما عائشة فكانت تجمع الشئ إلى الشئ، حتى إذا اجتمع عندها وضعته فـى مواضعه، وأما أسماء فكانت لاتَدَّخِرُ شيئًا لغد.

২৫. তাবাকাত-৮/২৫০, ২৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯০, ২৯১; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৫২

২৬. তাবাকাত-৮/২৫০

২৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-৩/১৩৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২

'আমি আমার মা আসমা ও খালা 'আয়িশা (রা) থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে কিছু ভিন্নতা ছিল। খালা 'আয়িশার স্বভাব ছিল প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে যথেষ্ট পরিমাণে জমা হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা আসমার (রা) স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।'

সম্ভবতঃ আসমা' (রা) এই দানশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশ বাণীর অনুসরণ করতেন। তিনি আসমাকে কোন জিনিস জমা করে রাখতে এবং গুনে গুনে খরচ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন তুমি যদি এমন কর তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতিও এমন করবেন। তোমার রুযি-রিযিকের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। রাসূল (সা) বলেন :[২৮]

يا أسماء لا تحصى فيحصى اللهُ عليك.

'হে আসমা! তুমি হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে দানের ক্ষেত্রে হিসাব করবেন।'

আসমা' (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) এই উপদেশ বাণীর পর থেকে আমি কী খরচ করলাম এবং কী আমার হাতে এলো তা আর হিসাব করিনি। যা কিছুই আমি খরচ করেছি আল্লাহ আমাকে তা পূরণ করে দিয়েছেন।[২৯]

তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের এই বলে উপদেশ দিতেন যে, তোমার ধন-সম্পদ অন্যের সাহায্য ও উপকারের জন্য দেওয়া হয়, জমা করার জন্য নয়। তুমি যদি তোমার অর্থ-বিত্ত আল্লাহর বান্দাদের জন্য খরচ না কর এবং কৃপণতা কর তাহলে আল্লাহও তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবেন। তুমি যা কিছু দান করবে অথবা খরচ করবে, প্রকৃতপক্ষে তাই হবে তোমার সঞ্চয়, এ সঞ্চয় কখনো কম হবে না, অথবা নষ্টও হবে না।[৩০]

হযরত আসমা' (রা) কখনো অসুস্থ হলে তাঁর মালিকানার সকল দাসকে মুক্ত করে দিতেন।[৩১] উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) মৃত্যুকালে এক খণ্ড ভূমি রেখে যান যা উত্তরাধিকার হিসেবে আসমা' (রা) লাভ করেন। তিনি সেই ভূমিটুকু এক লাখ দিরহামে বিক্রি করেন এবং সকল অর্থ আত্মীয় ও পরিজনদের মধ্যে বিলি করে দেন।[৩২]

হযরত আসমার (রা) স্বামী হযরত যুবায়র (রা) ছিলেন অনেকটা রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। এ কারণে আসমা' (রা) একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি আমার স্বামীর

---

২৮. সাহীহ আল-বুখারী, ফিল হিবা (২৫৯০, ২৫৯১), ফিয যাকাত (১৪৩৩, ১৪৩৪)
২৯. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক (তারাজিম আন-নিসা')-১৯; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৩৫৭
৩০. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক-১৬; তাবাকাত-৮/৩৫৭
৩১. তাবাকাত-৮/২৮৩
৩২. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু হিবাতিল ওয়াহিদ লিল জামা'আহ্।

সম্পদ থেকে অনুমতি ছাড়াই ফকীর-মিসকীনকে কিছু দান করতে পারি? বললেন : হাঁ, করতে পার।[৩৩]

একবার হযরত আসমার (রা) মা মদীনায় তাঁর নিকট আসেন এবং কিছু অর্থ সাহায্য চান। তিনি তাঁর অভ্যাস মত রাসূলের (সা) নিকট ছুটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আমার মা একজন মুশরিক (পৌত্তলিক), আমার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাচ্ছেন, আমি কি তাঁকে সাহায্য করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন : তিনি তোমার মা।[৩৪] অর্থাৎ তাঁকে তুমি সাহায্য করতে পার। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (মৃ. ১৩০ হি.) যিনি একজন বড় মাপের তাবি'ঈ ছিলেন, বলেন : 'আসমা' ছিলেন একজন উদারপ্রাণ দানশীল স্বভাবের মহিলা।'[৩৫]

শাশুড়ীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি

হযরত আসমার (রা) শাশুড়ী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিন্ত 'আবদিল মুত্তালিব (রা)। তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ছিলেন। ইসলামী জীবনে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য খ্যাতিও অর্জন করেন। তবে স্বভাবে একটু রুক্ষতা ছিল। রেগে গেলে তা অনেকটা মাত্রা ছেড়ে যেত। এসব কারণে পুত্রবধূ আসমার (রা) সঙ্গে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। আর তা নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যেও মান-অভিমানের অবতারণা হতো। এ রকম একটি ঘটনা ইবন 'আসাকির 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার আসমার কোন ব্যাপার নিয়ে সাফিয়্যা ও তাঁর ছেলে যুবায়রের মধ্যে ক্ষুব্ধ কথাবার্তা হয়। আসমা-যুবায়রের ছোট্ট মেয়ে খাদীজা সব সময় তার দাদীর কাছে থাকতো। সে তার আব্বা-দাদীর কথা শোনে এবং তার মার কাছে গিয়ে বলে : মা, আপনি কেন দাদীকে বকেছেন? তিনি আব্বার নিকট অভিযোগ করেছেন। কথাটি জানাজানি হয়ে গেল। সাফিয়্যা ছেলের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, তাঁর কথাটি ছেলে বউকে বলে দিয়েছে। তিনি এজন্য ছেলেকে তিরস্কার করেন। যুবায়র (রা) মাকে বললেন : মা, আমি তাকে বলিনি। এতে মা আরো ক্রুদ্ধ হলেন। ভাবলেন, ছেলে তাঁর নিকট সত্য গোপন করছে। আসলে যুবায়রও জানতেন না, আসমা' বিষয়টি কার কাছ থেকে জেনেছেন। রাগের চোটে সাফিয়্যা (রা) তখন ছেলের প্রতি তিরস্কারমূলক বেশ কিছু শ্লোক উচ্চারণ করেন। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। যুবায়র (রা) বললেন : মা, আসমাকে একথা বলেছে খাদীজা। সাফিয়্যা বললেন : তাই! সে যেন আর কখনো আমার ঘরে না আসে।[৩৬] উল্লেখ্য যে, হযরত সাফিয়্যা (রা) আসমা-যুবায়রের (রা) সন্তানদেরকে খুবই আদর করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে তো কোলে করে নাচাতেন, আর সুর করে কবিতার চরণ আবৃত্তি করতেন।[৩৭]

---

৩৩. মুসনাদ-৬/৩৫৩
৩৪. সাহাবিয়াত-১৬০
৩৫. তাবাকাত-৮/২৫৩
৩৬. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (তারাজিম আন-নিরসা') পৃ. ১৭, ১৮
৩৭. বানাত আস-সাহাবা-৬২, টীকা-১

খোদাভীতি ও জ্ঞান

আল্লাহর পথে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া, দানশীলতা, উন্নত নৈতিকতা যেমন তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল তেমনিভাবে জ্ঞান, খোদাভীতি, বুদ্ধিমত্তা, ফিকহ্ বিষয়ে পারদর্শিতা তাঁর সত্তাকে আরো মহিয়ান করে তোলে। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা, জিহাদে অংশগ্রহণ এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজে তাঁর সমান অংশীদারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিনীত ও বিনম্রভাবে 'ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং একাগ্রচিত্তে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বিশেষ কোন আয়াত পাঠের সময় বিগলিত চিত্তে বার বার তা আওড়াতে থাকতেন। তাঁর স্বামী বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি আসমার (রা) ঘরে ঢুকে দেখি সে নামাযে দাঁড়িয়ে এ আয়াত[৩৮] - فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّعِيْرِ.

'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।'

পাঠ করলো। তারপর পাঠ করলো আ'উযুবিল্লাহ। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, কিন্তু সে কাঁদছে আর আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করছে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি বাজারে গেলাম। কাজ সেরে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে দেখলাম, তখনো সে কাঁদছে আর আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করছে।[৩৯]

ইবনুল জাওযী (রহ) উল্লেখ করেছেন যে, সেকালে এমন একদল কুরআন পাঠক ও শ্রোতার আবির্ভাব ঘটে, যারা কুরআন পাঠ অথবা শোনার সময় অভিনব সব আচরণ করতো। যেমন : অচেতন হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলা, মাথা-মুখে চড়-থাপ্পড় মারা ইত্যাদি। তারা মনে করতো এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর পানাহ ও আশ্রয় কামনা করছে। তারা আরো মনে করতো, সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ ও সর্বাধিক সৎকর্মশীল রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ এমন করতেন এবং তারা কেবল তাঁদেরই অনুসরণ করছে।[৪০] কূফার বিখ্যাত হাফিজ হুসাইন ইবন 'আবদুর রহমান আস-সুলামী (মৃ. ১৩৬ হি.) বলেন : একবার আমি আসমা' বিনত আবী বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ কেমন করতেন? বললেন : আল্লাহ যেমন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ এবং গাত্রত্বক রোমাঞ্চিত হয়। বললাম : এখানে এমন কিছু লোক আছে যাদের সামনে কুরআন পাঠ করলে অচেতন হয়ে পড়ে। হযরত আসমা (রা) বললেন : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

'বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাই।'[৪১]

মূলতঃ হযরত আসমা (রা) আল-কুরআনের দু'টি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যাতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। সেই আয়াত

---

৩৮. সূরা আত-তূর-২৭
৩৯. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৫৫; আদ-দুররুল মানছূর-৭/৬৩৫
৪০. আল-কুস্সাম ওয়াল-মুযাক্কিরীন-৪০
৪১. আল-বাহর আল-মুহীত-৯/১৯৬; তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (তারাজিম আন-নিসা'-২০)

দু'টি হলো :[৪২]

وَإِذَا سَمِعُوْا مَاأُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ.

'রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চোখ বিগলিত দেখবে।'

اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ منه جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ.

'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।'[৪৩]

এই উম্মাতের সর্বাধিক খোদাভীরু ও পুণ্যবান মানুষ হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তারা সরাসরি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকট থেকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং তারা যা করেননি, ইবাদাতের নামে তা করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়। একথাই হযরত আসমা' (রা) 'আ'উযুবিল্লাহ' পাঠের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি আরো বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঐ সকল লোক যা করে তা মূলতঃ শয়তানের কাজ। সততা ও নিষ্ঠা ছিল হযরত আসমার (রা) স্বভাবগত। গোটা মানব সমাজের প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করছিলেন। নামায খুব দীর্ঘ ছিল। আসমা' (রা) ভয় পেয়ে গেলেন এবং ক্লান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর অদূরে দাঁড়ানো দুই মহিলার উপর দৃষ্টি পড়লো। ওই দুই মহিলার একজন ছিল একটু স্থূলকায় এবং অন্যজন একটু হালকা-পাতলা ও দুর্বল। তাদের নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তিনি সাহস ও শক্তি পেলেন। তিনি সরে পড়ার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন এবং মনে মনে নিজেকে বললেন, তাদের চেয়েও বেশী সময় আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।[৪৪] যে কথা সেই কাজ। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলেন। নামাযও ছিল কয়েক ঘণ্টা দীর্ঘ। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামাল দিতে পারেননি। জ্ঞান হারানোর উপক্রম হয় এবং মাথায় পানি ছিটানোর প্রয়োজন পড়ে।[৪৫]

সে যুগে হযরত আসমা (রা) বহুবিধ জ্ঞানের উৎসস্থল ছিলেন। তিনি স্বপ্নের একজন দক্ষ তা'বীর বা ব্যাখ্যাকারিণীও ছিলেন। আল ওয়াকিদী বলেছেন :[৪৬]

---

৪২. সূরা আল-মায়িদা-৮৩
৪৩. সূরা আয-যুমার-২৩
৪৪. মুসনাদে আহমাদ-৩/৩৪৯
৪৫. সাহীহ আল-বুখারী-১/১৪৪
৪৬. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৮

كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، وكان أخذ ذلك عن أسماء بنت بكر، وأخذته أسماء عن أبيها.

'সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের তা'বীরকারী। তিনি এ জ্ঞান লাভ করেন আসমা' বিনত আবী বকর থেকে। আর আসমা' লাভ করেন তার পিতা আবূ বকর (রা) থেকে।'

হযরত আসমার (রা) বহু ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁরা আসতেন তাঁর সাথে দেখা করতে। তাঁর পূতঃ পবিত্রতার ব্যাপক প্রসিদ্ধি ছিল। মানুষ আসতো তাঁর দু'আ নিতে। বিশেষ করে বিপদ-আপদের সময় মানুষ আসতো তাঁর দ্বারা দু'আ করাতে। কখনো কোন জ্বরে আক্রান্ত নারী তাঁর নিকট এলে তিনি তার বুকের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে বলতেন, রাসূল (সা) বলেছেন : জ্বর হল জাহান্নামের আগুন, আর তোমরা তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।[৪৭]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ইনতিকালের সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি জোব্বা হযরত আসমাকে (রা) দিয়ে যান। আসমার (রা) বাড়ীর কেউ অসুস্থ হলে তিনি এই জোব্বা ধোওয়া পানি তাকে পান করাতেন।[৪৮]

হযরত আসমা' (রা) কয়েকবার হজ্জ করেন। প্রথম বার আদায় করেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গে।

হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনা

হযরত আসমা' (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের (রা) কন্যাদের অনেককে অতিক্রম করে গেছেন। তবে আবূ বকরের (রা) পরিবারের মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে ডিঙ্গিয়ে গেছেন। যে সকল পুরুষ বা মহিলা সাহাবী থেকে এক শো'র কম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে "আসহাবুল 'আশারা" বলা হয়।[৪৯] তাঁর

---

৪৭. সাহীহ মুসলিম, ফিস সালামি (২২১১); বুখারী, ফিত তিব্ব (৫৭২৪)

৪৮. মুসলিম, ফিল-লিবাসি ওয়ায যীনাতি (২০৬৯); তাবাকাত-১/৪৫৪; মুসনাদ-৬/৩৪৮

৪৯. যে সকল মহিলা সাহাবীকে 'আসহাবুল 'আশরা'-এর মধ্যে গণ্য করা হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. আসমা' বিনত ইয়াযীদ (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৮১
২. মায়মূনা বিন্ত আল-হারিছ, উম্মুল মু'মিনীন (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৭৬
৩. উম্মু হাবীবা, উম্মুল মু'মিনীন (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৬৫
৪. আসমা' বিন্ত 'উমাইস (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৬০
৫. আসমা' বিন্ত আবী বকর (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৫৮
৬. উম্মু হানী বিন্ত আবী তালিব (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৪৬
৭. ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৩৪
৮. উম্মুল ফাদল বিন্ত আল-হারিছ (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৩০
৯. উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-২৪

স্বামী যুবায়র (রা)ও এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত। তবে তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে বিশটি হাদীছ বেশী বর্ণনা করেছেন। তিনি যেখানে ৫৮ (আটান্ন)টি, মতান্তরে ৫৬টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাঁর স্বামীর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৮ (আটত্রিশ)।

হযরত আসমার বর্ণিত হাদীছ সাহীহাইনসহ সুনান ও মুসনাদের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ)টি হাদীছ সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া ৪ (চার)টি বুখারী এবং ৪ (চার)টি মুসলিম এককভাবে সংকলন করেছেন।[৫০]

হযরত আসমা' (রা) থেকে যে সকল মানুষ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর দুই ছেলে– 'আবদুল্লাহ ও 'উরওয়া, তাঁর দৌহিত্র 'আবদুল্লাহ ইবন 'উরওয়া, তাঁর আযাদকৃত দাস 'আবদুল্লাহ ইবন কায়সান, ইবন 'আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান ও আরো অনেকে। আর মহিলাদের মধ্যে : ফাতিমা বিন্ত শায়বা, উম্মু কুলছূম মাওলাতুল হাজাবা ও আরো অনেকে।[৫১]

হযরত আসমার (রা) মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তাছাড়া তিনি একজন বাগ্মী মহিলা ছিলেন। স্বামী যুবায়র (রা) ও পুত্র আবদুল্লাহ (রা) শাহাদাত বরণের পর তিনি যে মরসিয়া রচনা করেন তা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়।[৫২]

তালাক

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে হযরত যুবায়র (রা) কর্তৃক হযরত আসমা'কে (রা) তালাক দানের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন গ্রন্থে এর কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইবনুল আছীর সম্ভাব্য দু'টি কারণের কথা বলেছেন। একটি এই যে, হযরত আসমা' (রা) বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং বয়সের কারণে দৃষ্টিশক্তিও যেতে বসেছিল।[৫৩] আর তাই হযরত যুবায়র (রা) তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে চান। দ্বিতীয়টি এই যে, যে কোন কারণেই হোক দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আর তা তালাক তথা সম্পর্ক ছিন্ন করার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। প্রথম কারণটি কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। হযরত যুবায়র (রা) যে পর্যায়ের মানুষ তাতে কি একথা কল্পনা করা যায় যে, বার্ধক্যের কারণে বহু সন্তানের জননী স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন? তাও আবার যখন তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? দ্বিতীয় যে কারণটির কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। আর সে কারণে তালাক দেওয়া সম্ভব। হযরত যুবায়রের (রা) স্বভাব ছিল একটু রুক্ষ ও কঠোর প্রকৃতির।

---

১০. আর-রুবায়্যি' বিন্ত মু'আওবিয (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-২১
(বানাত আস-সাহাবা-পৃ. ৬৫; টীকা-১)

৫০. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯; আল-ইসাবা-৪/২৩০ বানাত আস-সাহাবা-৬৫, ৬৬

৫১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭; তাহযীব আত-তাহযীব-১০/৪৫১

৫২. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯

৫৩. উসুদুল গাবা-৫/৩৯৩

ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। ইবনুল আছীরের আরেকটি বর্ণনায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। একবার কোন একটি কথার কারণে হযরত যুবায়র (রা) স্ত্রী হযরত আসমার (রা) উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এমনকি তা মারপিট পর্যন্ত গড়ায়। আসমা' (রা) ছেলে আবদুল্লাহকে (রা) ডাকলেন সাহায্যের জন্য। যুবায়র (রা) তাঁকে আসতে দেখে বললেন, তুমি যদি এখানে আস তাহলে তোমার মাকে তালাক। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি আমার মাকে আপনার কসমের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করলেন? তারপর জোর করে তিনি পিতার হাত থেকে মাকে ছাড়িয়ে আনেন। তারপর আসমা' (রা) পৃথক হয়ে যান।[৫৪] হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন : যুবায়র যখন আসমাকে (রা) তালাক দেন তখন 'উরওয়া ছোট। যুবায়র (রা) 'উরওয়াকে নিজের কাছে নিয়ে নেন।[৫৫] যাই হোক না কেন, তালাকের পর আসমা' (রা) ছেলে 'আবদুল্লাহর (রা) নিকট চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) একজন বাধ্য ও অনুগত সন্তান হিসেবে আমরণ মায়ের সেবা করেন। মায়ের সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

হযরত যুবায়র (রা) যে হযরত আসমার (রা) সঙ্গে কঠোর আচরণ করতেন সে কথা আরো কিছু বর্ণনায় জানা যায়। যেমন আসমা' (রা) একদিন তাঁর পিতা আবূ বকরের (রা) নিকট গিয়ে তাঁর প্রতি যুবায়রের (রা) কঠোর আচরণের অভিযোগ করলেন। আবূ বকর (রা) আসমার (রা) কথা শোনার পর প্রথমে যুবায়রের (রা) প্রশংসা করলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার সাক্ষ্য দিলেন। তারপর তাঁকে উপদেশ দিলেন : আমার মেয়ে! ধৈর্য ধর। একজন নারীর যদি একজন সৎ স্বামী থাকে এবং সে যদি স্ত্রীর পূর্বে মারা যায়, আর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে না করে তাহলে জান্নাতে তাদের আবার মিলন হবে।[৫৬]

বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা

প্রাচীন কাল থেকে আরব ভূমির এ বৈশিষ্ট্য আছে যে, তার প্রতিটি সন্তান হয় উদার ও দানশীল। তেমনিভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতাও তাদের বিশেষ প্রকৃতি ও গুণ। এ কারণে হযরত আসমা' (রা) দানশীল হিসেবে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি একজন সাহসী বীর মহিলা হিসেবেও প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। সা'ঈদ ইবন আল-আসের (রা) সময় যখন মদীনার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং শহরে ব্যাপকভাবে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে তখন হযরত আসমা' (রা) একটি সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর বালিশের নীচে রেখে ঘুমাতেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোন চোর-বাটপাড় ও দুষ্কৃতিকারী যদি ঘরে ঢুকে যায় এবং আমার উপর হামলা করে তাহলে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলবো।[৫৭]

---

৫৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাসাহীর ওয়াল-আ'লাম-৩/১৩৪

৫৫. তাবাকাত-৮/২৫৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯৩

৫৬. আ'লাম আন-নিসা'-২/৪৮; বানাত আস-সাহাবা-৫৯

৫৭. নিসা' হাওলার রাসূল-১৮৪

হযরত আসমা'কে (রা) জিহাদের ময়দানেও দেখা যায়। শাম অভিযানে তিনি স্বামী যুবায়রের (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং বিখ্যাত ইয়ারমূক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন।[৫৮]

হযরত আসমার (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহর (রা) বয়স যখন পূর্ণ যৌবনকাল তখন উমাইয়্যা খলীফাদের বিরুদ্ধাচরণ করে হিজায, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং তার হাতে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) করে। উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া (রা) ইনতিকালের পূর্বে তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু ইয়াযীদের এভাবে রাজতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ ও তাঁর অনৈসলামী জীবনধারা ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মেনে নিতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহও (রা) ইয়াযীদের বাই'আত করতে অস্বীকার করেন। তিনি মক্কাকে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী ঘোষণা দিয়ে সেখানে অবস্থান নেন। চতুর্দিক থেকে মানুষ দলে দলে এসে তাঁর হাতে বাই'আত করতে থাকে। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। যখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁর উযীর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হযরত 'আবদুল্লাহকে (রা) প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিশাল সমরশক্তি নিয়ে হিজরী ৭২ সনের ১লা যুলহিজ্জা মক্কা অবরোধ করেন। বাইরের সকল যোগাযোগ থেকে মক্কা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একাধারে ছয় মাস উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। দীর্ঘ অবরোধের ফলে মক্কার মানুষের জীবনধারা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) সহযোগীদের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। তারা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তের মুষ্টিমেয় কিছু অনুসারীদের নিয়ে কা'বার হারাম শরীফে অবস্থান নেন। এখানে উমাইয়্যা সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি মা আসমার (রা) সাথে শেষবারের মত সাক্ষাৎ করতে যান। হযরত আসমা (রা) তখন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত ও অন্ধ। হযরত আসমার (রা) ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে মাতা-পুত্রের এই শেষ সাক্ষাতের সময় তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ঈমানী মজবুতী, চরম আত্মত্যাগ, আল্লাহ নির্ভরতা ও সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দেন ইতিহাসে তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। মাতা-পুত্রের সেই সংলাপটি ছিল নিম্নরূপ :

আবদুল্লাহ : মা, আস্-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আসমা' : 'আবদুল্লাহ! ওয়া 'আলাইকাস সালাম। হাজ্জাজ-বাহিনীর মিনজিনিক হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার বাড়ী-ঘর প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন চরম মুহূর্তে তোমার আগমন কি উদ্দেশ্যে?

'আবদুল্লাহ : উদ্দেশ্য আপনার সাথে পরামর্শ।

---

৫৮. বানাত আস-সাহাবা-৬৯

আসমা' : পরামর্শ! কি বিষয়ে?

'আবদুল্লাহ : হাজ্জাজের ভয়ে অথবা প্রলোভনে আমার সঙ্গীরা আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, এমন কি আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে। তাদের ধৈর্য ও সাহস যত বেশীই হোক না কেন দু' এক ঘণ্টার বেশী কোন মতেই টিকে থাকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়্যারা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিই এবং অস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর হাতে বাই'আত হই তাহলে পার্থিব সুখ-সম্পদের যা আমি চাইবো তাই তারা দেবে– এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন?

আসমা' (রা) একটু উচ্চস্বরে বলেন : ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজের। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশী জান। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের উপর আছ এবং মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করছো, তাহলে যারা তোমার পতাকাতলে অটল থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল থাক। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদের ধ্বংস করছো। পুরুষের মত যুদ্ধ কর এবং জীবনের ভয়ে কোন অপমানকে সহ্য করো না। অবমাননাকর জীবনের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত খেয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়! তুমি শহীদ হলে আমি খুশী হবো। আর যদি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রত্যাশী হও তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ আর কে আছে? তুমি যদি এই ভেবে থাক যে, তুমি একা হয়ে গেছো এবং আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাহলে এই কর্মপদ্ধতি কোন সম্মানীয় ব্যক্তির নয়। তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে? একটি সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে মর। তাহলে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাব।

আবদুল্লাহ : তাহলে আজ আমি নিশ্চিত নিহত হবো।

আসমা' : স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং বনী উমাইয়্যার ছোকরারা তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলা করবে, তা থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই উত্তম।

আবদুল্লাহ : মা, আমি নিহত হতে ভয় পাচ্ছি না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে নানাভাবে শাস্তি দেবে। আমার হাত-পা কেটে, অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে।

আসমা' : বেটা! নিহত হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছিলার সময় সে কষ্ট পায় না।

মায়ের একথা শুনে হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : আমার কল্যাণময়ী মা, আপনার সুমহান মর্যাদা আরো কল্যাণময় হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার মুখ থেকে কেবল একথাগুলো শোনার জন্য আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি, আমি দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি যে জন্য সংগ্রাম করছি, তা কোন জাগতিক সুখ-

সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি লোভ-লালসা ও ভালোবাসার কারণে নয়। বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণা করার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমি এখন সে কাজেই যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না এবং আপনার সবকিছুই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবেন।

আসমা’ : যদি তুমি অসত্য ও অন্যায়ের উপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো।

আবদুল্লাহ : আম্মা! আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার এ সন্তান কখনও অন্যায়, অশ্লীল ও অশালীন কাজ করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কোন মুসলমান বা যিম্মীর উপর যুলুম করেনি এবং আল্লাহর রিযামন্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন কিছু এ দুনিয়ায় তার কাছে নেই। একথা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন : ইলাহী, তুমি ভালো করেই জান যে, আমি আমার মাকে যা কিছু বলেছি তা কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য। যাতে তিনি আমার এই অবস্থা দেখে কষ্ট না পান।

আসমা’ বললেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَكَ عَلٰى مَايُحِبُّ وَاُحِبُّ –

‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের উপর তোমাকে অটল রেখেছেন।’ আমার ছেলে! আমি আশা করি তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য হবে এক অতুলনীয় ধৈর্য। তুমি আমার সামনে নিহত হলে, তা হবে আমার ছওয়াবের উপলক্ষ্য। তুমি বিজয়ী হলে তা হবে আমার জন্য আনন্দের বিষয়। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। বৎস! তুমি একটু আমার কাছে এসো, আমি শেষবারের মত একটু তোমার শরীরের গন্ধ শুকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ, এটাই তোমার ও আমার ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

‘আবদুল্লাহ (রা) বাঁকা হয়ে মার হাত-পা চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন, আর মা ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুকতে ও চুমু দিতে লাগলেন এবং তাঁর শরীরে নিজের দু’টি হাতের স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। বিদায় বেলা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে একথা বলতে বলতে তাঁকে আবার দূরে ঠেলে দিলেন : আবদুল্লাহ! তুমি এ কী পরেছো?

– আম্মা, এ তো আমার বর্ম।

– বেটা, যারা শাহাদাতের অভিলাষী, এ তাদের পোশাক নয়।

– মা, আপনাকে খুশী করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।[৫৯]

– তুমি এটা খুলে ফেল। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহস এবং তোমার আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তাছাড়া এ হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার

---

৫৯. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-১/২১১-২১২

জন্যও সহজতর। এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হলেও তোমার সতর অপ্রকাশিত থাকবে।

মায়ের কথামত 'আবদুল্লাহ তাঁর বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং একথা বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন : মা, আমার জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না– আমার নিহত হওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়।

– আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে আমি কখনো ভুলবো না। কেউ অসত্যের উপর যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমার এ যুদ্ধ সত্যের জন্য। তারপর তিনি দু'টি হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন রাত জেগে জেগে তার দীর্ঘ ইবাদাত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার জন্য আপনি তার উপর রহম করুন। হে আল্লাহ, রোযা অবস্থায় মক্কা ও মদীনাতে মধ্যাহ্নকালীন ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার উপর দয়া করুন। হে আল্লাহ! পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের জন্য তার প্রতি আপনি করুণা বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই নিকট সোপর্দ করেছি। তার জন্য আপনি যে ফয়সালা করবেন তাতেই আমি রাযী। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।

মা হযরত আসমার (রা) কথাগুলো হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে। তিনি চলে যান এবং অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে যুদ্ধ করে শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখ থেকে নিম্নের চরণ দু'টি উচ্চারিত হচ্ছিল :[৬০]

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلْتُ لاَتَبْكِيْنِى + لَمْ يَبْقَ إِلاَّ حَسَبِى وَدِيْنِى

وَصَارِمٌ لاَنَتْ بِهِ يَمِيْنِى

'আমার মা আসমা'! আমি নিহত হলে আমার জন্য কাঁদবেন না। আমার আভিজাত্য ও আমার দীনদারী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর অবশিষ্ট আছে একখানি ধারালো তরবারি যা দিয়ে আঘাত করতে করতে আমার ডান হাত দুর্বল হয়ে গেছে।'

সে দিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। হত্যার পর হাজ্জাজ তার লাশ ঝুলিয়ে রেখেছিল। দাসীকে সংগে করে মা আসমা' (রা) এলেন ছেলের লাশ দেখতে। দেখলেন, নীচের দিকে মুখ করে লাশ ঝুলানো রয়েছে। লাশের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ়ভাবে বললেন : 'ইসলামের এ অশ্বারোহীর এখনো কি অশ্বের পিঠ থেকে নামার সময় হলো না?' জনতার ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য হাজ্জাজ লোক পাঠায়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো লোক মারফত বলে পাঠায়, এবার না এলে চুলের গোছা ধরে টেনে আনা হবে। হযরত আসমা (রা) হাজ্জাজের ভয়ে ভীত হলেন না। তার ধমকে মোটেই কান দিলেন না।

---

৬০. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৭৪; বানাত আস-সাহাবা-৭০

সত্য উচ্চারণ ছিল হযরত আসমার (রা) চরিত্রের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। হাজ্জাজের মত নরঘাতক অত্যাচারীর সামনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ করেছেন। তার সামনা সামনি দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তার অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমার (রা) নিকট এসে বলে : আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্ম বিরোধী কাজ করেছে ও নাস্তিকতা প্রচার করেছে। তাই আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন।

দৃঢ় কণ্ঠে আসমা' (রা) জবাব দেন : তুমি মিথ্যাবাদী, আমার ছেলে নাস্তিক ছিল না। সে ছিল সাওম পালনকারী, রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাতকারী, অত্যন্ত আল্লাহভীরু, অত্যধিক ইবাদাতকারী, পিতামাতার অনুগত ও বাধ্য সন্তান। তবে আমি নবী কারীমের (সা) মুখ থেকে শুনেছি, ছাকীফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন যালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদী (আল-মুখতার আছ-ছাকাফী)-কে তো আগেই দেখেছি। আর যালিম, সে তুমিই– যাকে আমি এখন দেখছি। হযরত আসমার (রা) একথা শুনে হাজ্জাজ ভীষণ উত্তেজিত হয় এবং বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু কোন কিছু বলার সাহস হারিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।[৬১]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। হাজ্জাজ আসমাকে (রা) লক্ষ্য করে বলে : বলুন তো আমি আল্লাহর দুশমন 'আবদুল্লাহর সাথে কেমন ব্যবহার করেছি? আসমা' জবাব দেন : তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো, আর সে নষ্ট করেছে তোমার আখিরাত। আমি শুনেছি তুমি নাকি তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' তনয় বলে ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই 'যাতুন নিতাকাইন'। আমি একটি নিতাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকরের (রা) খাবার বেঁধেছি। আরেকটি নিতাক আমার কোমরেই আছে।[৬২] একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ আসমার (রা) নিকট এসে বলে : মা, আমীরুল মু'মিনীন আপনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? আসমা' (রা) অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন : আমি তোমার মা নই। আমি রাস্তার মাথায় শূলীতে ঝোলানো ব্যক্তির মা। আমার কোন প্রয়োজন নেই।[৬৩]

হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাতের পর একদিন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) বলা হলো : আসমা' (রা) মসজিদের এক কোণে বসে আছেন। তিনি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে বললেন : এই প্রাণহীন দেহ কিছুই না। রূহ তো আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ধৈর্য অবলম্বন করুন। আসমা' বললেন : আমাকে তা করতে কিসে বারণ করেছে? নবী ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়ার (আ) মাথাও বনী ইসরাঈলের এক পতিতাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল।[৬৪]

---

৬১. সাহীহ মুসলিম, ফাদায়িল আস-সাহাবা, হাদীছ নং-২৫৪৫; তাবাকাত-৮/২৫৪; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৬

৬২. তাবাকাত-৮/২৫৪; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-৩/১৩৬

৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৪

৬৪. প্রাগুক্ত-২/২৯৫; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৩০

উল্লেখ্য যে, ফিলিস্তীনের শাসক হিরোডিয়ান তার ফুফু হিরোডাসকে বিয়ে করতে চাইলে ইয়াহইয়া বাধ সাধেন। কারণ, তাঁদের ধর্মে ফুফু-ভাতিজার বিয়ে সিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কন্যা হিরোডাস ও তার মার সম্মতি ছিল। তারা হিরোডিয়ানকে শর্ত দিল, যদি তুমি ইয়াহইয়ার মাথাটি কেটে একটি থালায় করে আমার সামনে আনতে পার তাহলে এ বিয়ে হবে। সে তাই করেছিল। হযরত আসমা' (রা) উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৬৫]

হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ কয়েক দিন যাবত ঝোলানো অবস্থায় থাকার পর আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের নির্দেশে নামানো হয়। ছেলের লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকার সময় হযরত আসমা' (রা) আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন এই বলে যে, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর গোসল দেওয়া ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থার না করে যেন আমার মৃত্যু না হয়। লাশ নামানোর পর আসমা' (রা) তা চেয়ে এনে অতিকষ্টে যমযমের পানি দিয়ে গোসল দেন।[৬৬] মাংস পঁচে-গলে গিয়েছিল। আসমা (রা) নিজের ছেলের এ অবস্থা দেখেও মোটেই ভেঙ্গে পড়েননি। ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

ইবন মুলাইকা বলেন : গোসলের দায়িত্ব যাদের উপর পড়েছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা একটি অংগ ধরছিলাম, আর আমাদের হাতের সাথে চলে আসছিল। সেটি ধুয়ে আমরা কাফনের উপর রেখে আরেকটি অংগ ধরছিলাম। এভাবে আমরা তাঁর গোসল সম্পন্ন করি। তারপর তাঁর মা আসমা' দাড়িয়ে জানাযার নামায পড়েন। মক্কার আল-মু'আল্লাত গোরস্তানে তাঁকে দাফন করেন।[৬৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হিজরী ৭৩ সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার শাহাদাত বরণ করেন। এর কয়েকদিন পরে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় হযরত আসমা'ও (রা) ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছর। মুহাজির পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৮] এ দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি বা সামান্য বুদ্ধিভ্রষ্টতাও দেখা যায়নি। মক্কায় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর (রা) পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৬৯]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই বলে অসীয়াত করে যান যে, তোমরা আমার পরিধেয় বস্ত্র সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে তাতে সেঁক দেবে, তারপর আমার দেহে খোশবু লাগাবে। আমার কাফনের কাপড়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না, আগুন নিয়ে লাশের অনুসরণ করবে না এবং আমাকে রাতের বেলা দাফন করবে না।[৭০]

---

৬৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৫; টীকা-১; কাসাসুল আম্বিয়া-৩৬৯

৬৬. যাদুল মা'আদ-১/১৪০; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/৫০৩; আল-ফাকিহী বলেন : বরকত হিসেবে মক্কাবাসীরা তাদের মৃতদের যমযমের পানি দিয়ে গোসল করাতো। (নিসা' মুবাশ্‌শারাত ফিল জান্নাহ্-২৬৬

৬৭. আ'লাম আন-নিসা'-১/৫২; বানাত আস-সাহাবা-৭১

৬৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৬; আ'লাম আন-নিসা-১/৫২, ৫৩

৬৯. বানাত আস-সাহাবা-৭২

৭০. তাহ্‌যীব-আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৮

উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান (রা)

ডাক নাম উম্মু সুলাইম। আসল নামের ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যথা: সাহ্‌লা, রুমাইলা, মুলাইকা, আল-গুমাইসা' ও আর-রুমাইসা'। বানু নাজ্জারের প্রখ্যাত মহিলা আনসারী সাহাবী। প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) অতি স্নেহের খাদেম হযরত আনাসের গর্বিত মা। পিতার নাম মিলহান ইবন খালিদ এবং মাতার নাম মুলাইকা বিন্‌তে মালিক ইবন 'আদী ইবন যায়দ ইবন মানাত। অন্য একটি বর্ণনায় 'উনাইকা' বলা হয়েছে।[১] ঐতিহাসিক বীরে মা'উনার ঘটনায় শাহাদাত প্রাপ্ত অন্যতম সাহাবী হযরত হারাম ইবন মিলহান তাঁর ভাই।[২] ইতিহাসে তিনি উম্মু সুলাইম নামে প্রসিদ্ধ।

জাহিলী যুগে প্রথম জীবনে তিনি মালিক ইবন নাদারকে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে তারই ঔরসে পুত্র আনাসের জন্ম হয়। আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর স্বামী মালিক তাঁকে ও তাঁর সন্তানকে ফেলে দেশান্তরী হয়।[৩]

এ সম্পর্কে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। উম্মু সুলাইম একদিন স্বামী মালিকের নিকট এসে বললেন : আজ আমি এমন একটি খবর নিয়ে এসেছি যা তোমার পছন্দ নয়। মালিক বললেন : তুমি তো সব সময় এই বেদুঈনের কাছ থেকে আমার অপছন্দনীয় বার্তাই এনে থাক। স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে তিনি বললেন : হাঁ, তিনি বেদুঈন, তবে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করে নবী বানিয়েছেন। মালিক জানতে চাইলো : তা আজ কী খবর আনলে, শুনি। বললেন : মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। মালিক বললো : তোমার ও আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ হলো। তারপর সে ঘর-সংসার ও স্ত্রী পুত্র সবকিছু ছেড়ে শামে চলে যায় এবং সেখানেই পৌত্তলিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[৪]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় মালিকের সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার অনেক পরে যখন মদ হারাম হয়। পক্ষান্তরে হযরত আবু তালহার (রা) সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে যত বর্ণনা এসেছে, সেগুলি দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই তিনি আবু তালহাকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার এমন বর্ণনাও দেখা যায় যে, মদীনায় খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতেই আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপরই উম্মু সুলাইম তাঁকে বিয়ে করেন। এমনি

---

১. আল-ইসাবা-৪/৪৬১, ৪৬২, তাবাকাত-৩/৫০৪
২. হায়াতুস সাহাব (আরবী)-১/৫২৮
৩. আল-ইসাবা-৪/৪৬১
৪. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০; আল-ইসাবা-৪/৪৬১; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৫

ধরনের নানাবিধ বর্ণনা দেখা যায়। তবে একথা স্বীকৃত যে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নে আবু তালহার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কিত দুই একটি বর্ণনা তুলে ধরছি। আনাস থেকে বর্ণিত। আবু তালহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে উম্মু সুলাইম বলেন : আবু তালহা, আপনি কি জানেন না, যে ইলাহ্‌র ইবাদাত আপনি করেন তা মাটি দ্বারা তৈরী? তিনি বললেন : তা ঠিক। উম্মু সুলাইম আবার বললেন : একটি গাছের পূজা করতে আপনার লজ্জা হয় না? আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার সাথে বিয়েতে আমার আপত্তি থাকবে না। আর সে ক্ষেত্রে আপনার ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মোহরের দাবীও আমার থাকবে না। 'বিষয়টি আমি ভেবে দেখবো'– একথা বলে আবু তালহা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে পাঠ করলেন ঃ 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ'।

অতঃপর উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে ডেকে বললেন : আনাস! আবু তালহার বিয়ের ব্যবস্থা কর। আনাস তাঁর মাকে আবু তালহার সাথে বিয়ে দিলেন। ঘটনাটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

অন্য একটি বর্ণনা এসেছে, আনাস বললেন : আবু তালহা বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম তাঁকে বললেন : আমি এ ব্যক্তির ওপর ঈমান এনেছি এবং ঘোষণা দিয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার অনুসারী হলে আপনাকে বিয়ে করতে পারি। আবু তালহা বললেন : বেশ তো, তোমার ধর্ম আমিও গ্রহণ করলাম। এরপর উম্মু সুলাইম তাঁকে বিয়ে করেন। আবু তালহার ইসলামই ছিল এ বিয়ের মোহর। এ সনদে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু তালহা প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম বললেন : আনাস বালেগ হয়ে বিভিন্ন মজলিসে বসার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় বিয়ে করবো না। আনাস বলেন, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে মাকে প্রতিদান দিন। তিনি আমাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন। উম্মু সুলাইমের কথা শুনে আবু তালহা বললেন : আনাস তো মজলিসে বসেছে এবং কথাও বলেছে। অতঃপর আনাস তাঁর মাকে বিয়ে দেন।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মু সুলাইম বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আবু তালহা তাঁকে বললেন : আল্লাহর কসম, এ হয়তো তোমার মনের কথা নয়। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন : তোমার ইচ্ছা, সোনা-রূপা পাওয়া? উম্মু সুলাইম তখন বললেন : আমি আপনাকে ও আল্লাহর নবীকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে আপনার ইসলামের বিনিময়েই আমি বিয়েতে রাজী আছি। একথা শুনে আবু তালহা বললেন : এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে কে? উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে বললেন : আনাস, তুমি তোমার চাচার সাথে যাও। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আনাস বলেন : আবু তালহা আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং এ অবস্থায় আমরা চললাম। যখন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটবর্তী হলাম, তিনি আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বলে

---

৫. হায়াতুস সাহাবা-১/১৯৬; আল-ইসাবা-৪/৪৬১; তাবাকাত-৩/৫০৪; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৫

ওঠেন : এই যে আবু তালহা, তার দু'চোখের মাঝখানে তো ইসলামের সম্মান ও গৌরব দীপ্তিমান। আবু তালহা নবীকে (সা) সালাম দিয়ে বললেন : আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু। অতঃপর ইসলামের বিনিময়েই রাসূল (সা) তাঁকে উম্মু সুলাইমের সাথে বিয়ে দেন।

উম্মু সুলাইমের প্রথম স্বামীর পক্ষে আনাস এবং দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবু তালহার পক্ষে দু'ছেলে (১) আবু 'উমাইর ও (২) 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। আবু 'উমাইর শৈশবে মারা যায়। অপর দু'জনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়।

আবু 'উমাইরের মৃত্যুতে উম্মু সুলাইম যে ধৈর্য অবলম্বন করেন তা মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয়। আবূ 'উমাইর যখন মারা যায় তখন সে কেবল হাঁটতে শিখেছে। ছোট ছোট পা ফেলে যখন সে হাঁটে বাবা-মা অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। ছেলেটি আবু তালহার খুব আদরের ছিল।

অসুস্থ ছেলেকে ঘরে রেখে আবু তালহা কোন কাজে বাইরে গেছেন। এর মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মা উম্মু সুলাইম বাড়ীর অন্য লোকদের বলে রাখলেন, আবু তালহা ফিরে এলে কেউ যেন তাঁকে ছেলের মৃত্যুর খবরটি না দেয়। আবু তালহা ঘরে ফিরে এসে অসুস্থ ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। উম্মু সুলাইম বললেন : যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। স্ত্রীর কথায় আবু তালহা মনে করলেন, ছেলে ভালো আছে। তিনি যথারীতি পানাহার সেরে বিছানায় গেলেন। উম্মু সুলাইমও কাজ সেরে সেজে-গুজে সুগন্ধি লাগিয়ে বিছানায় গেলেন। স্বামী-স্ত্রী গভীর সান্নিধ্যে আসলেন। এরপর উম্মু সুলাইম স্বামীকে ছেলের মৃত্যুর খবর এভাবে দেন : আবু তালহা, যদি কেউ আপনার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখে এবং পরে তা ফেরত নিতে আসে তখন কি তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন? আবু তালহা বললেন : 'কক্ষণো না'। উম্মু সুলাইম বললেন : তাহলে বলছি, ছেলের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আবু তালহা জানতে চাইলেন : সে এখন কোথায়? বললেন : এই যে গোপন কুঠরীতে। আবু তালহা সেখানে ঢুকে মুখের কাপড় উঠিয়ে ইন্না লিল্লাহ পাঠ করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে, আবু তালহা ফিরে আসার আগেই উম্মু সুলাইম মৃত ছেলেকে দাফন করে দেন।

এরপর আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে ছেলের মৃত্যু এবং উম্মু সুলাইমের আচরণের কথা তাঁকে বলেন। রাসূল (সা) সবকিছু শুনে মন্তব্য করেন : আল্লাহ তায়ালা আজকের রাতটি তোমাদের জন্য বরকতময় করেছেন। যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ! আল্লাহ তার রিহমে (গর্ভে) একটি 'জিকর' নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে সে তার ছেলের মৃত্যুতে এত কঠিন ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে।[৭] এ রাতে তাঁদের মিলনে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তিনিই 'আবদুল্লাহ

---

৬. আল-ইসাবা-৪/৪৬১; দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৩য় খণ্ড)-১১১

৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯০; মুসলিম-২/৩৪২; আল-ইসাবা-৪/৪৬১

ইবন তালহা। আল্লাহ তাঁকে অনেক সন্তান-সন্ততি দান করেন।[৮] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) সেদিন এই দম্পতির জন্য এই বলে দু'আ করেছিলেন : 'হে আল্লাহ, এ দু'জনের এ রাতটির মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দিন।'

অতঃপর উম্মু সুলাইম সন্তান প্রসব করলেন। রাসূল (সা) এ খবর পেয়ে আনাসকে বলেন : তোমার মায়ের কাছে যেয়ে বল, সন্তানের নাড়ি কাটার পর আমার কাছে না পাঠিয়ে তার মুখে যেন কিছুই না দেয়। আনাস বলেন : আমার মা ছেলেকে আমার হাতে তুলে দেন এবং আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এনে রাখি। তারপর রাসূল (সা) আনাসকে তিনটি 'আজওয়া খেজুর আনতে বলেন। আনাস তা নিয়ে এলে তিনি সেগুলির আঁটি ফেলে দিয়ে নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ভালো করে চিবান। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে কিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। শিশুটি মুখ নেড়ে চুষতে থাকে। তা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন : 'আমার আনসাররা খেজুর পছন্দ করে'। তারপর শিশুটিকে আনাসের হাতে দিয়ে বলেন : তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। রাসূল (সা) শিশুটির নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। তিনি এই বলে শিশুটির জন্য দু'আও করেন যে, আল্লাহ তাকে নেককার মুত্তাকী করুন। আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন : আমি এ 'আবদুল্লাহর নয় সন্তানকে দেখেছি, তারা সবাই কুরআনের এক একজন বড় কারী।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পরপরই উম্মু সুলাইম ছোট্ট ছেলে আনাসের হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলেন :'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই থাকলো আনাস। সে আপনার খিদমত করবে'। আনাস তখন দশ বছরের বালক মাত্র। তখন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত পর্যন্ত আনাস তাঁর খিদমত করেন। এ কারণে তিনি 'খাদিমুন নাবী (সা)' খ্যাতি অর্জন করেন।[১০] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও 'আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) তার জন্য দু'আও করেন।[১১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, একটি বর্ণনা মতে সে বৈঠকটি হয়েছিল উম্মু সুলাইমের বাড়ীতে। হযরত উম্মু সুলাইম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বড় বড় যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে শরীক হয়েছেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে উম্মু সুলাইম ও অন্য কতিপয় আনসারী মহিলাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁরা সৈনিকদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা করতেন।[১২] তিরমিযীও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় হয় তখনও তিনি অতি সাহসিকতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। আনাস (রা) বলেন : আমি 'আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে মশক ভরে পানি এনে

---

৮. আল-ইসাবা-৪/৪৬১; দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৩য় খণ্ড)-১১৫
৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯০-৫৯১; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৬
১০. আল-ইসাবা-৪/৪৬২
১১. মুসলিম-২/৯৪৪; বুখারী-২/৩০২
১২. মুসলিম-২/১০৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯২-৫৯৩

আহতদের পান করাতে দেখেছি। মশক খালি হয়ে গেলে তারা আবার ভরে এনে পান করিয়েছেন।[১৩]

হিজরী ৭ম সনে খাইবার যুদ্ধেও তিনি যান। খাইবারে অথবা খাইবার থেকে ফেরার পথে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে হযরত সাফিয়্যার (রা) শাদী মুবারক ও বাসর অনুষ্ঠিত হয়। তিনিই হযরত সাফিয়্যাকে চুল বেঁধে সাজ-গোজ করিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থাপন করেন।[১৪]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইন যুদ্ধে উম্মু সুলাইম খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় যুদ্ধের মধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নজরে পড়লেন। তিনি তখন কোমরে চাদর পেঁচিয়ে স্বামী আবু তালহার পাশে দাঁড়িয়ে। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী তালহা তখন তাঁর পেটে। তাঁর সাথে আবু তালহার উট। উটটি বশে আনার জন্য তারা মাথার কেশ ও লাগামের মধ্যে হাত দিয়ে রেখেছেন। রাসূল (সা) ডাকলেন : উম্মু সুলাইম? তিনি সাড়া দিলেন : হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে, আপনি যেভাবে তাদের হত্যা করছেন, আমিও ঠিক সেভাবে যারা আপনাকে ছেড়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাবে তাদের হত্যা করবো। কারণ, তারা হত্যারই উপযুক্ত। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম! আল্লাহ কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নন? উম্মু সুলাইমের হাতে তখন একটি খঞ্জর। সেদিকে ইঙ্গিত করে আবু তালহা বললেন : উম্মু সুলাইম তোমার হাতে এ খঞ্জর কেন? বললেন : কোন মুশরিক (পৌত্তলিক) আমার নাগালের মধ্যে এলে এ খঞ্জর দিয়ে আমি তার পেট ফেঁড়ে ফেলবো। এ কথা শুনে আবু তালহা বললেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মু সুলাইম আর-রুমাইসা' যা বলছে তাকি শুনেছেন! এতে রাসূল (সা) মৃদু হেসে দেন।[১৫]

হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের (রা) বিয়ে হয়। এ উপলক্ষে উম্মু সুলাইম নিজ হাতে অতি সুন্দর কারুকাজ করা পশমী পোশাক তৈরী করে ছেলে আনাসের হাতে পাঠিয়ে দেন। রাসূল (সা) যেন তার এ ছোট্ট উপহার গ্রহণ করেন– এ কথাটি বলার জন্যও তিনি আনাসকে তাকীদ দেন।[১৬]

হযরত উম্মু সুলাইম মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদ্য তৈরী করে পাঠাতেন। নিজের বাড়ীতে ভালো কিছু তৈরী হলে তার কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) জন্যও পাঠাতেন। আবু হাতেম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক স্ত্রীর সাথে প্রথম মিলন উপলক্ষে উম্মু সুলাইম 'হাইস' (খেজুর, আকিত ও চর্বি দ্বারা তৈরী) নামক এক প্রকার খাবার তৈরী করে পিতল বা কাঠের পাত্রে ঢালেন। তারপর ছেলে আনাসকে ডেকে বলেন : এটা

১৩. বুখারী-কিতাবুল মাগাযী-২/৫৮১
১৪. সহীহ মুসলিম-১/৫৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০; আল-ইসাবা-৪/৪৬২
১৫. মুসলিম-২/১০৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭; আল-ইসাবা-৪/৪৬১
১৬. মুসলিম-১/৫৫০

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। আনাস বলেন : মানুষ সে সময় দারুণ অন্ন কষ্টে ছিল। আমি পাত্রটি নিয়ে যেয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা উম্মু সুলাইম আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালামও পেশ করেছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। রাসূল (সা) পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন : ওটা ঘরের এক কোণে রাখ এবং অমুক অমুককে ডেকে আন। তিনি অনেক লোকের নাম বললেন। তাছাড়া আরও বললেন : পথে যে মুসলমানের সাথে দেখা হবে, সাথে নিয়ে আসবে। আনাস বলেন : যাদের নাম তিনি বললেন তাদেরকে তো দাওয়াত দিলাম। আর পথে আমার সাথে যে মুসলমানের দেখা হলো তাদের সকলকেও দাওয়াত দিলাম। আমি ফিরে এসে দেখি রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা বাড়ী, সুফ্‌ফা ও হুজরা— সবই লোকে লোকারণ্য।

বর্ণনাকারী আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন : তা কত লোক হবে? বললেন : প্রায় তিন শো। আনাস বলেন : রাসূল (সা) আমাকে খাবার পাত্রটি আনতে বললেন। আমি কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন : তোমরা দশজন দশজন করে বসবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে খাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত সবাই পেট ভরে খেলো। তারপর তিনি আমাকে বললেন : পাত্রটি উঠাও। আনাস বলেন : আমি এগিয়ে এসে পাত্রটি উঠালাম। তার মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি বলতে পারবো না, যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল না যখন উঠালাম।[১৭]

অন্য একটি ঘটনা আনাস তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মার একটি ছাগী ছিল। তার দুধ থেকে ঘি তৈরী করে একটি চামড়ার পাত্রে ভরেন। একদিন পাত্রটি রাবীবার হাতে দিয়ে বলেন, এটা রাসূলাল্লাহকে (সা) দিয়ে এসো, তিনি তরকারি হিসেবে খাবেন। রাবীবা সেটি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক উক্‌কা বা পাত্র ঘি উম্মু সুলাইম পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) লোকদের বললেন, তোমরা ঘি ঢেলে রেখে পাত্রটি তাঁকে ফেরত দাও। খালি পাত্রটি তাঁকে ফেরত দেওয়া হলো। তিনি পাত্রটি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন উম্মু সুলাইম বাড়ীতে নেই। তিনি পাত্রটি একটি খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। উম্মু সুলাইম বাড়ী এসে দেখেন পাত্রটি হতে ঘি উপচে পড়ছে। তিনি বললেন : রাবীবা, আমি কি তোমাকে এটা রাসূলুল্লাহকে (সা) দিয়ে আসতে বলিনি? রাবীবা বললেন : আমি তো আপনার কথা পালন করেছি। যদি বিশ্বাস না হয় আমার সাথে চলুন, রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করুন। উম্মু সুলাইম রাবীবাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর মাধ্যমে এক পাত্র ঘি পাঠিয়েছিলাম। রাসূল (সা) বললেন: হাঁ, সে তা দিয়েছে। উম্মু সুলাইম তখন বললেন : যিনি আপনাকে সত্য এবং সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, সে সত্তার শপথ। পাত্রটি তো এখনও ঘি-ভরা এবং তা উপচে পড়ছে। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম!

---

১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬০-৬৬১

আল্লাহ তোমাকে খাওয়ান যেভাবে তুমি তাঁর নবীকে খাইয়েছো, এতে কি তুমি বিস্মিত হচ্ছো? নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। উম্মু সুলাইম বলেন : আমি বাড়ী ফিরে এসে তা কয়েকটি গ্লাসে ভাগ করে রাখলাম এবং এক অথবা দু'মাস যাবত আমরা তা খেয়েছি।[১৮]

ইমাম মুসলিম আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেন : একদিন আবু তালহা আমার মা উম্মু সুলাইমকে বললেন, আজ আমি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল শুনতে পেলাম। মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? মা বললেন : আছে। তিনি কয়েক টুকরো রুটি আমার কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। আমাকে দেখেই রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : আবু তালহা পাঠিয়েছে? বললাম : হাঁ। বললেন : খাবার? বললাম : হাঁ। রাসূল (সা) সাথের লোকদের বললেন : তোমরা ওঠো। তাঁরা উঠলেন এবং আমি তাঁদের আগে আগে চললাম। আবু তালহা সকলকে দেখে স্ত্রীকে ডেকে বললেন : উম্মু সুলাইম, দেখ, রাসূল (সা) লোকজন সংগে করে চলে এসেছেন। সবাইকে খেতে দেওয়ার মত খাবার তো নেই। উম্মু সুলাইম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সে কথা ভালোই জানেন। আবু তালহা অতিথিদের নিয়ে বসালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বললেন : যা আছে নিয়ে এসো। সামান্য খাবার ছিল তাই হাজির করা হলো। তিনি বললেন : প্রথমে দশজনকে আসতে বল। দশজন ঢুকে পেট ভরে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর দশজন। এভাবে মোট সত্তর অথবা আশিজন লোক পেট ভরে সেই খাবার খেয়েছিল।[১৯]

তিনি নবী কারীমকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন। নবী কারীমও (সা) প্রায়ই উম্মু সুলাইমের গৃহে যেতেন এবং দুপুরে সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ সুযোগে উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) ঘাম ও ঝরে পড়া লোম সংগ্রহ করতেন।[২০]

আনাস (রা) বলেন : একদিন দুপুরে রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিলেন এবং ঘেমে গেলেন। আমার মা একটি বোতল এনে সেই ঘাম ভরতে লাগলেন। রাসূল (সা) জেগে উঠে বললেন : উম্মু সুলাইম, একি করছো? মা বললেন : আপনার এ ঘাম আমাদের জন্য সুগন্ধি। আনাস বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ঘামের সুগন্ধি থেকে অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত মিশ্‌ক অথবা আম্বর আমার জীবনে আর শুকিনি।[২১] আনাস আরও বলেন : আমার মা উম্মু সুলাইমের আবু তালহার পক্ষের আবু 'উমাইর নামে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এলে তার সাথে একটু রসিকতা করতেন। একদিন দেখলেন আবু 'উমাইর মুখ ভার করে বসে আছে। রাসূল (সা) বললেন : আবু 'উমাইর, এমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন? মা বললেন : তার খেলার সাথী 'নুগাইর'টি মারা গেছে। তখন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে দেখলে কাব্যি করে বলতেন :

১৮. আল-বিদায়া-৬/১০২; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৫
১৯. বুখারী-২/৩৪২; মুসলিম-২/১৭৮; আল-বিদায়া-৯/১০৫; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৩-১৯৪
২০. বুখারী-২/৯২৯
২১. তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৪,১৪৫

'ইয়া আবা 'উমাইর, মা ফা'য়ালান নুগাইর'– ওহে আবু 'উমাইর, তোমার নুগাইরটি কি করলো? উল্লেখ্য যে, 'নুগাইর' লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই-এর মত এক প্রকার ছোট্ট পাখী।[২২]

আনাস (রা) বলেন : রাসূল (সা) তাঁর সহধর্মিনীদের ঘর ছাড়া একমাত্র উম্মু সুলাইমের ঘরে যেভাবে গেছেন সেভাবে আর কোথাও যাননি। একবার রাসূলকে (সা) এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হয়। তার বাবা ও ভাই আমার সাথে থেকে শহীদ হয়েছে।[২৩] ইবন হাজার বলেন : উম্মু হারাম ও তাঁর বোন উম্মু সুলাইমের গৃহে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রবেশের উত্তর হলো, তারা দু'জন একই বাড়ীতে থাকতেন এবং উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে যেতেন।[২৪]

উম্মু সুলাইম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর-এর নসব 'আমির ইবন গানাম-এ গিয়ে আনাসের মার বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।[২৫] তিনি অন্তর দিয়ে রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। আর রাসূলও (সা) তাঁর কথা কখনও বিস্মৃত হননি। এই সম্মানিত মহিলাকে রাসূল (সা) জান্নাতের সুসংবাদও দান করেছেন।[২৬]

হযরত উম্মু সুলাইমের সম্মান ও মর্যাদা অনেক। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি জান্নাতে যেয়ে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। জানতে চাই এ মহিলা কে? আমাকে জানানো হয়, আনাসের মা গুমাইসা বিনতু মিলহান।[২৭]

হযরত উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবন মালিক, ইবন 'আব্বাস, যায়দ ইবন ছাবিত, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ও আরও অনেক সাহাবী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। জনসাধারণ তাঁর কাছে জরুরী দীনী মাসায়িল জিজ্ঞেস করতো। একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের মধ্যে একটি বিবাদ দেখা দিলে তাঁরা উভয়ে তাঁকেই বিচারক মানেন।[২৮]

তিনি কোন দীনী বিষয় জানার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করতে লজ্জা পেতেন না। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন : আনসারদের মেয়েরা কত ভালো। দীনী বিষয়ে প্রশ্ন করতে এবং দীনকে জানার ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখতে পারেনা। ইমাম আহমাদ উম্মু সুলাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী উম্মু সালামার পাশাপাশি ছিলাম। আমি প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মহিলা যদি ঘুমের মধ্যে দেখে যে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করছে, তাহলে তাকে কি গোসল করতে হবে?

---

২২. প্রাগুক্ত ৩/১৩৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০, ৫৭১; তাবাকাত-৩/৫০৬
২৩. মুসলিম-২/৩৪১; আল-ইসাবা-৪/৪৬১
২৪. আল-ইসাবা-৪/৪৬১
২৫. উসুদুল গাবা-১/১২৭; আসাহহুস সীয়ার-৬০৬
২৬. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসরলামিয়্যা (উর্দু)-৩/৪০২
২৭. মুসলিম-২/৩৪২
২৮. মুসনাদ-৬/৪৩১; আল-ইসাবা-৪/৪৬২

প্রশ্ন শুনে উম্মু সালামা বলে উঠলেন : উম্মু সুলাইম, তোমার দু'হাত ধুলিমলিন হোক! রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গোটা নারীকুলকে তুমি লজ্জা দিলে। উত্তরে উম্মু সুলাইম বললেন : সত্য প্রকাশে আল্লাহ লজ্জা পাননা। কোন সমস্যার ব্যাপারে অন্ধকারে থাকার চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করাই উত্তম। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম! তোমার দু'হাত ধুলিমলিন হোক। তার ওপর গোসল ফরজ হবে, যদি সে ঘুম থেকে জেগে পানি দেখতে পায়। উম্মু সুলাইম আবার প্রশ্ন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েদেরও কি পানি আছে? নবী (সা) বললেন : যদি পানিই না থাকবে তাহলে সন্তান তার মত হয় কি করে? তারা তো পুরুষেরই মত।[২৯]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : একবার আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই ছোট্ট খাদিমটার জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) দু'আ করলেন 'হে আল্লাহ! তুমি তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান কর। তাকে দীর্ঘজীবী কর এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দাও'। শেষ জীবনে আনাস বলতেন, আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে ৯৮ মতান্তরে ১০২ জনকে শুধু কবরই দিয়েছি। আমার বাগিচায় বছরে দু'বার করে ফুল আসে। এত দীর্ঘ জীবন পেয়েছি যে, জীবনের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। আর চতুর্থটির অর্থাৎ গুনাহ্ মাফের আশায় আছি।[৩০]

হযরত আনাস প্রতিদিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করে দুপুরে বাড়ী ফিরতেন। একদিন দুপুরে বাড়ীর দিকে চলেছেন। পথে দেখলেন তাঁরই সমবয়সী ছেলেরা খেলছে। তাঁর কাছে খেলাটি ভালো লাগলো। তিনি দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, রাসূল (সা) তাদের দিকে আসছেন। তিনি এসে আনাসের হাতটি ধরে কোন কাজে পাঠালেন। আনাস ফিরে এলে রাসূল (সা) বাড়ীর দিকে চললেন। আনাসের বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ায় তাঁর মা উম্মু সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরী হলো কেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন কাজে গিয়েছিলাম। এজন্য ফিরতে দেরী হয়েছে। মা মনে করলেন, ছেলে হয়তো সত্য গোপন করছে। এজন্য জানতে চাইলেন : কী কাজ? আনাস জবাব দিলেন : একটি গোপন কথা, কাউকে বলা যাবে না। মা বললেন : তাহলে গোপনই রাখ, কারও কাছে প্রকাশ করোনা।[৩১] হযরত আনাস আজীবন এ সত্য গোপন রেখেছেন।

এভাবে উম্মু সুলাইমের জীবনের অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা খুবই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

---

২৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/২২১,২২২

৩০. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৭, ৬৩৩

৩১. আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/২০৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৩; ২/৫০৩

উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা)

হযরত উম্মু হারাম (রা)-এর আসল নাম জানা যায় না। এ তাঁর ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা। পিতা মিলহান ইবন খালিদ। মাতার দিক দিয়ে তিনি হযরত উম্মু সুলাইমের(রা) বোন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের খালা। আর দুধপানের দিক দিয়ে ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খালা।[১]

মদীনার নাজ্জার খান্দানের মিলহানের পরিবারটি ছিল একটি অতি সৌভাগ্যবান পরিবার। মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনালগ্নে এ পরিবারের সদস্যগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। আল্লাহ ও রাসূলের (সা) গভীর প্রেম ও ভালোবাসা এ পরিবারের সদস্যবর্গের অন্তরের অন্তমূলে গেঁড়ে বসে। তাদের নারী-পুরুষ সকলে জিহাদ, জ্ঞানচর্চা, ইসলামের সেবায় জীবন দান, বদান্যতা প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মিলহানের দুই ছেলে হারাম ও সুলাইম (রা) বদর ও উহুদের যোদ্ধা ছিলেন। উভয়ে বি'রে মা'উনার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। হারাম ইবন মিলহানের (রা) জীবনের বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর ঘাতক জাব্বার ইবন সুলামীকে মুসলমান বানিয়ে যেতে সক্ষম হন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকম : জাব্বার ইবন সুলামী হারামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে তাঁর বক্ষ ভেদ করে যায় এবং তিনি জোরে فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ উচ্চারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বাক্যটির অর্থ 'কা'বার প্রভুর শপথ, আমি কামিয়াব হয়েছি।' অর্থাৎ শাহাদাত লাভে কামিয়াব হয়েছি। ঘাতক জাব্বার যখন فُزْتُ শব্দের অর্থ জানলো তখন তার মধ্যে ভাবান্তর হলো। সে তাওবা করে ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। হযরত হারাম ইবন মিলহানের (রা) জীবনের সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্যটি হযরত জাব্বার ইবন সুলামীর (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে যায়।[২]

মদীনার যে সকল মহিয়সী নারী হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যে নিজেদের চারিত্রিক শোভা আরো উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিলহানের দুই কন্যা উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম। কেবল 'আত-তাহযীব' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, উম্মু হারামের (রা) প্রথম স্বামী 'আমার ইবন কায়স আল-আনসারী।[৩] তবে অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁর স্বামীর নাম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উবাদা ইবন আস-সামিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন সা'দের ধারণা, 'উবাদা ইবন আস-সামিত তাঁর প্রথম স্বামী এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী 'আমর ইবন কায়স।[৪] তবে নির্ভরযোগ্য সীরাতের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে জানা

---

১. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-৩/৭৩
২. বুখারী : বাবুর রাজী'; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৪২
৩. আত-তাহযীব-১২/৪৬
৪. তাবাকাত-৮/২৬৮

যায় যে, 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) তাঁর সর্বশেষ স্বামী।[৫] এই 'উবাদা (রা) একজন প্রথমপর্বের মহান আনসারী সাহাবী, আকাবার সদস্য, নাকীব, বদর-উহুদ-খন্দকের সাহসী মুজাহিদ এবং বাই'আতু রিদওয়ানসহ উল্লেখযোগ্য সকল ঘটনার অংশীদার। হিজরী ৩৪ সনে ফিলিস্তীনের রামলায় ইনতিকাল করেন।[৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে দুই মাইল[৭] দূরে তাকওয়া ও খোদাভীতির উপর ভিত্তি করে যে মসজিদটি নির্মাণ করেন সেটি হলো– মাসজিদুল কুবা'। এ মসজিদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এ আয়াত :[৮]

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ.

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর, তাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য।'

ইসলামের ইতিহাসে এ মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত ইবন 'উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বাহনে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে এ মসজিদে আসতেন এবং এখানে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।[৯] কুবার এই পবিত্র মসজিদের পাশে ছিল উম্মু হারামের পরিবারের বসবাস। রাসূল (সা) হযরত উম্মু হারামকে (রা) যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে বিশ্রামও নিতেন।[১০] মাঝে মাঝে নামাযও আদায় করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন : একদিন নবী (সা) আমাদের নিকট আসলেন। তখন বাড়ীতে কেবল আমি, আমার মা (উম্মু সুলাইম) ও আমার খালা উম্মু হারাম ছিলাম। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা এসো, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করি। তখন কোন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। তিনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন এবং আমাদের পরিবারের সকলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন।[১১] একবার রাসূল (সা) উম্মু হারামের (রা) গৃহে এলে তিনি খাবার তৈরী করে তাঁকে খাওয়ান। আহার শেষে একটু বিশ্রাম নিতে থাকেন, আর উম্মু হারাম (রা) রাসূলের (সা) মাথার চুল বিলি দিয়ে উকুন দেখতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় রাসূলের (সা) একটু হালকা ঘুমের ভাব এসে যায়। একটু পরে জেগে উঠে মৃদু হেসে উম্মু হারামকে (রা) শাহাদাতের সুসংবাদ দান করেন। আর সেদিন থেকেই তাঁকে "আল-শাহীদা" (মহিলা শহীদ) বলা হতে থাকে। রাসূল (সা) শাহাদাতের সুসংবাদ অপর যে মহিলাকে দান করেন তিনি হলেন উম্মু ওয়ারাকা আল-আনসারিয়্যা (রা)। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন বানূ

---

৫. সাহাবিয়াত-২১০
৬. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৫৬, ২৫৭; আল-আ'লাম-৩/২৫৮
৭. মু'জামুল বুলদান-৪/৩০২
৮. সূরা আত-তাওবা-১০৮; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যাহ্-৩/৭৩
৯. সাহীহ মুসলিম-৪/১২৭
১০. উসুদুল গাবা-৫/৫৭৪; আল-ইসতী'আব-৪/৪২৪; আয-যাহাবী : তারীখ-৩/৩১৭; আল-ইসাবা-৪/৪৪১
১১. সাহীহ মুসলিম-২/১২৮

নাজ্জারের কন্যা। তাই উম্মু হারাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খালা সম্পর্কীয়া হওয়ার কারণে মাহরামা ছিলেন। আর তাই তিনি রাসূলের (সা) মাথা স্পর্শ করে উকুন খুঁটতে পেরেছেন।[১২]

ইমাম আত-তিরমিযী হযরত আনাস ইবন মালিকের বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু হারামের গৃহে আসতেন এবং তিনি রাসূলকে (সা) আহার করাতেন। উম্মু হারাম ছিলেন 'উবাদা ইবন আস-সামিতের স্ত্রী। একদিন রাসূল (সা) আসলেন। তাঁকে আহার করালেন। তারপর রাসূলের (সা) মাথার চুল বিলি দিয়ে উকুন দেখতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) ঘুমিয়ে গেলেন। একটু পরে জাগলেন এবং মৃদু হাসলেন। উম্মু হারাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাসলেন কেন? বললেন : ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখানো হলো, আমার উম্মাতের কিছু লোক জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য জলযানে আরোহী হয়েছে। উম্মু হারাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।

এরপর রাসূল (সা) মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মৃদু হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম আবার প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাসছেন কেন? জবাবে রাসূল (সা) পূর্বের কথাটিই বললেন। উম্মু হারামও আগের মত আরজ করলেন। এবার রাসূল (সা) বললেন : أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ - তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।

সময় গড়িয়ে চললো। রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা আবূ বকর ও 'উমার (রা) একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ইসলামী খিলাফতের সীমা সরহদের দারুণ বিস্তার ঘটলো। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন। সিরিয়ার আমীর হযরত মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) খলীফার নিকট সাগর দ্বীপ কুবরুস (সাইপ্রাস) অভিযানের অনুমতি চাইলেন। উল্লেখ্য যে, এ সময় কুবরুস ছিল বাইজান্টাইন রোমান শাসিত একটি দ্বীপ। ইতিপূর্বে মুসলমানদের যেমন কোন নৌ-বাহিনী ছিল না তেমনি ছিল না জলপথে অভিযানের কোন অভিজ্ঞতা। তাই আমীর মু'আবিয়ার (রা) আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত 'উছমান (রা) মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করলেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর নৌ-বাহিনী গঠন ও জলপথে কুবরুস অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটাই ছিল মুসলমানদের নৌপথে প্রথম অভিযান। তাই দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক হযরত 'উছমান (রা) হিজরী ২৭ সনে সাগর পাড়ি দিয়ে কুবরুস অভিযানের নির্দেশ দেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) একটি নৌ-বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা), আবুদ দারদা' (রা), 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) প্রমুখের মত বহু উঁচু স্তরের সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

যেদিন রাসূল (সা) উম্মু হারামকে নৌ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং যেদিন

---

১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৪

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে একথা শোনেন :

أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا وأنتِ فيهم.

'আমার উম্মাতের প্রথম একটি বাহিনী সাগর পথে যুদ্ধ করবে, তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিবে। উম্মু হারাম, তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে।'[১৩]

সেদিন থেকে হযরত উম্মু হারাম (রা) এমন একটি নৌ-অভিযানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘদিন পর সে সুযোগ এসে গেল। তিনি স্বামী 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা) সংগে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী কুবরুস অবতরণ করে এবং রোমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করে। মূলতঃ যুদ্ধ ছাড়াই কেবল সন্ধির মাধ্যমে কুবরুস বিজিত হয়।

কুবরুস বিজয় শেষে বাহিনী যখন মূল ভূমিতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন একদিন উম্মু হারাম (রা) একটি বাহন পশুর পিঠে চড়তে গিয়ে পড়ে যান। ভীষণ আঘাত পান এবং সেই আঘাতে সেখানে ইনতিকাল করেন। সাগর দ্বীপ কুবরুসের মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়।[১৪]

হিশাম ইবন আল-গায বলেন : উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহানের কবর কুবরুসে। স্থানীয় জনসাধারণ বলে থাকে : এ হচ্ছে একজন সৎকর্মশীল মহিলার কবর।[১৫] তিনি আরো বলেছেন : আমি হিজরী ৯১ সনে বাকাকীস সাগর উপকূলে তাঁর কবর দেখেছি এবং তার পাশে দাঁড়িয়েছি। আজো সেখানে বিভিন্ন মহাদেশের অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে।[১৬]

হযরত উম্মু হারাম (রা) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা নৌ-যোদ্ধা। তিনি প্রথম মহিলা সাহাবী নৌ-সেনা যিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্বেতসাগর পাড়ি দিয়েছেন।

হাদীছ বর্ণনা

হযরত উম্মু হারাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে মোট পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীছ উঁচু স্তরের অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ বর্ণনা করেছেন। যেমন : আনাস ইবন মালিক (রা), 'আমর ইবন আসওয়াদ (রা), 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা), 'আতা' ইবন ইয়াসার, ইয়া'লা ইবন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তিনি তিন ছেলে– কায়স, 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদকে রেখে যান। প্রথম দুইজন প্রথম স্বামীর এবং শেষের জন 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা)।[১৭]

---

১৩. বুখারী : আল জিহাদ; হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আল-আ'লাম-২/৬১; তারীখু দিমাশ্‌ক-৪৮৬ (তারাজিম আন-নিসা')

১৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং-১৬৪৫; দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৭১২; নাসাবু কুরায়শ-১২৪-১২৫

১৫. তারীখু দিমাশ্‌ক-৪৯৬ (তারাজিম আন-নিসা')

১৬. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়া-৪৭

১৭. তাবাকাত-৮/৩১৮; আল-ইসাবা-৪/৪৪২

Contents

ফাতিমা বিনত কায়স আল-ফিহ্রিয়্যা (রা)

হযরত ফাতিমার (রা) পিতা কায়স ইবন খালিদ এবং মাতা উমাইমা বিনত রাবী'আ। ভাই দাহ্হাক ইবন কায়স। ফাতিমা দাহ্হাকের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। ফাতিমার মা উমাইমা ছিলেন বানূ কিনানার মেয়ে। আবু 'আমর হাফস-ইবন মুগীরার সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।[১] মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহিলারা যখন মক্কা থেকে হিজরাত করতে শুরু করে, তিনিও হিজরাত করেন।[২]

হিজরী ১০ সনে হযরত 'আলীর (রা) নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়ামনের দিকে পাঠানো হয়। ফাতিমার স্বামী আবু 'আমরও এ বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। পূর্বেই আবু 'আমর ফাতিমাকে দুই তালাক দান করেছিলেন, এখন মদীনা থেকে যাত্রাকালে তাঁদের বিয়ের উকিল 'আয়্যাশ ইবন রাবী'আর (রা) মাধ্যমে তৃতীয় তালাকের খবরটি তাঁকে পৌঁছে দেন। আর সেই সাথে পাঁচ সা' যব ও পাঁচ সা' খুরমাও তাঁর খোরাকি হিসেবে পাঠান। ফাতিমা যখন 'আয়্যাশের নিকট তাঁর খোরপোষ ও থাকার জন্য ঘরের দাবী জানালেন তখন তিনি বললেন, তোমার স্বামী শুধু এই খুরমাগুলি ও যবটুকু পাঠিয়েছেন। এছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নেই। আর এই যতটুকু দেয়া হলো তাও শুধু অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা স্বরূপ। অন্যথায় আমাদের কাছে তোমার আর কোন কিছুর অধিকার নেই।

'আয়্যাশের এমন কথা ফাতিমা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি নিজের কাপড়-চোপড় বেঁধে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। খালিদ ইবন ওয়ালীদসহ আরো কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হলেন। ফাতিমা তাঁর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : আবু 'আমর তোমাকে কতবার তালাক দিয়েছে? বললেন : তিনবার। রাসূল (সা) বললেন– তাহলে এখন তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আবু 'আমরের নেই। এখন তুমি উম্মু শুরাইকের নিকট অবস্থান করে তোমার 'ইদ্দত পূর্ণ করো। কিন্তু উম্মু শুরাইকের বাড়ীতে তার আত্মীয়-পরিজন ছিল, তাই তিনি আবার বললেন, ইবন মাকতুম একজন অন্ধ মানুষ। আর সে তোমার চাচাতো ভাই। তাই তার ওখানে থেকে তোমার 'ইদ্দত পূর্ণ করাই ভালো।

হযরত ফাতিমা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মুতাবিক ইবন মাকতুমের বাড়ীতে থাকতে লাগলেন। 'ইদ্দত পালন শেষ হওয়ার পর চারদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। তার মধ্যে মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, আবু জাহম ও উসামা ইবন যায়দের পয়গামও ছিল। ফাতিমা (রা) এসব পয়গামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পরামর্শ করলেন। রাসূল (সা) বললেন : মু'আবিয়া একজন বিত্তহীন মানুষ, তার তেমন কিছু নেই, আর আবু জাহম একজন ঝগড়াটে ও রুক্ষ মেজাজের লোক। উসামা ইবন যায়দ এ

১. আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩ (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) : তাবাকাত-৮/২৭৩
২. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬

দুইজনের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে বিয়ে কর। ফাতিমার ধারণা ছিল স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করবেন। এ কারণে তিনি উসামাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কিসে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্য কর। তাতে তোমার জন্য কল্যাণ আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন কথায় ফাতিমা (রা) উসামা ইবন যায়দকে বিয়ে করেন। ফাতিমা (রা) পরবর্তীকালে বলতেন, আমার এ বিয়ের পর আমি মানুষের ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হই।[৩]

হিজরী ২৩ সনে খলীফা হযরত 'উমারের (রা) ওফাতের পর মজলিসে শূরার অধিবেশন ফাতিমার (রা) বাড়ীতে বসতো।[৪] হিজরী ৫৪ সনে স্বামী উসামার (রা) ইনতিকাল হয়। স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েন। বিধবা হিসেবে বাকী জীবন ভাই দাহ্হাকের সংসারে কাটিয়ে দেন। পরবর্তীকালে ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া (রা) তাঁর খিলাফতকালে দাহ্হাক ইবন কায়সকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করলে ফাতিমা তাঁর সাথে কুফায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[৫] মৃত্যু সন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৬]

তিনি ছিলেন একজন রূপবতী মহিলা।[৭] সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধিমত্তা, উন্নত সাংস্কৃতিক রুচি, সঠিক মতামত ও চিন্তা-চেতনার অধিকারিণী পূর্ণ মানের নারী।[৮]

হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দের মেয়ে ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উছমানের স্ত্রী। ফাতিমা (রা) ছিলেন মেয়েটির খালা। 'আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ফাতিমা মেয়েটিকে তাঁর কাছে চলে আসতে বললেন। মারওয়ান একথা জানতে পেরে কুবায়সাকে তাঁর নিকট পাঠালেন। কুবায়সা ফাতিমার নিকট এসে বললেন, আপনি একজন মহিলাকে তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার আগে কিভাবে ঘর থেকে বের করছেন? জবাবে তিনি বললেন, এটা এজন্য যে, রাসূল (সা) আমাকে এমন আদেশই করেছিলেন। তারপর তিনি নিজের জীবনের ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং তার সমর্থনে কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।[৯]

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

৩. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৩; মুসনাদ-৬/৪১১-৪১৪; তাবাকাত-৮/২৭৪-২৭৫
৪. আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩; উসুদুল গাবা-৫/৫২৭
৫. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬
৬. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৫
৭. আল-ইসাবা-৪/৩৮৪
৮. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬
৯. সূরা আত-তালাক, আয়াত-১-২

এতটুকু পাঠ করার পর বলেন, এ পর্যন্ত হলো তালাকে রিজ'ঈ বা ফিরিয়ে নেয়ার তালাকের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তার পরেই এসেছে :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ.

'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না। যদি না তারা সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়।... অতঃপর তারা যখন তাদের 'ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে।'

এই শেষোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে তিন তালাকের পরে কোন অবস্থার সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই। তারপর তিনি বলেন, যেহেতু তোমাদের নিকট এ অবস্থায় স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা না হলে তাকে খোরপোষ না দেওয়া উচিত, এ কারণে তাকে আর আটকে রাখার কোন অর্থ হয় না।[১০]

হযরত ফাতিমা বিনত কায়স (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা এ হাদীছগুলি শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন : কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, আবু বাকর ইবন আবু জাহম, আবু সালামা, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'উরওয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ, আসওয়াদ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, 'আবদুল্লাহ আল-বাহী, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন ছাওবান, শা'বী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আসিম ও তামীম।[১১]

হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন অতি মার্জিত, রুচিশীল ও ভদ্র স্বভাবের মহিলা। বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম শা'বী ছিলেন তাঁর শাগরিদ। একবার তিনি ফাতিমার সাথে দেখা করতে এলেন। ফাতিমা (রা) তাঁকে খুরমা খেতে দেন ও ছাতু গুলিয়ে পান করান।[১২]

---

১০. সহীহ বুখারী-৯/৪২১-৪২২; সহীহ মুসলিম, তালাক অধ্যায়, হাদীছ নং-১৪৮০; আবু দাউদ, তালাক, হাদীছ নং-২২৮৪; তিরমিযী, নিকাহ, হাদীছ নং-১১৩৫; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/৯৮; মুসনাদ-৬/৪১৫-৪১৬

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩; সাহাবিয়াত-১৮০

১২. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৪

ফাতিমা বিন্ত খাত্তাব (রা)

হযরত ফাতিমার (রা) পিতা আল-খাত্তাব ইবন নুফায়ল। মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-'আদাবী শাখার সন্তান। মাতা হানতামা বিন্ত হাশিম ইবন আল-মুগীরা কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার কন্যা।[১] ফাতিমার (রা) সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, তিনি হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সহোদরা এবং হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দের (রা) সহধর্মিনী। তাঁর ডাক নাম উম্মু জামীল।[২] মক্কায় ইসলামের সেই সূচনা পর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের (রা) গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে হাতে গোনা যে কয়েকজন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন এই ফাতিমা (রা) ও তাঁর স্বামী তাদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

ফাতিমা ছিলেন একজন প্রখর বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না, স্বচ্ছ স্বভাব-প্রকৃতি ও পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট মহিলা। তাঁর ঈমান এত মজবুত ছিল যে, সেখানে সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র স্থান লাভ করতে পারেনি। বর্ণিত হয়েছে, হযরত খাদীজার (রা) পরে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যথাক্রমে হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের (রা) স্ত্রী উম্মুল ফাদল, হযরত আবূ বকরের (রা) কন্যা আসমা (রা) ও খাত্তাবের কন্যা ফাতিমা (রা)।[৪] ইবন হিশাম মক্কায় প্রথম পর্বে আটজন ইসলাম গ্রহণকারীর নাম উল্লেখ করার পর যে দশজন নারী-পুরুষের ইসলাম গ্রহণের বিষয় আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন যায়দ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমার (রা) নামও আছে।[৫]

মক্কার কুরাইশ পৌত্তলিকরা মুসলমানদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাতো। 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) তাঁর বোন ফাতিমা (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর উপরও অত্যাচার চালান। তিনি অন্য মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতেন। কিন্তু তাঁর বোন ফাতিমা তাঁর মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেই মক্কার কুরাইশ গোত্রের সা'ঈদ ইবন যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়লের সাথে ফাতিমার (রা) বিয়ে হয়। সা'ঈদ মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদরসহ সকল অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দশজনের অন্যতম। হিজরী ৫১ সনে তিনি

---

১. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৮/২৬৭; আল-ইসাবা-৪/৩৭০
২. উসুদুল গাবা-৫/৫১৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৭০
৩. তাবাকাত-৮/২৬৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৬২
৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ্-১/৪৪৫
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫২-২৫৪

মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৬] বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জন একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতিমা তাঁর স্বামীর আগেই মুসলমান হন।[৭]

ফাতিমা ও 'উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণ

নির্ভরযোগ্য প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত 'উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে। এখানে সেইসব বর্ণনার সারকথা উপস্থাপন করা হলো।

রুক্ষ মেজাজ, কঠোর স্বভাব ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি চরম শত্রুতামূলক মনোভাবের জন্যে 'উমার প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বের হলেন।

পথে নু'আইম ইবন 'আবদিল্লাহ আন-নাহহামের সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'উমার! কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে?

'উমার জবাব দিলেন : মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি।

নু'আইম : মুহাম্মাদকে হত্যা করলে বানূ হাশিম ও বানূ যাহ্‌রা কি তোমাকে ছেড়ে দেবে?

'উমার : মনে হচ্ছে, তুমিও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গিয়েছো!

নু'আইম : 'উমার! আমি কি তোমাকে একটি অবাক হবার মত কথা শোনাবো? তোমার বোন ও বোনের স্বামী দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করে তুমি যে ধর্মে আছো তা ত্যাগ করেছে।

'উমার (রা) একথা শুনে রাগে ক্ষোভে উত্তেজিত অবস্থায় বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর পথ ধরেন। তাঁদের ওখানে তখন হযরত খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা) ছিলেন। তাঁর সংগে ছিল 'সূরা তাহা' লিখিত একটি পুস্তিকা। তিনি তাঁদের দু'জনকে এই সূরাটি শেখাচ্ছিলেন। তাঁরা যখন 'উমারের (রা) উপস্থিতি টের পেলেন তখন খাব্বাব (রা) বাড়ীর এক কোণে আত্মগোপন করলেন। ফাতিমা পুস্তিকাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব যে তাঁদেরকে কুরআন শেখাচ্ছিলেন, 'উমার (রা) তা বাড়ীর কাছাকাছি এসে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেন : তোমাদের এখানে যে গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেলাম তা কিসের?

তাঁরা বললেন : আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম।

'উমার বললেন : সম্ভবত তোমরা ধর্মত্যাগী হয়েছো। আমি জেনেছি তোমরা মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে গিয়েছো।

ভগ্নিপতি সা'ঈদ (রা) বললেন : 'উমার! সত্য যদি তোমার নিজের ধর্মের বাইরে অন্য কোথাও থাকে তাহলে তুমি কী করবে?

এবার 'উমার (রা) নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। সা'ঈদের (রা) উপর ঝাঁপিয়ে

---

৬. আল-আ'লাম-৩/১৪৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১২৪

৭. আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩৮৩

Contents

পড়লেন। তাঁকে কিল-ঘুষি মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'পায়ে দলতে লাগলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর উপর চড়ে বসা 'উমারকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু 'উমার (রা) ফাতিমার (রা) মুখমণ্ডলে এমন এক ঘুষি মারেন যে, তাঁর মুখটি রক্তে ভিজে যায়। এ অবস্থায় ফাতিমা বলেন : 'উমার! সত্য তোমার ধর্মের বাইরে অন্যত্র রয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছি। এখন তোমার ভয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই।

বোনের রক্তভেজা মুখ দেখে 'উমার (রা) আঁৎকে উঠলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বললেন : ঠিক আছে, তোমরা যে পুস্তিকাটি পড়ছিলে সেটা আমাকে একটু দাও, আমি পড়ে দেখি। 'উমার লিখতে-পড়তে জানতেন। বোন তাঁর ভাই 'উমারের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : তুমি তো একজন অপবিত্র মানুষ। আর এটা পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না। ওঠো, গোসল করে এসো।

সুবোধ বালকটির মত 'উমার উঠে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে এসে পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন :

بسم الله الرحمن الرحيم – পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে– এতটুকু পড়ে তিনি মন্তব্য করলেন : অতি সুন্দর পবিত্র নামসমূহ। তারপর পাঠ করলেন : طه (ত্বোহা) থেকে এ আয়াত পর্যন্ত :

إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.[৮]

'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব, আমার 'ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।'

এরপর তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলে ওঠেন : এ তো অতি চমৎকার মহিমান্বিত কথা! মুহাম্মাদ কোথায়, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

'উমারের (রা) এ আহ্বান শুনে খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা) কাছে ছুটে আসেন। 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন : 'উমার! তোমার জন্যে সুসংবাদ! আমি আশা করি রাসূলুল্লাহ (সা) গত বৃহস্পতিবারে যে দু'আটি করেছিলেন তা তোমার ক্ষেত্রে কবুল হয়েছে। সেই দু'আটি ছিল এই–

اللّٰهُمَّ أَعِزِّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ.

'হে আল্লাহ! 'উমার ইবন আল-খাত্তাব অথবা আবূ জাহ্‌ল ইবন হিশামের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' খাব্বাব (রা) আরো অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল-আরকামের গৃহে আছেন।

---

৮. সূরা ত্বাহা-১৪

অতঃপর 'উমার (রা) সাফা পাহাড়ের সন্নিকটে আরকামের (রা) গৃহে পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।[৯]

ফাতিমা (রা) আপন ভাইয়ের হাতে মার খেয়েও ভাইকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসতে পারায় দারুণ খুশী হলেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের আদেশ হলে ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা) প্রথম পর্বে হিজরাতকারীদের সাথে মদীনায় চলে যান।[১০] সেখানে তিনি অন্যান্য মুসলিম নারীদের সাথে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেন।

ইবনুল জাওযী (রহ) বলেছেন, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে কতগুলো তা নির্ধারণ করা যায় না। হাদীছের সহীহ গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত কোন হাদীছ দেখা যায় না।[১১] ইবন হাজার (রহ) তাঁর এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১২]

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتزال أمتي بخير مالم يظـهر فيـهم حـب الدنيا في علماء فساق وقراء جهال وجبابرة، فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم الله بعقاب.

'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, যতদিন পর্যন্ত ফাসিক 'আলিম, জাহিল কারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের মাধ্যমে আমার উম্মতের মধ্যে দুনিয়া-প্রীতির প্রকাশ না ঘটবে ততদিন তারা শুভ ও কল্যাণের মধ্যে থাকবে। আর যখন তাদের মধ্যে দুনিয়া-প্রীতির প্রকাশ ঘটবে, আমার আশঙ্কা হয় আল্লাহ তখন তাদের উপর শাস্তি ব্যাপক করে দেবেন।'

"আদ-দুররুল মানছূর" গ্রন্থে তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এভাবে :[১৩]

كانت أديبة فاضلة عاقلة محبة للخير كارهة للشر آمرة بالـمعروف ناهية للمنكر.

'তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, বিদূষী, বুদ্ধিমতী মহিলা। শুভ ও কল্যাণকে ভালোবাসতেন, অশুভ ও অকল্যাণকে ঘৃণা করতেন, সৎকাজের আদেশ করতেন, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতেন।'

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে চার ছেলে রেখে যান। তাঁরা হলেন : 'আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আযইয়াদ ও আসওয়াদ।[১৪]

---

৯. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৪৩-৩৪৫; তাবাকাত-৩/২৬৭-২৬৮; উসুদুল গাবা-৪/৫২-৫৩; সিফাতুস সাফওয়া-১/২৬৯-২৭১; আ'লাম আন-নিসা'-৪/৫০; আয-যাহাবী, তারীখ-১/১৭৪-১৭৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৭৭; হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৬-২৯৮

১০. আল-ইসতী'আব-২/৫৫৩

১১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৬৮

১২. আল-ইসাবা-৪/৩৮১

১৩. আদ-দুররুল মানছূর-৩৬৪

১৪. প্রাগুক্ত

ফাতিমা বিন্‌ত আল-আসাদ (রা)

তিনি ছিলেন একজন মহিয়সী সাহাবিয়া যিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যেমন একজন মানুষের বুক তার অন্তরকে এবং চোখের পাঁপড়ি চোখ দুটিকে রক্ষা করে। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) এমন ভালোবাসতেন যেমন ভালোবাসে একজন মমতাময়ী মা তার একমাত্র সন্তানকে। ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাসের যে সকল মহিয়সী মহিলার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই মহিলার নামটিও বিদ্যমান। তিনি অনেক মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর লালন-পালনের সুযোগ লাভে ধন্যা হন। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা ও রাসূলুল্লাহর (সা) একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বীর সৈনিক সাহাবী 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) গর্বিতা মা। তিনি ছিলেন জান্নাতের অধিকারী যুবকদের দু' নেতা হযরত হাসান ও হুসায়নের (রা) দাদী। মহান মু'তার যুদ্ধের শহীদত্রয়ীর অন্যতম জা'ফার আত-তায়্যারের (রা) মা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা কন্যা, হাসান-হুসায়নের (সা) জননী হযরত ফাতিমা আয-যাহ্‌রা'র (রা) শ্বাশুড়ী। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহ্‌বী (রহ) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

'فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى، الهاشمية، والدة علی بن أبی طالب.'

'ফাতিমার পিতার নাম আসাদ। পিতামহ হাশিম, প্রপিতামহ 'আবদি মান্নাফ ইবন কুসায়। তিনি কুরায়শ গোত্রের হাশিমী শাখার কন্যা এবং 'আলী ইবন আবী তালিবের মা।' পিতামহ হাশিমে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন একদিকে তাঁর শ্বশুর এবং অন্য দিকে চাচা। প্রথম পর্বে মক্কা থেকে যে সকল মহিলা মদীনায় হিজরাত করেন তিনি তাঁদের একজন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা 'আবদুল মুত্তালিব যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ছেলে আবূ তালিবকে ডেকে তাঁর ইয়াতীম ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর লালন-পালনের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি চান যেন তাঁর ইয়াতীম পৌত্রটি আবূ তালিব ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে। তিনি তাঁদেরকে মুহাম্মাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে তাকিদ দেন। আর সেই থেকে বালক মুহাম্মাদ তাঁর চাচা-চাচী আবূ তালিব ও ফাতিমার (রা) সংসারের

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৮

সাথে যুক্ত হন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর সাথে একযোগে মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনে মনোযোগী হন। বালক মুহাম্মাদ তাঁর পরিবারে যুক্ত হওয়ার পর তিনি দেখতে পান, তাঁর ছেলে-মেয়েরা যখন মুহাম্মাদের সাথে আহার করে তখন তাদের খাবারে দারুণ বরকত হয়। আবূ তালিবের ছিলো অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। নিতান্ত অভাবী মানুষ। প্রতিবেলা তাঁর পরিবারের জন্য যে খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা করা হতো তা সবাই এক সাথে অথবা পৃথকভাবে খেলে সবার পেট ভরতো না। কিন্তু যখন তাদের সাথে মুহাম্মাদ খেতেন তখন সবারই পেট ভরে যেত। এ কারণে ছেলে-মেয়েরা যখন খেতে বসতো তখন আবূ তালিব বলতেন : 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমার ছেলে মুহাম্মাদ আসুক!' তিনি আসতেন, এক সাথে খেতেন এবং তাদের খাবার বেঁচে যেত। এক পেয়ালা দুধ থেকে তিনি প্রথমে পান করলে তারা সবাই তৃপ্ত হয়ে যেত– যদিও তাদের একজনই সেই পূর্ণ পেয়ালাটি শেষ করে ফেলতে পারতো। তাই আবূ তালিব তাকে বলতেন : তুমি বড় বরকতময় ছেলে।

সাধারণতঃ শিশু-কিশোররা উস্‌কো-খুশকো ও ধুলি-মলিন থাকে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) সবসময় তেল-সুরমা লাগিয়ে পরিপাটি অবস্থায় থাকতেন।[২] ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ এ সবকিছু দেখতেন। আর এতে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি স্নেহ-মমতা আরো বেড়ে যেত। তাঁর প্রতি আরো বেশী যত্নবান হতেন। এভাবে তাঁকে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, তথা হযরত খাদীজার (রা) সাথে বিয়ের আগ পর্যন্ত নিজের সন্তানের থেকেও অধিক স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। সব রকমের অশুভ ও অকল্যাণ থেকে আঁচলে লুকিয়ে রাখার মত তাঁকে আগলে রাখেন। এ কারণে নবী (সা) সারা জীবন চাচী ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের মধ্যে নিজের মা আমিনা বিন্‌ত ওয়াহাবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। তাঁকে গর্ভধারিণী মায়ের পরে দ্বিতীয় মা বলে মনে করতেন।

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে লোকেরা যা কিছু বলাবলি করতো, বিশেষত স্বামী আবূ তালিব যে প্রায়ই বলতেন[৩]– আমার এ ভাতিজা একজন বড় সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি হবে– কান লাগিয়ে শুনতেন। তিনি স্বামীর মুখে আরো শোনেন সিরিয়া সফরের সময় কিশোর মুহাম্মাদকে (সা) কেন্দ্র করে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা। তাছাড়া তিনি আরো শোনেন হযরত খাদীজার দাস মায়সারার বর্ণনা যা তিনি যুবক মুহাম্মাদের (সা) সাথে সিরিয়া ভ্রমণের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে যা কিছু দেখেছিলেন এবং অন্যদের মুখে তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছিলেন তাতে এত প্রভাবিত ও মুগ্ধ হন যে, কলিজার টুকরো 'আলীকে তাঁর তত্ত্বাবধানে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ করেননি।

তিনি অতি নিকট থেকে মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে একজন স্নেহময় পিতার রূপ দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'আলীর জন্মের পর থেকে তার প্রতি মুহাম্মাদের

---

২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১২০

৩. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ্-১/১৮৯; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪১

(সা) অত্যধিক আগ্রহ ও উৎসাহকে। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন : 'আলীর জন্মের পর মুহাম্মাদ তার নিজের মুখ থেকে একটু থুথু নিয়ে তার মুখে দেয়। তারপর সে জিহ্বা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে যায়। পরদিন সকালে আমরা 'আলীর জন্য ধাত্রী ডেকে পাঠালাম। কিন্তু কারো স্তনই গ্রহণ করলো না। আমি মুহাম্মাদকে ডাকলাম। সে তার জিহ্বায় একটু দুধ দিল। আর 'আলী তা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে গেল। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করলেন, এভাবে চলতে লাগলো।[৪] এ সবকিছু দেখে-শুনে মুহাম্মাদের প্রতি ফাতিমা বিন্ত আসাদের স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। তিনি ছেলে 'আলীকে মুহাম্মাদের (সা) সার্বক্ষণিক সহচর হওয়ার তাকিদ দেন।

রাসূল (সা) প্রথম দিকে যখন কা'বার চত্বরে নামায আদায় করতেন তখন কুরায়শরা তেমন গুরুত্ব দিত না। পরে যখন নিয়মিত পড়তে লাগলেন, তখন 'আলী ও যায়দ তাঁকে পাহারা দিতেন। পরে এমন হলো যে, তাঁরা দু'জন রাসূল (সা) ঘর থেকে বের হলে সর্বক্ষণ তাঁর সংগে থাকতেন। একদিন 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখন আবূ তালিব তাঁকে ডেকে পেলেন না। 'আলীর মা ফাতিমা বললেন : আমি তাঁকে মুহাম্মাদের সাথে যেতে দেখলাম। আবূ তালিব তাঁদেরকে তালাশ করতে করতে শি'আবে আবী দাব-এ গিয়ে পেলেন। মুহাম্মাদ (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে, আর 'আলী (রা) তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।[৫]

মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। নিজ গোত্র ও আত্মীয়-বন্ধুদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ লাভ করলেন। আল্লাহ নাযিল করলেন :[৬]

'وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ'

তুমি তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক কর।

নবী (সা) তাঁর প্রভুর নির্দেশ পালন করলেন। নিকট-আত্মীয়দের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে আহ্বান জানালেন। তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাকিদ দিলেন। ইসলামের সেই একেবারে সূচনা পর্বে যে ক'জন মুষ্টিমেয় মহিলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হন তাঁদের মধ্যে ফাতিমা বিন্ত আসাদ অন্যতম। সেদিন তাঁর স্বামী আবূ তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) আবেদনে সাড়া দিতে অপারগ হলেও তাঁদের কিশোর ছেলে 'আলী (রা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন।

এখান থেকেই এ মহিয়সী সাহাবিয়া ফাতিমা বিন্ত আসাদের (রা) জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। কুরায়শরা মুহাম্মাদ ও তাঁর দীন ইসলামের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গেল। তারা বানূ হাশিমের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। যখন তারা দেখলো আবূ তালিব ও

---

৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা-১/৪৩২; প্রাগুক্ত
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/১১১
৬. সূরা আশ-শু'আরা'-২১৪

তাঁর স্ত্রী মুহাম্মাদকে (সা) সমর্থন ও আশ্রয় দিচ্ছেন তখন তারা মুহাম্মাদকে (সা) তাদের হাতে সমর্পণের দাবী জানালো। কিন্তু চাচা-চাচী ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) পক্ষে অটল থাকলেন। কোন চাপের কাছেই নত হলেন না। মুহাম্মাদকে তাদের হাতে অর্পণের আবদার শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে যাঁরা ঈমান এনে মুহাম্মাদের (সা) অনুসারী হয়েছিল তাঁদের প্রতি তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলো।

নবী (সা) যখন দেখলেন কুরায়শরা তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরাতের অনুমতি দান করেন। কুরায়শদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের যে দলটি প্রথম আবিসিনিয়া হিজরাত করেন তার মধ্যে ফাতিমা বিন্ত আসাদের কলিজার টুকরো জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) ও তাঁর স্ত্রী আসমা' বিন্ত 'উমাইসও (রা) ছিলেন। যাত্রাকালে মা ফাতিমা (রা) বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছেলেকে বিদায় দেন। এই জা'ফার (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী মুসলমানদের আমীর বা নেতা। উল্লেখ্য যে, ফাতিমার (রা) এই ছেলেটি ছিল চেহারা-সুরতে ও আদবে-আখলাকে নবী কারীমের (সা) অনুরূপ। কুরায়শদের যে পাঁচ ব্যক্তিকে লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ বলে মনে করতো তাঁরা হলেন : জা'ফার ইবন আলী তালিব, কুছাম ইবন আল-'আব্বাস, আস-সায়িব ইবন 'উবায়দ ইবন 'আবদি ইয়াযীদ ইবন হাশিম ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, আবূ সুফয়ান ইবন আল-হারিছ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব ও আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)।[৭]

কুরায়শরা যখন দেখলো বিষয়টি আস্তে আস্তে তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, তারা বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের নারী-পুরুষ ও শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলকে 'শি'আবে আবী তালিব' উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য নারীদের সাথে এ অবরোধ মেনে নেন। অন্যদের সাথে তিনিও এ অবরুদ্ধ জীবনের তিনটি বছর সীমাহীন ক্ষুধা ও অনাহারের মুখোমুখি হন এবং গাছের পাতা খেয়ে কোন রকম জীবন রক্ষা করেন। অবশেষে তিন বছর পর নবুওয়াতের দশম বছরে তারা অবরোধ তুলে নেয়। অন্য মুসলমানদের সাথে ফাতিমাও (রা) মুক্ত জীবনে ফিরে আসেন। এ তিনটি বছর মহিলারা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দান করেন।

"শি'আবে আবী তালব" থেকে মুক্ত হওয়ার পর নবুওয়াতের দশম বছরে রাসূলুল্লাহর (সা) অতি আপন দু'ব্যক্তি মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে ইনতিকাল করেন। প্রথমে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও পরে চাচা আবূ তালিব এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এতদিন এ দু'জনই ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে ঢালস্বরূপ। এখন এ দু'জনের অবর্তমানে অত্যাচারী কুরায়শরা আরো জোরে-

---

৭. নিসাউন মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-৪২

Contents

শোরে নবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর জুলুম-নির্যাতন করতে শুরু করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম (সা) ও মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দান করেন।

রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মদীনায় হিজরাত করলেন। ফাতিমা বিন্ত আসাদও (রা) অন্যদের সাথে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যুবায়র ইবন বাক্কার তাঁর ইসলাম ও হিজরাত সম্পর্কে বলেন :[৮]

'وقد أسلمت وهاجرت إلى الله ورسوله.'

' তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরাত করেন।'

তাঁর স্থান ও মর্যাদা

অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ইমাম আশ-শা'বী (রহ) তাঁর ইসলাম ও হিজরাত সম্পর্কে বলেন:[৯]

'أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وهاجرت إلى المدينة.'

'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) মা ফাতিমা বিন্ত আসাদ ইবন হাশিম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরাতও করেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমা বিন্ত আসাদের (রা) মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইবন সা'দ বলেন :[১০]

'أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها.'

' ফাতিমা বিন্ত আসাদ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৎকর্মশীল মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখতে যেতেন এবং তাঁর গৃহে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন।'

তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার কারণে রাসূল (সা) তাঁকে অতিমাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে লালন-পালন, আদব-আখলাক শিক্ষাদান ও তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহারের প্রতিদানে রাসূলও (সা) তাঁর সাথে সবসময় সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর ছেলে 'আলীর (রা) সাথে রাসূলুল্লাহর কন্যা ফাতিমার (রা) বিয়ে হলো। তখন তিনি একজন মমতাময়ী মা ও একজন আদর্শ শ্বাশুড়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের জীবন তো আর এমন বিত্ত-বৈভবের জীবন ছিল না। সব কাজ নিজেদেরই করতে হতো। নবী দুহিতা ফাতিমাকে (রা) ঘরে আনার পর 'আলী (রা) মাকে বললেন : আমি পানি আনা, প্রয়োজনে এদিক-ওদিক যাওয়ার ব্যাপারে ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহকে সাহায্য করবো,

---

৮. আল-ইসতী'আব-৪/৩৭০

৯. উসুদুল গাবা-(৭১৬৮); আল-ইসাবা-৪/৩৮০

১০. তাবাকাত-৮/২২২; সিফাতুল সাফওয়া-২/৫৪; আল-ইসাবা-৪/৩৮০

আর আপনি তাঁকে ঘরের কাজে, যেমন গম পেষা ও আটা চটকানোর কাজে সাহায্য করবেন।[১১]

ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার কারণে তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে বিভিন্ন জিনিস উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। জা'দা ইবন হুবায়রা 'আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: একবার রাসূল (সা) আমার নিকট এক জোড়া অতি উন্নতমানের নতুন কাপড় পাঠালেন। সাথে সাথে একথাও বলে পাঠালেন যে, 'এ দু'টোকে নিকাবের কাপড় বানিয়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও।' আমি চার টুকরো করলাম। এক টকুরো দিলাম ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহকে, এক টুকরো ফাতিমা বিন্‌ত আসাদকে এবং আরেক টুকরো ফাতিমা বিন্‌ত হামযাকে (রা)। তবে তিনি চতুর্থ টুকরোটি যে কাকে দেন তা বলেননি। ইবন হাজার (রহ) বলেছেন, সম্ভবত চতুর্থটি দেন 'আকীল ইবন আবী তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত শায়বাকে।[১২] উল্লেখ্য যে, ফাতিমা নামের চব্বিশজন মহিলা সাহাবী ছিলেন।[১৩]

ইবনুল আছীর বলেছেন, ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ প্রথম হাশিমী মহিলা যিনি একজন হাশিমী বংশের সন্তান জন্মদান করেন।[১৪] তিনি প্রথম হাশিমী যাঁর গর্ভে একজন খলীফার জন্ম হয়। তারপর ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) গর্ভে জন্ম হয় আল-হাসান ইবন 'আলীর (রা)। তারপর খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন খলীফা আল আমীন।[১৫]

সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন ছিল। বিশেষ করে সাহাবী কবিদের নিকট। জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) মু'তায় শহীদ হওয়ার পর কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) তাঁর স্মরণে যে কবিতাটি রচনা করেন তাতে তাঁর মা ফাতিমারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৬]

তেমনিভাবে কবি আল-হাজ্জাজ ইবন 'আলাত আস-সুলামীও উহুদ যুদ্ধে হযরত 'আলীর (রা) বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর মায়েরও প্রশংসা করেন।[১৭]

অনেকের ধারণা যে, তিনি হিজরাতের পূর্বে ইনতিকাল করেন। তবে তা সঠিক নয়। ইমাম আস-সামহূদী (রহ) তাঁর "আল-ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মদীনায় মারা যান এবং তাঁকে "আর-রাওহা'" গোরস্তানে দাফন করা হয়।[১৮]

---

১১. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫৪; আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম-৩/৬২১; উসুদুল গাবা-৫/৫১৭
১২. উসুদুল গাবা-৫/৫১৭; আল-ইসাবা-৪/৩৮০
১৩. নিসাউন মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২২; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৪
১৪. আল-ইসতী'আব-২/৭৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৮
১৫. নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪৫
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৫১
১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/৩৩৬; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৫
১৮. আল-ইসাবা-৪/৩৮০

নবী কারীমের (সা) অন্তরে হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) ছিল বিশেষ মর্যাদার স্থান। তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা ভোলেননি। তিনি নিজের জামা দিয়ে ফাতিমাকে কাফন দিয়েছেন। তাঁর কবরে নেমে তাঁর পাশে শুয়েছেন এবং তাঁর ভালো কাজের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন।[১৯] আস-সামহূদী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র পাঁচটি কবর ছাড়া আর কোন কবরে কখনো নামেননি। সেই পাঁচটির মধ্যে তিনটি নারীর এবং দু'টি পুরুষের। তার মধ্যে আবার একটি মক্কায় এবং চারটি মদীনায়। মক্কার কবরটি হলো উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদের (রা)। মদীনারগুলো হলো : ১. খাদীজার (রা) ছেলের কবর। ছেলেটি রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে ও তত্ত্বাবধানে ছিল। ২. "যূ আল-বিজাদাইন" (দুইচাদরের অধিকারী) বলে খ্যাত 'আবদুল্লাহ আল-মুযানীর (রা) কবর। ৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) কবর। ৪. ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) কবর।[২০]

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের মৃত্যু রাসূল (সা) এবং সাহাবীদের মনে দারুণ বেদনার ছাপ ফেলে। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং নিজের জামা দিয়ে তাঁর কাফন দেন। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আলী, জা'ফার ও 'আকীলের মা মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা সবাই আমার মা'র কাছে চলো। আমরা উঠলাম এবং এমন নিঃশব্দে পথ চললাম যেন আমাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে পাখী বসে আছে। বাড়ীর দরজায় পৌঁছার পর রাসূল (সা) গায়ের জামাটি খুলে পরিবারের লোকদের হাতে দিয়ে বলেন : তাঁর গোসল দেওয়া শেষ হলে এটি তাঁর কাফনের নীচে দিয়ে দেবে।

যখন লোকেরা দাফনের জন্য লাশ নিয়ে বের হলো তখন রাসূল (সা) একবার খাটিয়ায় কাঁধ দেন, একবার খাটিয়ার সামনে যান, আরেকবার পিছনে আসেন। এভাবে তিনি কবর পর্যন্ত পৌঁছেন। তারপর কবরে নেমে গড়াগড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠে আসেন। তারপর বলেন : আল্লাহর নামের সাথে এবং আল্লাহর নামের উপরে তোমরা তাঁকে কবরে নামাও। দাফন কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন : আমার মা ও প্রতিপালনকারিণী! আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন। আপনি ছিলেন আমার একজন চমৎকার মা ও চমৎকার প্রতিপালনকারিণী। জাবির বলেন : আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখানে এমন দু'টি কাজ করেছেন, আমরা কখনো আপনাকে এ ধরনের কাজ করতে দেখিনা। বললেন : সে দু'টি কাজ কি? বললাম : আপনার জামা খুলে দেওয়া এবং কবরে গড়াগড়ি দেওয়া। বললেন : জামাটির ব্যাপার হলো, আমি চেয়েছি তাঁকে যেন কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ না করে। যদি আল্লাহ চান। আর কবরে আমার গড়াগড়ি দেওয়া– আমি চেয়েছি আল্লাহ যেন তাঁর কবরটি প্রশস্ত করে দেন।[২১]

---

১৯. উসুদুল গাবা-৫/৫১৭

২০. ওয়াফা আল-ওয়াফা-৩/৮৯৭; নিসাউন মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৩

২১. কান্‌য আল-'উম্মাল-১৩/৬৩৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১১৮

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে নবী (সা) ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের কবরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর এই দু'আটি পাঠ করেন :

'الله الذى يحى ويميت وهو حى لايموت، اغفر لأمى فاطمة بنت أسد، ولقّنها حُجّتها، ووسّع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين.'

'আল্লাহ যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আমার মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদকে আপনি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে তাঁর যুক্তি-প্রমাণকে শিখিয়ে দিন। আপনার নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দাবির ভিত্তিতে আপনি তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আপনি হলেন সকল দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু।

তারপর তিনি চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন। লাশ কবরে নামান রাসূল (সা), 'আব্বাস ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।[২২]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, যখন 'আলীর (রা) মা ফাতিমা (রা) মারা গেলেন তখন নবী (সা) নিজের একটি জামা তাঁকে পরান এবং কবরে তাঁর সাথে শুয়ে পড়েন। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনাকে আর কখনো এমনটি করতে দেখিনে। বললেন : আবূ তালিবের পরে তাঁর চেয়ে বেশী সদাচরণ আর কেউ আমার সাথে করেনি। আমি আমার জামা তাঁর গায়ে এজন্য পরিয়েছি যেন তাঁকে জান্নাতের পোশাক পরানো হয়, আর তাঁর সাথে এজন্য শুয়েছি যেন তাঁর সাথে সহজ আচরণ করা হয়।[২৩]

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) অবশ্যই জান্নাতে যাবেন। ইমাম আল-কুরতুবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদের (সা) এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, কবরে তাঁর উপর দলন-পেষণ চালানো হবে না। যেহেতু তিনি ফাতিমা বিন্‌তে আসাদের কবরে শুয়েছেন, এজন্য তাঁর বরকতে ফাতিমা (রা) কবরের পেষণ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন।[২৪]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন, যখন 'আলীর (রা) মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) মারা গেলেন তখন রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন : হে আমার মা, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আমার মা'র পরে, আপনি অভুক্ত থেকে আমার পেট ভরাতেন, আপনি না পরে আমাকে পরাতেন এবং ভালো কিছু নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন। এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল লাভের আশা করতেন।[২৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এত বড় মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন যে, কেউ তাঁর প্রতি সামান্য

---

২২. নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৭
২৩. আ'লাম আন-নিসা'-৪/৩৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১১৮
২৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা-২/৬৭৩
২৫. মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ-৯/২৫৬; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪৮

দয়া ও অনুগ্রহ দেখালে তা কোনদিন ভোলেননি। কথায় ও কর্মের দ্বারা সবসময় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাহলে ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা), যিনি নবীর (সা) জীবনে মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরাত করেছেন এবং সারাটি জীবন রাসূলের কল্যাণ চিন্তা করেছেন, তাঁকে তিনি ভুলবেন কেমন করে? তাঁর সাথে যেমন আচরণ করা দরকার তা তিনি করেছেন।

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ছেচল্লিশটি (৪৬) হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি মুত্তাফাক 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমে একই সনদে বর্ণিত হয়েছে)।[২৬]

তাঁর ছেলেরা হলেন : তালিব, 'আকীল, জা'ফার ও 'আলী (রা) এবং মেয়েরা হলেন : হাম্মাদ ও রীতা।[২৭]

---

২৬. আ'লাম আন-নিসা'-৪/৩৩

২৭. তাবাকাত-৮/১৬১

Contents

সুমায়্যা বিন্‌ত খুব্‌বাত (রা)

ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমায়্যা (রা) একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর বংশ পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইবন সা'দ তাঁর পিতার নাম 'খুব্‌বাত' বলেছেন,[১] কিন্তু বালাজুরী বলেছেন 'খায়্যাত'।[২] প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রা) মা এবং মক্কার আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর দাসী।[৩]

আল-ওয়াকিদীসহ একদল বংশবিদ্যা বিশারদ বলেছেন, হযরত 'আম্মারের (রা) পিতা ইয়াসির ইয়ামনের মাজহাজ গোত্রের 'আনসী শাখার সন্তান। তবে তাঁর ছেলে 'আম্মার মক্কার বানু মাখযুমের আযাদকৃত দাস। ইয়াসির তাঁর দু'ভাই– আল হারিছ ও মালিককে সংগে নিয়ে তাঁদের নিখোঁজ চতুর্থ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কায় আসেন। আল-হারিছ ও মালিক স্বদেশ ইয়ামনে ফিরে গেলেন, কিন্তু ইয়াসির মক্কায় থেকে যান। মক্কার রীতি অনুযায়ী তিনি আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। আবু হুজাইফা তাঁর দাসী সুমায়্যাকে ইয়াসিরের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁদের ছেলে 'আম্মারের জন্ম হয়। আবু হুজাইফা 'আম্মারকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সাথে রেখে দেন। যতদিন আবু হুজাইফা জীবিত ছিলেন 'আম্মার তাঁর সাথেই ছিলেন।[৪] উল্লেখ্য যে, এই আবু হুজাইফা ছিলেন নরাধম আবু জাহলের চাচা।[৫]

হযরত সুমায়্যা (রা) যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি প্রথম ভাগেই স্বামী ইয়াসির ও ছেলে 'আম্মার সহ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মক্কায় তাঁদের এমন কোন আত্মীয়-বন্ধু ছিল না যারা তাঁদেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। আর তাই তারা তাঁদের উপর মাত্রা ছাড়া নির্যাতন চালাতে কোন রকম ত্রুটি করেনি।

ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন : সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তাঁরা হলেন সাত জন। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আম্মার, আম্মারের মা সুমায়্যা, সুহাইব, বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা)। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদেরকে পৌত্তলিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো।[৬]

হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন 'আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে বলেন :

---

১. তাবাকাত–৮/২৬৮
২. আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭
৩. তাবাকাত-৮/২৬৮
৪. সীরাতু ইবন হিশাম–১/২৬১; টীকা-৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭
৫. আল-আ'লাম–৩/১৪০
৬. আল-বিদায়া-৩/২৮; কান্‌য আল 'উম্মাল-৭/১৪; আল-ইসাবা-৪/৩৩৫; হায়াতুস সাহাবা-১/২৮৮

'হে ইয়াসিরের পরিবার–পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।'[৭]

'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা) বলেন, রাসূল (সা) তাঁদের সেই অসহায় অবস্থায় দেখে বলেন :

'হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ ধৈর্য ধর, হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ ধৈর্য ধর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।'[৮] ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সুমায়্যাকে (রা) আবু জাহল বল্লম মেরে হত্যা করে। অত্যাচার, উৎপীড়নে ইয়াসিরের মৃত্যু হয় এবং 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসিরকে তীরবিদ্ধ করা হয়, তাতেই তিনি মারা যান।

'উছমান (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আল-বাতহা' উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, 'আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। 'আম্মারের পিতা রাসূলকে (সা) দেখে বলে ওঠেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালচক্র এ রকম? রাসূল (সা) বললেন : হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! ধৈর্য ধর। হে আল্লাহ! ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন।[৯]

সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে হযরত সুমায়্যা প্রতিদিনের মত একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহল তাঁকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমায়্যার দিকে বর্শা ছুড়ে মারে এবং সেটি তাঁর যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১০] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

মায়ের এমন অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণে ছেলে 'আম্মারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন তো জুলুম-অত্যাচার মাত্রা ছাড়া রূপ নিয়েছে। রাসূল (সা) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন :

'হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসিরের পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি দিওনা।'[১১]

হযরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরাতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন : ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন 'আম্মারের মা সুমায়্যা।[১২]

বদর যুদ্ধে নরাধম আবু জাহল নিহত হলে রাসূল (সা) আম্মারকে বললেন :

'আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।'[১৩]

হযরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে ৬১৫ খ্রীস্টাব্দে।[১৪]

---

৭. হায়াতুস সাহাবা–১/২৯১
৮. সীরাতু ইবন হিশাম–১/৩২০; আনসাবুল আশরাফ-১/১৬০, হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১
৯. তাবাকাত–৩/১৭৭; কানয আল-'উম্মাল-৭/৭২
১০. তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া–২/৩২
১১. সীরাতু ইবন হিশাম–১/৩১৯; টীকা–৫
১২. তাবাকাত–৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২
১৩. আল-ইসাবা–৪/৩৩৫
১৪. আল-আ'লাম–৩/১৪০

Contents

উম্মু 'উমারা (রা)

মদীনার একজন আনসারী মহিলা। উম্মু 'উমারা উপনামে তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভালো নাম নুসাইবা। পিতার নাম কা'আব ইবন 'আমর। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] বিখ্যাত বদরী সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন কা'ব আল মাযিনীর বোন।[৩]

উম্মু 'উমারার প্রথম বিয়ে হয় যায়দ ইবন 'আসিম ইবন 'আমরের সাথে। এই যায়দ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। তাঁর মৃত্যুর পর গাযিয়্যা ইবন 'আমরের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। প্রথম পক্ষে 'আবদুল্লাহ ও হাবীব এবং দ্বিতীয় পক্ষে তামীম ও খাওলা নামক মোট চার সন্তানের মা হন।[৪]

ইসলামের একেবারে সূচনাপর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ও তার আশে-পাশের জনপদে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন এবং দিন দিন কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছেন। মাঝে মাঝে অন্তর মাঝে নৈরাশ্য ও হতাশা বোধ জন্ম নিলেও আল্লাহর রহমত এবং সাহায্য-সহায়তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাবলীগী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মাক্কী জীবনের এমন এক প্রেক্ষাপটে ইয়াছরিবের ছয় ব্যক্তি মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহর সাথে (সা) সাক্ষাৎ করেন, কথা শোনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াছরিবে ফিরে যান। পরের বছর হজ্জ মওসুমে তাঁরা আরো ছয় জনকে সংগে করে মক্কায় যান এবং গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে বাই'আত করেন। যাকে আকাবার প্রথম বাই'আত বলা হয়। ইয়াছরিব তথা মদীনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং তাদের অনুরোধে রাসূল (সা) দা'ঈ হিসেবে মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) তাঁদের সাথে মদীনায় পাঠান। এই ছোট্ট দলটি পরবর্তী একবছর মদীনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁরা এত আন্তরিকভাবে কাজ করেন যে, মাত্র এক বছরের মধ্যে মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে যায়। এ সময়ের মধ্যে মদীনার অনেক বড় বড় নেতা ও অভিজাত ঘরের নারী-পুরুষ ইসলামের দা'ওয়াত কবুল করেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তী হজ্জ মওসুমে তিয়াত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের বিশাল একটি দল নিয়ে মুস'আব মক্কায় যান এবং 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। আর সেখানে অনুষ্ঠিত হয় 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮

২. সাহাবিয়াত-২০৪

৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮

৪. তাবাকাত-৮/৪১২; আল-ইসাবা-৪/৪৭৯

হযরত মুস'আবের তাবলীগে মদীনার যে সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন উম্মু 'উমারা (রা) তাঁদের একজন। কেবল তিনি নন, এ সময়কালে তাঁর গোটা খানদান মুসলমান হন। এভাবে তিনি হলেন প্রথম পর্বের একজন মুসলমান আনসারী মহিলা।[৫]

হযরত উম্মু 'উমারার জীবনের প্রথম বড় ঘটনা 'আকাবার বাই'আতে অংশগ্রহণ। 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতে পঁচাত্তর জন মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে দুইজন মহিলা ছিলেন। উম্মু 'উমারা (রা) তার একজন। দ্বিতীয় মহিলা ছিলেন উম্মু মানী' (রা)।[৬] পুরুষদের বাই'আতের শেষে উম্মু 'উমারার স্বামী হযরত গাযিয়্যা ইবন 'আমর মহিলা দুইজনকে ডেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করে আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুই মহিলাও বাই'আতের উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন : যে অঙ্গীকারের উপর তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করেছি ঐ একই অঙ্গীকারের উপর তাদেরও বাই'আত গ্রহণ করছি। হাত মেলানোর প্রয়োজন নেই। আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাইনা।[৭]

হিজরী দ্বিতীয় সনে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উম্মু 'উমারা (রা) যোগ দেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারাম চাচা হযরত হামযা (রা) সহ বহু মুসলমান শহীদ হন। আল-ওয়াকিদী বলেন :[৮] উম্মু 'উমারা তাঁর স্বামী গাযিয়্যা ইবন 'আমর ও প্রথম পক্ষের দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও হাবীবের[৯] সাথে উহুদে যোগদান করেন। মূলত তিনি গিয়েছিলেন একটি পুরানো মশক সংগে নিয়ে যোদ্ধাদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক পর্যায়ে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। চমৎকার রণকৌশলের পরিচয় দেন। শত্রুর বারোটি মতান্তরে তেরোটি আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত হয়।[১০] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে এ যুদ্ধে তিনি তীর-বর্শা দ্বারা বারোজন পৌত্তলিক সৈন্যকে আহত করেন।[১১]

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যে কয়েকজন মুজাহিদ নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপত্তা বিধান করেন তাঁদের মধ্যে উম্মু 'উমারা, তাঁর স্বামী গাযিয়্যা ও দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও হাবীবও ছিলেন।

রণক্ষেত্রের এই নাজুক অবস্থার আগে যখন মুসলিম বাহিনী খুব শক্তভাবে শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা করছিল এবং বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তখনো উম্মু 'উমারা (রা) হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন না। মশকে পানি ভরে নিয়ে মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন যে সবাই ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে মাত্র

৫. সাহাবিয়াত-২০৪
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪১
৭. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৭৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৬
৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮
৯. কোন কোন বর্ণনায় হাবীব-এর স্থলে 'খুবায়ব' এসেছে।
১০. তাবাকাত-৮/৪১২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯
১১. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৫

গুটিকয়েক মুজাহিদ। তিনিও এগিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে জীবন বাজি রেখে অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আর তাঁর পাশে এসে অবস্থান নিলেন স্বামী ও দুই ছেলে। তিনি একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) উপর কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন, অপর দিকে তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে অনেককে ধরাশায়ী করে ফেলছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের সেই মারাত্মক পর্যায়ের বর্ণনা উম্মু 'উমারা দিয়েছেন এভাবে : "আমি দেখলাম, লোকেরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে পালাচ্ছে। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাদের সংখ্যা দশও হবেনা, রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে আছে। আমি, আমার দুই ছেলে ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করেছি। তখন অন্য মুজাহিদরা পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাসূল (সা) দেখলেন আমার হাতে কোন ঢাল নেই। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পালাচ্ছে এবং তার হাতে একটি ঢাল। তিনি তাকে বললেন, ওহে, তুমি তোমার ঢালটি যে লড়ছে এমন কারো দিকে ছুড়ে মার। সে ঢালটি ছুড়ে মারে এবং আমি তা হাতে তুলে নিই। সেই ঢাল দিয়েই আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) আড়াল করতে থাকি। সেদিন অশ্বারোহী যোদ্ধারা আমাদের সাথে খুব বাজে কাজ করেছিল। যদি তারা আমাদের মত পদাতিক হতো তাহলে আমরা শত্রুদের ক্ষতি করতে সক্ষম হতাম।"

তিনি আরো বলেছেন, কোন অশ্বারোহী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাকে তরবারির আঘাত করছিল, আর আমি সে আঘাত ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। তারপর যেই না সে পিছন ফিরে যেতে উদ্যত হচ্ছিল অমনি আমি তার ঘোড়ার পিছন পায়ে তরবারির কোপ বসিয়ে দিচ্ছিলাম। ঘোড়াটি আরোহীসহ মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। তখনই রাসূল (সা) আমার ছেলেকে ডেকে বলছিলেন : 'ওহে উম্মু 'উমারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য কর।' সে ছুটে এসে আমাকে সাহায্য করছিল। এভাবে আমি তাকে মৃত্যুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম।[১২]

উম্মু 'উমারার ছেলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যখন মুসলিম মুজাহিদরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন আমি ও আমার মা তাঁর নিকট গিয়ে কাফিরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে শুরু করলাম। এসময় রাসূল (সা) আমাকে বললেন, তুমি উম্মু 'উমারার ছেলে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শত্রুদের দিকে কিছু ছুড়ে মার। আমি আমার সামনের একটি লোকের দিকে একটি পাথর ছুড়ে মারলাম। লোকটি ছিল ঘোড়ার পিঠে। নিক্ষিপ্ত পাথরটি গিয়ে লাগলো ঘোড়ার একটি চোখে। ঘোড়াটি ছট্‌ফট্ করতে করতে তার আরোহীসহ মাটিতে পড়ে গেল। আর আমি লোকটির উপর পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। আমার একাজ দেখে রাসূল (সা) মৃদু হাসতে থাকেন।[১৩]

---

১২. তাবাকাত-৮/৪১৩-৪১৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯

১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮০

উহুদের দিন উম্মু 'উমারা (রা) ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলেন। দামরা ইবন সা'ঈদের দাদা—উহুদের একজন যোদ্ধা, তিনি বলেছেন উম্মু 'উমারা সেদিন কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে শত্রুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। এ যুদ্ধে তাঁর দেহের তেরোটি স্থান মারাত্মকভাবে আহত হয়।[১৪]

এ সময় এক কাফিরের নিক্ষিপ্ত একটি আঘাতে হযরত রাসূলে পাকের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। পাষণ্ড ইবন কামিআ রাসূলুল্লাহকে (সা) তাক করে তরবারির একটি কোপ মারে, কিন্তু তা ফসকে যায়। মুহূর্তে উম্মু 'উম্মারা (রা) ফিরে দাঁড়ান। তিনি নরপশু ইবন কামিআর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তার সারা দেহ বর্ম আচ্ছাদিত থাকায় বিশেষ কার্যকর হলোনা। তবে সে উম্মু 'উমারাকে তাক করে এবার একটি কোপ মারে এবং তা উম্মু উমারার কাঁধে লাগে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন।[১৫]

ইবন কামিআ তো ভেগে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু উম্মু 'উমারার আঘাতটি ছিল অতি মারাত্মক। তাঁর সারা দেহ রক্তে ভিজে গেল। তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন : 'আমার মা সেদিন মারাত্মকভাবে আহত হন। রক্ত বন্ধই হচ্ছিল না। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : 'তোমার ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ কর।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে আহত হতে দেখে তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন : তোমার মাকে দেখ, তোমার মাকে দেখ। তার ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ কর। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে জান্নাতে আমার বন্ধু করে দাও।[১৬] উম্মু 'উমারা বলেন– 'দুনিয়ায় আমার যে কষ্ট ও বিপদ আপদ এসেছে, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।[১৭] সেদিন রাসূল (সা) নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধান। এ সময় রাসূল (সা) কয়েকজন সাহসী সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বলেন : উম্মু 'উমারার আজকের কর্মকাণ্ড তাঁদের কর্মকাণ্ড থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এরপর প্রায় একবছর যাবত তাঁর ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করা হয়।[১৮]

উহুদের এই মারাত্মক আক্রমণে উম্মু 'উমারার ছেলে 'আবদুল্লাহও মারাত্মকভাবে আহত হলো। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন : সেদিন আমি মারাত্মকভাবে আহত হলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন : তোমার আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধ। কিছুক্ষণ পর আমার মা অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ হাতে নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসেন এবং আমার আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন। রাসূল (সা) তখন পাশেই দাঁড়িয়ে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে মা আমাকে বলেন : বেটা, ওঠো। শত্রু সৈন্যদের গর্দান মার। রাসূল (সা) তখন বলেন : ওহে উম্মু 'উমারা, তুমি যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য রাখ, অন্যের মধ্যে তা কোথায়?

'আবদুল্লাহ আরো বর্ণনা করেন, এ সময় যে শত্রু সৈন্যটি আমাকে আহত করেছিল,

---

১৪. তাবাকাত-৮/৪১৩
১৫. প্রাগুক্ত-৮.৪১৪; ইবন হিশাম-২/৮১-৮২
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১
১৭. তাবাকাত-৮/৪১৪-৪১৫
১৮. প্রাগুক্ত-৮/৪১২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯

অদূরে তাকে দেখা গেল। রাসূল (সা) আমার মাকে বললেন : এ সেই ব্যক্তি যে তোমার ছেলেকে যখম করেছে। আমার মা বললেন : আমি তার মুখোমুখি হবো এবং তার ঠ্যাংয়ের নলা ভেঙ্গে দেব। একথা বলে তিনি তাকে আঘাত করে ফেলে দেন। তা দেখে রাসূল (সা) হেসে দেন এবং আমি তাঁর সামনের দাঁত দেখতে পাই। তারপর তিনি বলেন : উম্মু 'উমারা, তুমি বদলা নিয়েছো। তারপর আমরা দুইজনে মিলে আঘাতের পর আঘাত করে তাকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই। তখন রাসূল (সা) বলেন, 'উম্মু 'উমারা, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে সফলকাম করেছেন।[১৯]

উহুদ যুদ্ধ শেষ হলো। মুজাহিদরা ঘরে ফিরতে লাগলেন। রাসূল (সা) 'আবদুল্লাহ ইবন কা'ব মাযিনীকে পাঠিয়ে উম্মু 'উমারার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়ে ঘরে ফিরলেন না।

উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষক মদীনার মুজাহিদদেরকে 'হামরা আল আসাদ'[২০] এর দিকে বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেন। উম্মু 'উমারা সেখানে যাওয়ার জন্য মাজায় কাপড় পেঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণের কারণে সক্ষম হননি।[২১]

উহুদ যুদ্ধ ছাড়াও তিনি আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে তিনি উহুদ, হুদাইবিয়া, খায়বার, কাজা 'উমরা আদায়, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ ও অভিযানে যোগ দেন। হাকেম ও ইবন মুন্দার মতে, তিনি বদরেও যোগ দিয়েছেন। তবে ইমাম জাহাবী বলেছেন, তাঁর বদরে অংশগ্রহণের কথাটি সঠিক নয়।[২২] তবে একমাত্র ইয়ামামার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ ও অভিযানে তার অংশগ্রহণের কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। উম্মু 'উমারার বোনও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর ইয়ামামার অধিবাসী এবং তথাকার নেতা মুসায়লামা আল-কাজ্জাব মুরতাদ হয়ে যায়। সে ছিল একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির অত্যাচারী মানুষ। তার গোত্রে প্রায় চল্লিশ হাজার যুদ্ধ করার মত লোক ছিল। তারা সবাই তাকে সমর্থন করে। নিজের শক্তির অহমিকায় সে নিজেকে একজন নবী বলে দাবী করে এবং তার সমর্থকদের সবার নিকট থেকে জোর-জবরদস্তীভাবে স্বীকৃতি আদায় করতে থাকে। আর যারা তার নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতো। হযরত উম্মু 'উমারার (রা) ছেলে হযরত হাবীব ইবন যায়দ 'উমান থেকে মদীনায় আসার পথে মুসায়লামার হাতে বন্দী হন। মুসায়লামা তাঁকে বলেন : 'তুমি তো সাক্ষ্য দিয়ে থাক যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। হাবীব বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। মুসায়লামা তখন বলে : না, তোমাকে একথা বলতে হবে যে, মুসায়লামা

১৯. প্রাগুক্ত
২০. মদীনা থেকে জুল হুলাইফার দিকে যেতে রাস্তার বাম দিকে আট মাইলের মাথায় একটি স্থান
২১. তাবাকাত-৮/৪১৩
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮.২৮২
২৩. ইবন হিশাম-১/৪৬৬

আল্লাহর রাসূল।' হযরত হাবীব অত্যন্ত শক্তভাবে তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা হযরত হাবীবের একটি হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর সে হাবীবের নিকট একই স্বীকৃতি দাবী করে। তিনি পূর্বের মতই অস্বীকৃতি জানান। পাষাণ মুসায়লামা তাঁর দ্বিতীয় হাতটি কেটে দেয়। মোটকথা, নরাধম মুসায়লামা তার দাবীর উপর অটল থাকে, আর হযরত হাবীবও অটল থাকেন নিজের শক্ত বিশ্বাসের উপর। পাষণ্ড মুসায়লামা একটি একটি করে হযরত হাবীবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা জীবন দেওয়া সহজ মনে করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া সমীচীন মনে করেননি। এ ঘটনার কথা উম্মু উমারার (রা) কানে পৌঁছলে তিনি মনকে শক্ত করেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যদি কখনো মুসলিম বাহিনী এই ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তখন তিনিও অংশগ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ চাইলে নিজের হাতে এই জালিমকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।[২৪]

মুসায়লামার এহেন ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির কথা খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) কানে এলো। তিনি এই ধর্মদ্রোহিতার মূল উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে চারহাজার সৈন্যসহ হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদকে (রা) পাঠান। উম্মু 'উমারা (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি খলীফার নিকট এই অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। উম্মু 'উমারা (রা) খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) বাহিনীর সাথে ইয়ামামায় গেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। বারো শো মুজাহিদ শহীদ হলেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুসায়লামার আট/নয় হাজার সৈন্য মারা যায়। অবশেষে মুসায়লামার হত্যার মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। উম্মু 'উমারা (রা) সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য তাঁর ছেলের ঘাতক পাষণ্ড মুসায়লামা আল-কাজ্জাব। এক সময় তিনি একহাতে বর্শা ও অন্য হাতে তরবারি চালাতে চালাতে শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে মুসায়লামার কাছে পৌঁছে যান। এ পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁর দেহের এগারোটি স্থান নিযা ও তরবারির আঘাতে আহত হয়। শুধু তাই নয়, একটি হাত বাহু থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। এতেও তাঁর সিদ্ধান্ত টলেনি। মোটেও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তিনি আরো একটু এগিয়ে গেলেন। মুসায়লামাকে তাক করে তরবারির কোপ মারবেন, ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক সাথে দুইখানি তরবারির কোপ মুসায়লামার উপর এসে পড়ে। আর সে কেটে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে। তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, ছেলে 'আবদুল্লাহ পাশে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি তাকে হত্যা করেছো? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন: একটি কোপ আমার এবং অন্যটি ওয়াহশীর। আমি বুঝতে পারছিনে কার কোপে সে নিহত হয়েছে। উম্মু উমারা (রা) দারুণ উৎফুল্ল হলেন এবং তখনই সিজদায়ে শুকর আদায় করলেন।[২৫]

---

২৪. প্রাগুক্ত; সাহাবিয়াত-২০৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১

২৫. ইবন হিশাম-১/৪৬৬; সাহাবিয়াত-২০৮

উম্মু 'উমারার (রা) যখম ছিল খুবই মারাত্মক। একটি হাতও কাটা গিয়েছিল। একারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বাহিনী প্রধান হযরত খালিদ-ইবন ওয়ালীদ ছিলেন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি তাঁকে খুব তা'জীমও করতেন। তিনি আপন তত্ত্বাবধানে তাঁর সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চিকিৎসায় যাতে কোন ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাই তিনি সুস্থ হয়ে সারাজীবন খালিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর প্রশংসায় তিনি বলতেন: তিনি একজন সহমর্মী, উঁচুমনা ও বিনয়ী নেতা। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমার সেবা ও চিকিৎসা করেন। মদীনায় ফেরার পর খলীফা আবু বকর (রা) তাঁকে প্রায়ই দেখতে যেতেন।[২৬]

হযরত উম্মু 'উমারা (রা) ছিলেন একজন মহিলা বীর যোদ্ধা। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বিস্ময়কর বাস্তবতা আমরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর যে রণমূর্তি আমরা উহুদ ও ইয়ামামার যুদ্ধে দেখি, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন উহুদের ময়দানে। রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতেন। একদিন রাসূল (সা) আসলেন। তিনি তাঁকে খাবার দিলেন। রাসূল (সা) তাঁকেও তাঁর সাথে খেতে বললেন। উম্মু 'উমারা বললেন, আমি রোযা আছি। রাসূল (সা) বললেন : যখন রোযাদারের নিকট কিছু খাওয়া হয় তখন ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করে।[২৭]

খলীফা হযরত 'উমারও (রা) উম্মু 'উমারার (রা) সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতকালে একবার গনীমতের মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে। তার মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও দামী। অনেকে বললেন, এটি খলীফা তনয় আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রীকে দেওয়া হোক। অনেকে খলীফার স্ত্রী কুলছূম বিনত 'আলীকে (রা) দেওয়ার কথা বললেন। খলীফা কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, আমি এ চাদরের সবচেয়ে বেশী হকদার উম্মু 'উমারাকে মনে করি। এটি তাকেই দেব। কারণ, আমি উহুদের দিন তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : 'আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করছিলাম, শুধু উম্মু 'উমারাকেই লড়তে দেখছিলাম।' অতঃপর তিনি চাদরটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।[২৮]

রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এ হাদীছগুলি 'উব্বাদ ইবন তামীম ইবন যায়দ, হারিছ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন কা'ব, 'আকরামা ও লায়লা বর্ণনা করেছেন।[২৯]

হযরত উম্মু 'উমারার (রা) মৃত্যুসন সঠিকভাবে জানা যায় না। মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত যে জীবিত ছিলেন সেটা নিশ্চিত। তবে তার পরে কতদিন জীবিত ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেননি।

---

২৬. তাবাকাত-৮/৪১৬
২৭. প্রাগুক্ত; মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৩৯; তিরমিজী-(৭৮৫); ইবন মাজাহ-(১৭৪৮)
২৮. তাবাকাত-৮/৪১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১; আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৬
২৯. আল-ইসাবা-৪/৪৮০

হযরত উম্মু 'উমারা (রা) সব সময় রাসূলের (সা) মজলিসে উপস্থিত থাকতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতেন। এভাবে তাঁর বিশ্বাস প্রতিদিনই দৃঢ় হতো এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পেত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে বলেন : আমি দেখতে পাচ্ছি সব জিনিসই পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য কোন কিছুর উল্লেখ করা হয় না। অর্থাৎ তাঁর দাবী ছিল কুরআনে পুরুষদের কথা যেমন এসেছে নারীদের কথাও তেমন আসুক। তার এমন দাবীর প্রেক্ষাপটে নাযিল হলো সূরা আল-আহযাবের ৩৫তম আয়াতটি।[৩০]

---

৩০. তিরমিজী-৪/১১৬; প্রাগুক্ত-৪/৪৭৯

উম্মু ওয়ারাকা বিন্ত নাওফাল (রা)

এ পৃথিবীতে এমন অনেক মহিলা আছেন কালচক্র যাঁদেরকে লুকিয়ে রেখেছে এবং ইতিহাসও তাঁদের ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জীবনে এমন কোন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁদের জীবনী প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর যখন তাঁদের স্মরণ ও স্মৃতির উপর থেকে পুঞ্জিভূত ধুলি ও আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তাঁদের ছবিগুলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। তাঁদের একজন হলেন উম্মু ওয়ারাকা আল-আনসারিয়্যা (রা)। উম্মু ওয়ারাকা– এই উপনামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সাহাবীদের চরিত অভিধানের একটিতেও তাঁর আসল নামটি উল্লেখ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে "আশ-শাহীদা" (মহিলা শহীদ) উপাধি দান করেন।[১] তাঁর বংশ পরিচয় এ রকম : উম্মু ওয়ারাকা বিন্ত 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হারিছ ইবন 'উওয়াইমির ইবন নাওফাল। তবে উসুদুল গাবা গ্রন্থে "উওয়াইমির'-এর স্থলে 'উমাইর' এসেছে। তিনি তাঁর বংশের এক উর্দ্ধতন পুরুষ "নাওফাল"-এর প্রতি আরোপিত হয়ে উম্মু ওয়ারাকা বিন্ত নাওফাল বলে পরিচিতি লাভ করেছেন।[২] তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সন সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে একথা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত যে, খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছেন, তেমনিভাবে পেয়েছেন খলীফা আবূ বকরের (রা) খিলাফতকালের পুরোটা এবং 'উমারের (রা) খিলাফতকালের কিছুটা। তিনি সম্ভবত হিজরী বাইশ সনে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

উম্মু ওয়ারাকা ছিলেন একজন আনসারী মহিলা। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের অব্যবহিত পরে যে সকল মহিলা তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করে তাঁর নিকট বাই'আত করেন তিনি তাঁদের একজন।[৪] তিনি ইসলামকে অতি চমৎকার রূপে ধারণ করেন এবং আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আল-কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং তার বেশীর ভাগ মুখস্থ করে ফেলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেন।[৫] একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা) যখন কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করেন, তখন এই উম্মু ওয়ারাকার সংগ্রহেরও সাহায্য নেন। তিনি কুরআনের কিছু কিছু সূরা লেখা ছিল এমন কিছু সহীফা (পুস্তিকা) সংরক্ষণ করতেন।[৬] তাঁর কাছে

---

১. আল-ইসাবা-৪/৪৮১
২. উসুদুল গাবা-৫/৬২৬; তাহযীবুত তাহ্যীব-১২/৪৮২
৩. তাবাকাত-৯/১৬৫; নিসা' রায়িদাত, পৃ. ১০৮
৪. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৮৪; তাবাকাত-৮/৪৫৭
৫. আল-ইসাবা-৪/৫০৫
৬. নিসা' রায়িদাত-১০৮

সমগ্র কুরআন না হলেও অধিকাংশ লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ঈমানদার মহিলা। দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ। রাসূল (সা) মাঝে মাঝে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর গৃহে যেতেন। তিনি ছিলেন সেই সব মুষ্টিমেয় মহিলার একজন যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাসূল (সা) তাঁদের বাড়ীতে যেতেন। রাসূল (সা) তাঁর অর্থ-সম্পদ ও সমাজে উঁচু স্থানের জন্য তাঁকে এভাবে মূল্যায়ন করতেন না, বরং তাঁর আল্লাহর উপর ঈমান, দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস এবং দীনের বিধি-বিধানের দক্ষতা ও 'ইবাদাত-বন্দেগীর কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতেন।

হিজরী ২য় সনে রাসূল (সা) বদরে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ খবর উম্মু ওয়ারাকার নিকট পৌঁছলো। তিনি যুদ্ধে যোগদানের জন্য জিদ ধরে বসলেন। ঘর-গৃহস্থলীর নানা রকম দায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালনের কর্তব্যসমূহ তাঁকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" (আল্লাহর পথে জিহাদ)-এর কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারলো না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন, যুদ্ধে আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধবেন, রোগীদের সেবা করবেন, তাঁদের পানাহারের নিশ্চয়তা বিধান করবেন এবং যুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধাদের প্রয়োজনে সাড়া দেবেন। তিনি সেখানে এমন সব ভূমিকা পালন করবেন যার গুরুত্ব যোদ্ধাদের ভূমিকার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে এই বের হওয়াতে শাহাদাতও দান করতে পারেন। আল-ইসাবার বর্ণনায় তাঁর বক্তব্য এভাবে এসেছে :[৭]

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধে যেতাম। আপনাদের অসুস্থদের সেবা করতাম, আহতদের ঔষধ পান করাতাম। এতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাহাদাতও দান করতে পারেন।' জবাবে রাসূল (সা) বলেন : 'ওহে উম্মু ওয়ারাকা! তুমি ঘরেই অবস্থান কর। নিশ্চয় আল্লাহ ঘরেই তোমার শাহাদাতের ব্যবস্থা করবেন।' অন্য একটি বর্ণনায় "আল্লাহ তোমাকে শাহাদাত দান করবেন" কথাটি এসেছে।[৮] মূলত এ দিন থেকেই রাসূল (সা) তাঁকে শহীদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে সাহাবীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। বলতেন :[৯]

'انطلقوابنا نزور الشهيدة' – 'তোমরা আমার সাথে চলো, আমরা এই মহিলা শহীদকে একটু দেখে আসি।' রাসূলের (সা) এ জাতীয় কথা দ্বারা এই মহিলা যে শহীদ হবেন সেদিকেই ইঙ্গিত করতেন।

---

৭. আল-ইসাবা-৪/৫০৫

৮. তাবাকাত-৮/৪৫৭; আল-ইসতী'আব-৪/৪৮১; সুনানু আবী দাউদ-১/৯৭; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-২/৩৫৭

৯. আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৬৩; উসুদুল গাবা-৫/৬২৬ (৭৭১৮)

ইসলামের ইতিহাসে অনেকগুলো বিষয়ে উম্মু ওয়ারাকার অগ্রগামিতার কথা জানা যায়। যেমন :

১. তিনি প্রথম মহিলা যাঁর গৃহে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

২. মদীনায় সর্বপ্রথম তিনি মহিলাদের নামাযের জামা'আত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই জামা'আতের ইমামতি কর ।

৩. তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা রাসূল (সা) যাঁকে "শাহীদা" উপাধি দান করেন।

৪. ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যাঁকে হত্যার অভিযোগে একজন দাস ও একজন দাসীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[১০]

উম্মু ওয়ারাকা তাঁর নিজ বাড়ীতে একটি নামায-ঘর প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক নামাযের ওয়াকতে আযান দেওয়ার জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে আযান দেওয়ার জন্য একজন মুআয্যিন ঠিক করে দেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় আযান দিতেন। উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।[১১] তিনি প্রথম মহিলা যিনি এ সৌভাগ্য ও গৌরবের অধিকারী হন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মু ওয়ারাকার মু'আয্যিনকে দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির নাম 'আবদুর রহমান।[১২]

রাসূল (সা) তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের কথা জানতেন। তাই তিনি মুআয্যিনের আযান দেওয়ার পর উম্মু ওয়ারাকাকে তাঁর নিজের বাড়ীর ও প্রতিবেশী মেয়েদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে জামা'আত কায়েম করার ও তাতে ইমামতি করার অনুমতি দান করেন। এ ব্যবস্থা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে অর্থাৎ উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যাঁর বাড়ীতে মেয়েদের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩]

উম্মু ওয়ারাকার (রা) বয়স বেড়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা বড় হলো। মেয়েদের বিয়ে হলো এবং এক এক করে তারা স্বামীর ঘরে চলে গেল। ছেলেরাও নিজ নিজ দায়িত্বের খাতিরে মায়ের নিকট থেকে দূরে যেতে বাধ্য হলো। উম্মু ওয়ারাকার বাড়ীটি এখন একেবারে শূন্য প্রায়।

তিনি নিজের সেবা ও বাড়ী-ঘর দেখাশুনা করার জন্য একজন দাস ও একজন দাসী রাখলেন। তিনি তাদের সাথে অতি ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁদেরকে কথা দেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তারা স্বাভাবিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই দাস-দাসী খুব শীঘ্র উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখতে পেল

---

১০. নিসা' রায়িদাত-১১০

১১. আবূ দাঊদ-১/৯৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৯৭

১২. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২৯৩

১৩. প্রাগুক্ত; সাহাবিয়াত-২১৬

না। তাদের আর তর সইলো না। তারা তাঁর পরিবারের লোকদের অনুপস্থিতিতে খালি বাড়ীতে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। সুযোগ মত এক রাতে তারা একটি কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করলো এবং নিজেদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত মনে করে পালিয়ে গেল।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উম্মু ওয়ারাকার (রা) বাড়ীর আযান ও মেয়েদের জামা'আতের তোড়জোড়ের সাড়া-শব্দ প্রতিদিন শুনতে পেতেন। একদিন তিনি বললেন, আচ্ছা গতকাল থেকে তো উম্মু ওয়ারাকা খালার কুরআন পাঠের শব্দ শুনতে পাচ্ছিনে। তাঁর কি হলো? তাঁর খবর জানার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। লোকটি ফিরে এসে বললো বাড়ীটি বাইরে থেকে তালা মারা এবং দরজায় টোকা দিয়ে ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 'উমারের (রা) সন্দেহ হলো। এবার তিনি নিজে গেলেন। বাড়ীতে কাকেও না দেখে ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকেই দেখলেন একটি চাদরে জড়ানো অবস্থায় তাঁর লাশ মেঝেতে পড়ে আছে। তিনি জোরে "আল্লাহু আকবার" বলে ওঠেন। তারপর মন্তব্য করেন : রাসূল (সা) যখন তাঁকে "শাহীদা" উপাধি দেন তখন সত্যই বলেছিলেন।[১৪]

তারপর 'উমার (রা) মসজিদের মিম্বরে উঠে ঘোষণা দেন যে, উম্মু ওয়ারাকা শহীদ হয়েছেন। তাঁর দুই দাস-দাসী তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে পালিয়েছে। তিনি তাদেরকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। মুহূর্তে জনতা তাদের খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় ধরা পড়ে এবং তাদেরকে মদীনায় খলীফা 'উমারের (রা) সামনে হাজির করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রথমে তারা হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করতে চাইলেও পরে স্বীকার করে যে, দু'জন একযোগে তাঁকে হত্যা করেছে। তখন 'উমার (রা) তাঁর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন : আল্লাহর রাসূল (সা) সত্য বলেছেন যখন তিনি বলতেন : "انطلقوابنا نزور الشهيدة"- তোমরা আমার সাথে চলো, এই শহীদকে দেখে আসি। এভাবে উম্মু ওয়ারাকা (রা) হন ইসলামের প্রথম মহিলা যাঁকে "আশ-শাহীদা" অভিধায় ভূষিত করা হয়।

দাস-দাসীর দু'জনের শাস্তি ছিল অবধারিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যার নির্দেশ দেন। তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এ দু'জন দাস-দাসী ছিল মদীনার প্রথম শূলীতে চড়ানো দু'ব্যক্তি, আর উম্মু ওয়ারাকা হলেন ইসলামের প্রথম মহিলা যাঁকে হত্যার কারণে একজন দাস ও একজন দাসীকে শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[১৫]

দীনের তাৎপর্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, পাড়া-প্রতিবেশী ও তাঁর নিকট আগত মহিলাদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কারণে উম্মু ওয়ারাকা (রা) মুসলিম নারীদের একজন নেত্রীতে পরিণত হন। শাহাদাত লাভের বাসনায় জিহাদে

---

১৪. আল-ইসাবা-৪/৫০৫

১৫. আবূ দাউদ-১/৯৭; তাবাকাত-৮/৪৫৭; আল-ইসতী'আব-৪/৪৮২

যোগদানের যে ইচ্ছার কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করেন তাতে তাঁর মহত্ব ও মর্যাদা শতগুণ বেড়ে যায়।

উম্মু ওয়ারাকার (রা) নিহত হওয়ার মধ্যে এমন প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, বিশেষত সেই দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানী যদি হয় অমুসলিম। জগতে এমন বহু দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর কথা জানা যায় যারা তাদের মনিবদের জীবনে বহু অকল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে একথাটি শুনা যায় যে, 'তুমি যার উপকার করেছো তার অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাক'। উম্মু ওয়ারাকা তাঁর দাস-দাসীর প্রতি সুন্দর আচরণ করেছিলেন, তাদেরকে মুক্তির অঙ্গীকার করেছিলেন, আর তারই পরিণতিতে তাদেরই হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। আধুনিক যুগের মুসলিম মহিলাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

উম্মু ওয়ারাকা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে পৌত্ররা বর্ণনা করেছেন।[১৬]

---

১৬. নিসা' রায়িদাত-১১৩

উম্মু হাকীম বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভের পর মক্কা এবং পরে মদীনায় বিশ বছরের অধিক সময় আরবের লোকদেরকে, বিশেষ করে মক্কাবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাদেরকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করেছে। তাদের সে আচরণ ছিল এমন :[১]

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا أَكِنَّةٌ مِمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ وَفِىْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُوْنَ.

'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

তারা প্রেম-প্রীতির বদলা দিল শত্রুতা দ্বারা এবং কল্যাণ ও উপকারের বদলা দিল অকল্যাণ ও ক্ষতির দ্বারা, তাদের সে আচরণ ছিল এমন :[২]

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.

'তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌছবে।'

তারা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাতেও তারা তুষ্ট হতে পারেনি। বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে সব রকমের সুযোগকে কাজে লাগায়।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাদের উপর বিজয় দান করলেন। মক্কা বিজয় হলো। এতবড় বিশ্ব যখন তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে পড়লো, তারা যখন চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার দেখতে লাগলো তখন আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের প্রতি মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। তাদের বিগত দিনের সকল আচরণ ক্ষমা করে দিলেন। মক্কাবাসীরা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলো। উম্মু হাকীম, তাঁর পিতা, মাতা ও স্বামী– সকলে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ চার জনই ছিলেন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। ইসলামের সূচনা থেকে ঈমান আনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ বছর তাঁদের শত্রুতা ছিল মাত্রা ছাড়া।

---

১. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্-৫

২. সূরা আল-কামার-৩

উম্মু হাকীম মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার সন্তান। উম্মু হাকীম ডাক নাম। এর অন্তরালে তাঁর আসল নামটি হারিয়ে গেছে। তা আর জানা যায় না। উম্মু হাকীমের পরিবারটি ছিল কুরাইশ বংশের মধ্যে সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের অন্যতম কেন্দ্র। পিতা আল-হারিছ ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমী, নরাধম আবূ জাহলের ভাই। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের উপর অটল রাখার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) হুনাইন যুদ্ধের গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে একশো (১০০) উট তাঁকে দান করেন। তিনি একজন ভালো মুসলমান হন। পরবর্তীকালে একজন মুজাহিদ হিসেবে শামে যান এবং সেখানে 'তাঊন' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৩]

মা ফাতিমা বিনত আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমিয়্যা প্রখ্যাত সেনানায়ক খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের (রা) বোন। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন। স্বামী আল-হারিছের শাম অভিযানে তিনিও সফর সঙ্গী হন। আল-হারিছের ঔরসে তিনি ছেলে 'আবদুর রহমান ও মেয়ে উম্মু হাকীমের জন্ম দেন।[৪]

উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা ইবন আবী জাহল আল-মাখযূমী জাহিলী মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে একজন অতি ভালো মুসলমান হন। শাম অভিযানে বের হন এবং হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইন, মতান্তরে ইয়ারমূক যুদ্ধে শহীদ হন। উম্মু হাকীমের মামা সাইফুল্লাহ খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ (রা)।

এমনই এক পরিবার ও পরিবেশে উম্মু হাকীম বেড়ে ওঠেন। চাচাতো ভাই 'ইকরিমাকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা) মক্কায় রাসূল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। যে দিন তিনি ইসলামের দিকে মক্কাবাসীদেরকে আহ্বান জানালেন সেই দিন থেকে এই পরিবারটি মহানবী (সা) ও ইসলামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যত রকম ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে, তার সবকিছুতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উহুদ যুদ্ধে আল-হারিছ, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা, 'ইকরিমা, তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীম ও খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ– কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামের বিরোধিতা ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে কোন সুযোগকে তাঁরা হাতছাড়া করেননি। এমনকি হযরত রাসূলে কারীম (সা) যাদেরকে মহা অপরাধী বলে ঘোষণা দেন এবং কা'বার গিলাফের নীচে পাওয়া গেলেও হত্যার নির্দেশ দেন, উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা তাদের অন্যতম।

---

৩. আয-যাহাবী, তারীখ আল-ইসলাম-২/১৮৩-১৮৪
৪. তারীখু দিমাশ্ক-তারাজিম আন-নিসা'-৩০৫-৩০৭

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা বিজয়ের পর যে অবস্থান গ্রহণ করেন মানব জাতির ইতিহাসে তা এক অনন্য আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সে দিন তাঁর দয়া ও করুণা শত্রু-মিত্র, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে বেষ্টন করে। দীর্ঘদিন যাবত যারা তাঁর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেছে, সেদিন তাঁর এই ব্যাপক ক্ষমা ও দয়া তাদের পাষাণ হৃদয়ে পরম প্রশান্তি বয়ে আনে। মুহূর্তে তাদের অন্তর জেগে ওঠে এবং ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে পতঙ্গের ন্যায় আলোর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করে। উম্মু হাকীম নিজে তাঁর স্বামীর জন্য এই ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ গোত্রের অন্য সব মহিলা, যেমন : ফাতিমা বিন্‌ত আল-ওয়ালীদ, হিন্দ বিনত 'উতবা, ফাখ্‌তা বিন্‌ত আল-ওয়ালীদ প্রমুখের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বাই'আত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (সা) তাঁকে যথেষ্ট সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ কারণে মহিলা সমাজে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন।

উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা ছিলেন ইসলামের চরম দুশমন। মহানবীর দৃষ্টিতে মহা অপরাধী। তাই রাসূল (সা) তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন। মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে তিনি ইয়ামনে পালিয়ে যান। স্ত্রী উম্মু হাকীমের চেষ্টায় তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু হাকীম (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 'ইকরিমাকে হত্যা করতে পারেন, এ ভয়ে সে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গেছে। আপনি তাঁকে নিরাপত্তা দিন, আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দিবেন। রাসূল (সা) বললেন : সে নিরাপদ।

সেই মুহূর্তে উম্মু হাকীম স্বামী 'ইকরিমার সন্ধানে বের হলেন। সংগে নিলেন তাঁর এক রোমান ক্রীতদাসকে। তাঁরা দু'জন চলছেন। পথিমধ্যে দাসের মনে তার মনিবের প্রতি অসৎ কামনা দেখা দিল। সে চাইলো তাঁকে ভোগ করতে, আর তিনি নানা রকম টালবাহানা করে সময় কাটাতে লাগলেন। এভাবে তাঁরা একটি আরব গোত্রে পৌঁছলেন। উম্মু হাকীম তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তারা সাহায্যের আশ্বাস দিল। তিনি দাসটিকে তাদের জিম্মায় রেখে একাকী পথে বের হলেন। অবশেষে তিহামা অঞ্চলে সাগর তীরে 'ইকরিমার দেখা পেলেন। সেখানে তিনি এক মাঝির সাথে কথা বলছেন তাকে পার করে দেওয়ার জন্য, আর মাঝি তাকে বলছেন :

– সত্যবাদী হও।

'ইকরিমা বললেন : কিভাবে আমি সত্যবাদী হবো?

মাঝি বললেন :

– তুমি বলো, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

'ইকরিমা বললেন : আমি তো শুধু এ কারণে পালিয়েছি।

তাদের দু'জনের এ কথোপকথনের মাঝখানেই উম্মু হাকীম উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন :

'হে আমার চাচাতো ভাই! আমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি। আমি তাঁর কাছে আপনার জন্য আমান (নিরাপত্তা) চেয়েছি। তিনি আপনার আমান মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং এরপরও আপনি নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

'ইকরিমা জানতে চাইলেন : তুমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলেছো?

বললেন : হাঁ, আমিই তাঁর সাথে কথা বলেছি এবং তিনি আপনাকে আমান দিয়েছেন। বার বার তিনি তাঁকে আমানের কথা শোনাতে লাগলেন। অবশেষে আশ্বস্ত হয়ে স্ত্রীর সাথে ফিরে চললেন।[৫]

পথে চলতে চলতে উম্মু হাকীম তাঁর দাসটির অসৎ অভিপ্রায়ের কথা স্বামীকে বললেন। ফেরার পথে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই 'ইকরিমা দাসটিকে হত্যা করেন। পথিমধ্যে তাঁরা এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। 'ইকরিমা চাইলেন স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হতে। স্ত্রী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন : আমি একজন মুসলিম নারী এবং আপনি এখনো একজন মুশরিক। স্ত্রীর কথা শুনে 'ইকরিমা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন : তোমার ও আমার মিলনের মাঝখানে যে ব্যাপারটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতো খুব বিরাট ব্যাপার।

এভাবে 'ইকরিমা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন : খুব শিগ্‌গির 'ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মু'মিন হিসেবে তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার পিতাকে গালি দেবে না। মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে তা জীবিতদের মনে কষ্টের কারণ হয় এবং তা মৃতের কাছেও পৌঁছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে 'ইকরিমা তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীমসহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাদর গায়ে না জড়িয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল (সা) বসলেন। 'ইকরিমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন :

ইয়া মুহাম্মাদ! উম্মু হাকীম আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে আমান দিয়েছেন।

নবী বললেন : সে ঠিক বলেছে। তুমি নিরাপদ।

'ইকরিমা বললেন : মুহাম্মাদ আপনি কিসের দা'ওয়াত দিয়ে থাকেন?

রাসূল (সা) বললেন : আমি তোমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছি তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তারপর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এভাবে তিনি ইসলামের সবগুলি আরকান বর্ণনা করলেন।

---

৫. আ'লাম আন-নিসা'-১/২৮১

'ইকরিমা বললেন : আল্লাহর কসম! আপনি কেবল সত্যের দিকেই দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং কল্যাণের কথা বলছেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন :

'এ দা'ওয়াতের পূর্বেই আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল। তারপর 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা 'আবদুহু ওরাসূলুহু'– বলতে বলতে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

রাসূল (সা) বললেন : তুমি বলো, 'উশহিদুল্লাহা ওয়া উশহিদু মান হাদারা আন্নি মুসলিমুন মুজাহিদুন মুহাজিরুন'– আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।

'ইকরিমা তাই উচ্চারণ করলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : অন্য কাউকে আমি দিচ্ছি, এমন কোন কিছু আজ যদি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।'

'ইকরিমা বললেন : আমি চাচ্ছি, যত শত্রুতা আমি আপনার সাথে করেছি, যত যুদ্ধে আমি আপনার মুখোমুখি হয়েছি এবং আপনার সামনে অথবা পিছনে যত কথাই আমি আপনার বিরুদ্ধে বলেছি– সবকিছুর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে আমার মাগফিরাত কামনা করুন।

রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! যত শত্রুতা সে আমার সাথে করেছে, তোমার নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে যত পথই সে ভ্রমণ করেছে– সবকিছুই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে বা অগোচরে আমার মানহানিকর যত কথাই সে বলেছে, তা-ও তুমি ক্ষমা করে দাও।

আনন্দে 'ইকরিমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যতকিছু আমি ব্যয় করেছি তার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত যুদ্ধ আমি করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহর পথে করবো।[৬]

এদিন থেকেই তিনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কাফেলায় শরীক হলেন এবং ইয়ারমূক যুদ্ধে শাহাদাত বরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কৃত অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেন।

উম্মু হাকীম (রা) স্বামী 'ইকরিমার (রা) সাথে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য শামে যান। ইয়ারমূক রণাঙ্গনে রোমান ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ রমণীরা অসি চালনায় পুরুষ যোদ্ধাদেরকেও হার মানায়। এই রমণীদের মধ্যে উম্মু হাকীমও একজন। এই ইয়ারমূক যুদ্ধে উম্মু হাকীম (রা) স্বামীকে হারান। 'ইকরিমা (রা) এ যুদ্ধে শহীদ হন।[৭] চার মাস দশ দিন 'ইদ্দাত পালনের পর বহু লোক

---

৬. আত-তাবারী, তারীখ-২/১৬০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/২৯৭; আল-আ'লাম-২/২৬৯; উসুদুল গাবা-৫/৫৭৭; আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-১/২০৫-২০৮

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩২৪; আল-ইসাবা-৪/৪২৬

তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানও (রা) তাঁদের একজন। তিনি সকলকে হতাশ করে খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের (রা) প্রস্তাবে সাড়া দেন। চার শো দীনার মাহরের বিনিময়ে তাঁর সাথে বিয়ে সম্পন্ন হয়। 'আকদ সম্পন্ন হলেও বাসর শয্যার পূর্বেই দিমাশকের দক্ষিণে সংঘটিত "মারজ আস-সাফার" যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মুসলিম সৈনিকরা সেখানে চলে যায়। হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধে যাওয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে বাসর সম্পন্ন করতে চাইলেন। স্ত্রী উম্মু হাকীম বললেন : শত্রু বাহিনীর এই সমাবেশ পর্যুদস্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

খালিদ (রা) বললেন : আমার অন্তর বলছে এই যুদ্ধে আমি শাহাদাত বরণ করবো। উম্মু হাকীম (রা) আর আপত্তি করলেন না। মারজ আস-সাফারে একটি পুলের ধারে একটি তাঁবুর মধ্যে তাঁদের বাসর শয্যা রচিত হয় এবং সেখানে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন।

পরবর্তীকালে এ পুলটির নাম হয়- "কানতারাতু উম্মি হাকীম"- উম্মু হাকীমের পুল। সকালে ওলীমা ভোজও হয়। ভোজ শেষ হতে না হতেই রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খালিদ (রা) শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। উম্মু হাকীম (রা) তখনো নববধূর সাজে। হাতে মেহেদীর রং, দেহে সুগন্ধি। যে তাঁবুতে রাতে বাসর করেছেন, তার একটি খুঁটি উঠিয়ে হাতে তুলে নিলেন। সেই তাঁবুর পাশেই তিনি রোমান সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং সেই খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে সেদিন তিনি সাতজন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[৮]

উম্মু হাকীম (রা) আবার বিধবা হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং এখানে তাঁর গর্ভে কন্যা ফাতিমা বিনত 'উমারের জন্ম হয়। ফাতিমার চাচা যায়দ ইবন আল-খাত্তাবের ছেলের সাথে এই ফাতিমার বিয়ে হয়।[৯]

বিভিন্ন ঘটনার আলোকে বুঝা যায় উম্মু হাকীম (রা) স্বামী হযরত 'উমারের (রা) জীবদ্দশায় তাঁরই খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। আল্লামা যিরিক্‌লী সুনির্দিষ্টভাবে হিজরী ১৪ সনের কথা বলেছেন।[১০]

---

৮. আল-ইসতী'আব-৪/৪২৫; তারীখু দিমাশ্‌ক-৫০৬; উসুদুল গাবা-৫/৫৭৭; আ'লাম আন-নিসা'-১/২৮১; আল-ইসাবা-৪/৪২৬

৯. আত-তাবারী, তারীখ-২/৫৬৪; আয-যাহাবী, তারীখ-৩/২৭৪-২৭৫; নাসাবু কুরায়শ-৩০৩

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্‌-৪৮৯

উমামা বিন্‌ত আবিল 'আস (রা)

হযরত উমামার বড় পরিচয় তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্রী। তাঁর পিতা আবুল 'আস (রা) ইবন রাবী' এবং মাতা যায়নাব (রা) বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)। উমামা তাঁর নানার জীবদ্দশায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অনেক আগেই নানী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইনতিকাল করেন। উমামার দাদী ছিলেন হযরত খাদীজার ছোট বোন হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ। হিজরী ৮ম সনে উমামার মা এবং দ্বাদশ সনে পিতা ইনতিকাল করেন।[১]

নানা হযরত রাসূলে কারীম (সা) শিশু উমামাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। সব সময় তাকে সংগে সংগে রাখতেন। এমনকি নামাযের সময়ও কাছে রাখতেন। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, রাসূল (সা) তাকে কাঁধের উপর বসিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। রুকূ'তে যাওয়ার সময় কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেন। তারপর সিজদায় গিয়ে তাকে মাথার উপর বসাতেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় কাঁধের উপর নিয়ে আসতেন। এভাবে তিনি নামায শেষ করতেন। এ আচরণ দ্বারা উমামার প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্য কিছুটা অনুমান করা যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত আবূ কাতাদা (রা) বলেন, একদিন বিলাল আযান দেওয়ার পর আমরা জুহর, মতান্তরে আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষায় আছি, এমন সময় রাসূল (সা) উমামা বিন্‌ত আবিল 'আসকে কাঁধে বসিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। উমামা তখনও তার নানার কাঁধে একইভাবে বসা।

রাসূল (সা) রুকূ'তে যাবার সময় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখেন। তারপর রুকূ'-সিজদা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়ান তখন আবার তাঁকে ধরে কাঁধের উপর উঠিয়ে নেন। প্রত্যেক রাক'আতে এমনটি করে তিনি নামায শেষ করেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বর্ণনা করেছেন। হাবশার সম্রাট নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহকে (সা) কিছু স্বর্ণের অলঙ্কার উপহার হিসেবে পাঠান, যার মধ্যে একটি স্বর্ণের আংটিও ছিল। রাসূল (সা) সেটি উমামাকে দেন।[৩]

উমামার প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের প্রবলতা আরেকটি ঘটনার দ্বারাও অনুমান করা যায়। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মুক্তা বসানো স্বর্ণের একটি হার আসে। হারটি হাতে করে ঘরে এসে বেগমদের দেখিয়ে বলেন : দেখ তো, এটি কেমন? তাঁরা সবাই

---

১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়াতিন নুবুওয়াহ্-৫৩৬-৫৩৭
২. সুনানু নাসাঈ-২/৪৫, ৩/১০; তাবাকাত-৮/২৩২; আল ইসাবা-৪/২৩৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৮২
৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৮৯

বলেন : অতি চমৎকার! এর চেয়ে সুন্দর হার আমরা এর আগে আর দেখিনি। রাসূল (সা) বললেন : এটি আমি আমার পরিবারের মধ্যে যে আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় তার গলায় পরিয়ে দেব। 'আইশা (রা) মনে মনে ভাবলেন, না জানি তিনি এটা আমাকে না দিয়ে অন্য কোন বেগমের গলায় পরিয়ে দেন কিনা। অন্য বেগমগণও ধারণা করলেন, এটা হয়তো 'আইশার (রা) ভাগ্যেই জুটবে। এদিকে বালিকা উমামা তাঁর নানা ও নানীদের অদূরেই মাটিতে খেলছিল। রাসূল (সা) এগিয়ে গিয়ে তার গলায় হারটি পরিয়ে দেন।[৪]

হযরত উমামার (রা) পিতা আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা) হিজরী ১২ সনে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মামাতো ভাই যুবাইর ইবন আল-'আওয়ামের সাথে উমামার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলে যান। এদিকে উমামার খালা হযরত ফাতিমাও (রা) ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বামী 'আলীকে বলে যান, তাঁর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন। অতঃপর উমামার (রা) বিয়ের বয়স হলো। যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম (রা) হযরত ফাতিমার (রা) অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় 'আলীর (রা) সাথে উমামার (রা) বিয়ে সম্পন্ন হলো। তখন আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের (রা) খিলাফতকাল।

হিজরী ৪০ সন পর্যন্ত তিনি 'আলীর (রা) সাথে বৈবাহিক জীবন যাপন করেন। এর মধ্যে 'আলীর (রা) জীবনের উপর দিয়ে নানা রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। অবশেষে হিজরী ৪০ সনে তিনি আততায়ীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এই আঘাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী উমামাকে বলেন, আমার পরে যদি তুমি কোন পুরুষের প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে আল-মুগীরা ইবন নাওফালকে বিয়ে করতে পার। তিনি আল-মুগীরাকেও বলে যান, তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন। তিনি আশংকা করেন, তাঁর মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া (রা) উমামাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন। তাঁর এ আশংকা সত্যে পরিণত হয়। তিনি ইনতিকাল করলেন। উমামা 'ইদ্দত তথা অপেক্ষার নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) মোটেই দেরী করলেন না। তিনি মারওয়ানকে লিখলেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে উমামার নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠাও এবং এ উপলক্ষে এক হাজার দীনার ব্যয় কর। এ খবর উমামার (রা) কানে গেল। তিনি সাথে সাথে আল-মুগীরাকে লোক মারফত বললেন, যদি আপনি আমাকে পেতে চান, দ্রুত চলে আসুন। তিনি উপস্থিত হলেন এবং হযরত হাসান ইবন 'আলীর (রা) মধ্যস্থতায় বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।[৫] এই আল-মুগীরার স্ত্রী থাকা অবস্থায় মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। 'আলীর (রা) ঘরে উমামার (রা) কোন সন্তান হয়নি। তবে আল-মুগীরার ঘরে তিনি এক ছেলের মা হন

---

৪. আল-ইসতী'আব-৪/২৩৮; উসুদুল গাবা-৫/৪০০; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-২/৪৫২; দুররুস সাহাবা ফী মানাকিব আল-কারাবাহ্ ওয়াস সাহাবা-৫৩৫; আ'লাম আন-নিসা'-১/৭৭

৫. আল-ইসাবা-৪/২৩৭

এবং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া। এ জন্য আল-মুগীরার ডাকনাম হয় আবূ ইয়াহইয়া।[৬] তবে অনেকে বলেছেন, আল-মুগীরার ঘরেও তিনি কোন সন্তানের মা হননি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া আর কারো বংশধারা অব্যাহত নেই। হতে পারে আল-মুগীরার ঔরসে ইয়াহইয়া নামের এক সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু শিশুকালেই তার মৃত্যু হয়। উমামার মৃত্যুর মাধ্যমে নবী দুহিতা যায়নাবের (রা) বংশধারার সমাপ্তি ঘটে। কারণ তাঁর পূর্বেই যায়নাবের পুত্রসন্তান আলীর মৃত্যু হয়।[৭]

---

৬. প্রাগুক্ত; উসুদুল গাবা-৫/৪০০; আ'লাম আন-নিসা'-১/৭৭
৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বাতিন নুবুওয়াহ্-৫৩৮; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৮০

খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা)

হযরত খাওলা (রা) মক্কার বানূ সুলাইম গোত্রের হাকীম ইবন উমাইয়্যার কন্যা। ডাকনাম উম্মু সুরাইক।[১] তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সহধর্মিনী। এই 'উছমান (রা) মদীনায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার আল-বাকী' গোরস্তানে দাফন করেন। আল-বাকী' গোরস্তানে দাফনকৃত তিনি প্রথম সাহাবী। খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খালা সম্পর্কীয় ছিলেন।[২]

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনাপর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন নারী-পুরুষ আগে-ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদের একজন। ইসলাম গ্রহণের আগেই 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ঈমানের মজাদার স্বাদ পূর্ণরূপে পেয়ে যান এবং সত্যের আলো তাঁর চোখের সকল পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য ও সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়া হওয়ার কারণে এ কাজ আরো সহজ হয়ে যায়। মক্কায় প্রতিদিন রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থলীসহ সকল সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। মদীনায় গিয়েও আমরণ এ কাজ অব্যাহত রাখেন। রাসূলুল্লাহর জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনার সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইবন 'আবদিল বার (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : كانت امرأة صالحة فاضلة

'তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলা ও গুণসম্পন্না মহিলা।' হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)ও তাঁকে সৎকর্মশীলা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে উল্লেখ করেছেন :[৩]

زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون.

'সৎকর্মশীলা মহিলা 'উছমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম ধারণা করেছেন।'

এভাবে অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞই তাঁকে সৎকর্মশীলা মহিলা বলে উল্লেখ করেছেন।

---

১. তাবাকাত-৮/১৫৮; আল-ইসতী'আব-৪/২৮১; উসুদুল গাবা-৫/৪৪৪; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪১৫

২. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪০৯

৩. আল-ইসাবা-৪/২৯৩

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রথমা ও প্রিয়তমা স্ত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কী জীবনের সকল সংকটে তিনি ছিলেন একান্ত সংগিনী। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেন, সমবেদনা প্রকাশ এবং পাশে থেকে সকল বাধা অতিক্রমে সাহায্য করতেন। এমন একজন অন্তরঙ্গ স্ত্রী ও বান্ধবীর তিরোধানে রাসূল (সা) দারুণ বিমর্ষ ও বেদনাহত হয়ে পড়েন। তাছাড়া খাদীজা ছিলেন রাসূলুল্লাহর সন্তানদের জননী ও গৃহকর্ত্রী। তাঁর অবর্তমানে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও ঘর সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু পৌত্তলিকদের জ্বালাতন ও উৎপাতের মাত্রাও বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন অবস্থা তাঁর সাহাবীদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের এমনই এক দুঃসময়ে খাওলা একদিন গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এবং তাঁকে বিমর্ষ দেখে বলে ফেললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে, খাদীজার তিরোধানে আপনি বেদনাকাতর হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর অভাব বোধ করছেন। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, তা ঠিক। সে ছিল আমার সন্তানদের মা এবং ঘরের কর্ত্রী। নানা কথার ফাঁকে এক সময় খাওলা অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে বলে ফেললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : পাত্রীটি কে? খাওলা বললেন : বিধবা ও কুমারী– দুই রকম পাত্রীই আছে। আপনি যাকে পসন্দ করেন তার ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে। তিনি আবার জানতে চাইলেন : পাত্রী কে? খাওলা বললেন : বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রী আবূ বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মহিলারা যোগ্যতর।[৪] যাও, তুমি তাদের দু'জনের নিকট আমার প্রস্তাব দাও।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে খাওলা সর্বপ্রথম 'আয়িশা না সাওদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। যাই হোক, তিনি গেলেন সাওদার গৃহে এবং সাওদাকে দেখেই বলে উঠলেন : আল্লাহ তোমার মধ্যে কী এমন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করেছেন? সাওদা বললেন : একথা কেন? বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার বিয়ের পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। সাওদা বললেন : আমি চাই, তুমি আমার পিতার সাথে কথা বলো।

সাওদার (রা) পিতা তখন জীবনের প্রান্তসীমায়। পার্থিব সকল কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। খাওলা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে 'আন'ইম সাবাহান' (সুপ্রভাত) বলে জাহিলী রীতিতে সম্ভাষণ জানান।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন : কে তুমি? খাওলা উত্তর দেন : আমি খাওলা বিন্‌ত হাকীম। বৃদ্ধ তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে কাছে বসান। খাওলা বিয়ের পয়গাম পেশ করেন এভাবে : মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। বৃদ্ধ বলেন :

---

৪. তাবাকাত-৮/৫৭; সীরাতে 'আয়িশা (রা)-২৪

এতো অভিজাত কুফু। তোমার বান্ধবী সাওদা কি বলে? খাওলা বলেন : তার মত আছে। বৃদ্ধ সাওদাকে ডাকতে বলেন। সাওদা উপস্থিত হলে বলেন : আমার মেয়ে! এই মেয়েটি (খাওলা) বলছে, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। অভিজাত পাত্র। আমি তাঁর সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই, তুমি কি রাজি? সাওদা বলেন : হাঁ, রাজি। তখন বৃদ্ধ খাওলাকে বলেন : তুমি যাও, মুহাম্মাদকে ডেকে আন। রাসূল (সা) বরবেশে উপস্থিত হন এবং সাওদার পিতা সাওদাকে তাঁর হাতে তুলে দেন।[৫]

খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সম্মতি পেয়ে আবূ বকরের বাড়ীতে গিয়ে 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) সাথে দেখা করলেন এবং বললেন : উম্মু রূমান! আল্লাহ আপনাদের বাড়ীতে কী এমন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করেছেন? তিনি বললেন : এমন কথা কেন? খাওলা বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে 'আয়িশার বিয়ের পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। উম্মু রূমান বললেন : একটু অপেক্ষা কর, আবূ বকর এখনই এসে পড়বেন। আবূ বকর ঘরে ফিরলেন এবং খাওলা তাঁর নিকট প্রস্তাবটি পাড়লেন। উল্লেখ্য যে, জাহিলী আরবের রীতি ছিল, তারা আপন ভাইয়ের সন্তানদের যেমন বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না, তেমনিভাবে সৎ ভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদেরকেও বিয়ে করা সঙ্গত ভাবতো না। এ কারণে প্রস্তাবটি শুনে আবূ বকর বললেন : খাওলা! 'আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। সুতরাং এ বিয়ে হয় কেমন করে? খাওলা ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : রাসূল (সা) বললেন : আবূ বকর আমার দীনী ভাই। আর এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা যায়। আবূ বকর (রা) প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলাকে বলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসতে। অতঃপর খাওলা রাসূলকে (সা) নিয়ে গেলেন এবং বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো।[৬]

হযরত খাওলার (রা) স্বামী হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উন (রা) মক্কায় প্রথম পর্বের একজন মুসলমান। পৌত্তলিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। তিনি হাবশায়ও হিজরাত করেন এবং কিছুকাল পরে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত খাওলার হাবশায় হিজরাতের কোন কথা পাওয়া যায় না। 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সঙ্গে খাওলার বিয়ে যদি ইসলামের প্রথম পর্বেই হয়ে থাকে তাহলে তিনিও 'উছমানের পরিবারের সদস্য হিসেবে কুরাইশদের যুলম-নির্যাতনের যাতায় পিষ্ট হয়ে থাকবেন। সেসব তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরাত করেন– একথা জানা যায়।

---

৫. তাবারী : তারীখ-২/২১১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-২/১৩০, আয-যাহাবী : তারীখ-১/১৬৬; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০৮; মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০; তাবাকাত-৮/৫৩

৬. সাহীহ বুখারী, বাবু তাযবীয আস-সিগার মিনাল কিবার; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবীয়্যাহ-১/৩১৬-৩১৮; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-৫/৫৬

হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) স্বভাবে রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের প্রতি গভীর ঝোঁক ছিল। 'ইবাদাত ও শবগোজারী ছিল তাঁর প্রিয়তম কাজ। সারা রাত নামায আদায় করতেন। বছরের অধিকাংশ দিন রোযাও রাখতেন। বাড়ীতে একটা ঘর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। রাত দিন সেখানে ই'তিকাফ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েন। হযরত খাওলার (রা) অভ্যাস ছিল নবীগৃহে আসার এবং রাসূলুল্লাহর বেগমদের খোঁজ-খবর নেওয়ার। একদিন তিনি নবীগৃহে আসেন। নবীর (সা) বেগমগণ তাঁর মলিন বেশ-ভূষা দেখে জিজ্ঞেস করেন : তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার স্বামী তো কুরাইশদের মধ্যে একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তিনি বললেন : তাঁর সাথে আমার কী সম্পর্ক! তিনি দিনে রোযা রাখেন, রাতে নামায পড়েন। বেগমগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে আনেন। তিনি সাথে সাথে 'উছমান ইবন মাজ'উনের বাড়ীতে ছুটে যান এবং তাঁকে ডেকে বলেন : 'উছমান! আমার জীবন কি তোমার জন্য আদর্শ নয়? 'উছমান বললেন : আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনি এমন কথা বলছেন কেন? রাসূল (সা) বললেন : তুমি দিনে রোযা রাখ এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। বললেন : হাঁ, এমনই করে থাকি। ইরশাদ হলো! এমন আর করবে না। তোমার উপর তোমার চোখের, তোমার দেহের এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক বা অধিকার আছে। নামায পড়, আরাম কর, রোযাও রাখ এবং ইফতার কর। এই হিদায়াতের পর তাঁর স্ত্রী খাওলা আবার একদিন নবীগৃহে আসলেন। সেদিন নববধূর সাজে সজ্জিত ছিলেন। দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল।[৭]

হযরত খাওলা (রা) একজন সুভাষিণী মহিলা ছিলেন। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। কোমল আবেগ-অনুভূতির অধিকারিণী ছিলেন। কাব্যচর্চাও করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী 'উছমানের (রা) ইনতিকালের পর তিনি একটি মরসিয়া রচনা করেন, তার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[৮]

ياعين جودى بدمع غير ممنون + على رزية عثمان بن مظعون

على امرئ بات فى رضوان خالقه + طوبى له من فقيد الشخص مدقون

طاب البقيع له سكنى وغرقده + وأشرقت أرضه من بعد تفتين

وأروث القلب حزنا لاانقطاع له + حتى الممات فما ترقاله شونى.

হে আমার চক্ষু! অবিরত অশ্রু বর্ষণ কর
'উছমান ইবন মাজ'উনের বড় বিপদে।

---

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১৫৭, ১৫৮; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৬
৮. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৬৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬১১

এমন ব্যক্তির জন্য যে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য রাত্রি অতিবাহিত করেছে,

দাফনকৃত সেই মৃত ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ।

তার জন্য বাকী' আবাসস্থল বানিয়েছে, বৃক্ষ ছায়া দান করেছে,

তার ভূমি আলোকিত হয়েছে প্রস্তরময় ভূমি হিসেবে পড়ে থাকার পর,

অন্তরকে ব্যথা ভারাক্রান্ত করেছে– মৃত্যু পর্যন্ত যার শেষ নেই।

আমার অশ্রু প্রবাহের শিরাগুলো তার জন্য অশ্রু প্রবাহে অক্ষম হয়ে পড়বে।

হিজরী ২য় সনে খাওলা (রা) বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। সবসময় বিমর্ষ থাকতেন। হাদীছ ও সীরাতের গ্রন্থসমূহের বর্ণনায় জানা যায়, বেশ কিছু নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদেরকে নবীর (সা) নিকট বিয়ের জন্য নিবেদন করেছিলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, খাওলা তাঁদের একজন। 'উরওয়া ইবন আয-যুবাইর (রা) বলেন : আমরা বলাবলি করতাম যে, খাওলা নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিজেকে নিবেদন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীলা মহিলা। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : যে সকল নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অর্পণ করেছিলেন, এমন কাউকে তিনি গ্রহণ করেননি। যদিও আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) এমন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। এ এখতিয়ার কেবল তাঁকেই দান করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন :[৯]

وامرأةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ إنْ أرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا.

'কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ।'[১০]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ ধরনের নারীকে মু'মিন নারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা তাঁদের জন্য বিরাট গর্ব, গৌরব ও সফলতা। হযরত খাওলাও এ গর্ব ও গৌরবের অধিকারিণী।

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণের গৌরবও অর্জন করেন। তায়িফ অভিযানে তিনি শরীক ছিলেন। এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন জানান : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তায়িফ বিজয় হয় তাহলে আমাকে বাদিয়া বিন্‌ত গায়লান অথবা ফারি'আ বিন্‌ত 'আকীলের অলঙ্কার দান করবেন। উল্লেখ্য যে, এ দু'জনের অলঙ্কার ছিল ছাকীফ গোত্রের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : তাদের ব্যাপারে এখনো আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং আমি ধারণা করি না যে, এখনই আমরা তাদেরকে জয় করবো। খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে

---

৯. সূরা আল-আহযাব-৫০

১০. তাফসীর আল-কুরতুবী ও তাফসীর ইবন কাছীর-সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫০, ৫১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/২৫৯; তাবাকাত-৮/১৫৮; আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৭/২৮৭

বেরিয়ে এসে একথা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে (রা) বললেন। 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাওলা যে একটি কথা বলছে এবং সে ধারণা করছে যে আপনি তা বলেছেন– এটা কী? রাসূল (সা) বললেন : আমি তা বলেছি। 'উমার (রা) বললেন : আমি কি প্রস্থানের ঘোষণা দেব? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, দাও। 'উমার (রা) প্রস্থানের ঘোষণা দেন।[১১]

হযরত খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কিছু হাদীছও সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সূত্রে মোট পনেরোটি (১৫) হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ তাঁদের সংকলনে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, বিশর ইবন সা'ঈদ, 'উরওয়া (রহ) ও আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১২]

---

১১. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-২/৪৮৪; উসুদুল গাবা-৫/৪৪৪; আল-ইসাবা-৪/২৯১; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-৩/৮১. ৮২

১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৭০; সাহাবিয়াত-২৫১

খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা)

হযরত খাওলার (রা) পিতার নাম ছা'লাবা ইবন আসরাম। ইবন হাজার তাঁর পিতার নাম মালিক ও দাদার নাম ছা'লাবা বলেছেন।[১] মদীনার খাযরাজ গোত্রের বানূ 'আওফের সন্তান। কেউ কেউ তাঁর নাম খাওলার পরিবর্তে 'খুওয়ায়লা' বলেছেন।[২] মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাঁর নিকট বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করেন। তাঁর পরিবারটি ছিল একটি ইসলামী পরিবার। তিন ভাই বাহহাছ, 'আবদুল্লাহ ও ইয়াযীদ (রা)– সবাই ছিলেন বিখ্যাত আনসারী সাহাবা। মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা) ভাই আওস ইবন আস-সামিত (রা)। এই আওস (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। ফিলিস্তীনের রামাল্লায় হিজরী ৩২ সনে ৭২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৩]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইসলামী যুগে "জিহার" সংক্রান্ত ব্যাপার সর্বপ্রথম আওস ইবন আস-সামিত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।[৪] আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা)।

জাহিলী আরব সমাজে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী-স্ত্রীতে একটু মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে বলতো : أنت كظهر أمي – এই বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো : তুমি আমার জন্যে এমন, যেমন আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ। এরূপ কথার স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না, বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে যারা তার জন্যে মুহাররাম। এ ধরনের কথা বলাকেই ফিকাহ্‌র পরিভাষায় 'যিহার' (ظهار) বলে। আরবী ভাষায় ظهار শব্দটি ظَهْرٌ হতে নির্গত। এর প্রচলিত অর্থ সওয়ারী, যার উপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবীতে 'যাহ্‌র' (ظهر) বলা হয়। কেননা তার পিঠের উপর আরোহণ করা হয়। জাহিলী যুগের আরবের লোকেরা নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো : 'তোমাকে 'যাহ্‌র'– সওয়ারী বানানো আমার জন্যে নিজের মাকে সওয়ারী বানানোর মতই হারাম। এ কারণে এ ধরনের বাক্য বা উক্তি মুখে উচ্চারণ করাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার' (ظهار) বলা হতো। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে এ ধরনের বাক্য তালাক– বরং তার চেয়েও বেশী শক্তভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করার সমতুল্য মনে করা হতো।

---

১. আল-ইসাবা-৪/২৮৯

২. তাবাকাত-৮/৩৮৭; তাহযীবুত তাহযীব-১২/৪১৪; উসুদুল গাবা-৫/৪৪২

৩. তাবাকাত-৩/৫৪৭; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২৯

৪. ইবন কুতায়বা– আল-মা'আরিফ-২৫৫

কেননা, তাদের নিকট এর অর্থ ছিল স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে শুধু বিয়ের সম্পর্কই ছিন্ন করছে না, তাকে মায়ের মতই নিজের জন্যে হারামও বানিয়ে নিচ্ছে। তাই আরব সমাজে তালাক দানের পরও স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার একটা উপায় থাকতো, কিন্তু 'যিহার' করার পর আর কোন পথই খোলা থাকতো না।[৫]

মুহাদ্দিছগণ হযরত আওসের জিহারের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে দান করেছেন। সেইসব বর্ণনার সার ও মূলকথা হলো যে, আওস (রা) বার্ধক্যে পৌঁছে কিছুটা খিট-খিটে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর মধ্যে 'পাগলামী'র অবস্থা দেখা দিয়েছিল। হাদীছের বর্ণনাকারীগণ একথা বুঝাবার জন্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাহলো : كَانَ بِـهِ لَمَمٌ। আরবী ভাষায় এই لمم শব্দের অর্থ পুরোপুরি পাগলামী নয়, তবে এ এমন এক অবস্থা বুঝায়, যা 'অমুক লোকটি রাগে পাগল হয়ে গেছে' বলে আমরা বুঝাতে চাই। মেযাজ-প্রকৃতির এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণে এর পূর্বেও কয়েকবার তাঁর স্ত্রীর প্রতি 'যিহার' করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হবার কারণে এরূপ ব্যাপার আবার তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়।

এরপর তাঁর স্ত্রী খাওলা (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত ব্যাপার খুলে বলার পর আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আমার ও আমার সন্তানাদির জীবন কঠিন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার কোন উপায় কি হতে পারে?

জবাবে নবী কারীম (সা) যা কিছু বলেছিলেন তা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর জবাব ছিল : 'এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোন হুকুম দেওয়া হয়নি।' কোন বর্ণনার ভাষা হলো : 'আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গিয়েছো।' আর কোন বর্ণনায় তিনি বলেন : 'তুমি তার জন্যে হারাম হয়ে গিয়েছো।' এরূপ জবাব শুনে হযরত খাওলা খুবই কান্নাকাটি, আর্তনাদ ও ফরিয়াদ করতে লাগলেন।

বারবার নবীকে (সা) বলতে লাগলেন : 'তিনি "তালাক" শব্দ তো বলেননি। আপনি এমন কোন পন্থা আমাকে বলুন, যাতে আমার সন্তানাদি ও আমার বৃদ্ধ স্বামীর জীবন কঠিন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে।' কিন্তু প্রত্যেকবারই নবী কারীম (সা) তাঁকে উক্তরূপ ও একই ধরনের জবাব দিতে থাকলেন। অবশেষে খাওলা (রা) হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে আমার বড় কষ্ট এবং আমার স্বামী থেকে বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালার কথা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে কল্যাণকর হয় এমন কোন কথা আপনার নবীর (সা) মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দিন। 'আয়িশা (রা) বলেন, তখন এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হয় যে, আমি এবং সেখানে উপস্থিত সকলে খাওলার করুণ আকুতি ও আর্তনাদে কেঁদে ফেলি।

এ সময় রাসূলে কারীমের (সা) উপর ওহী নাযিলের অবস্থা প্রকাশ পেল। 'আয়িশা (রা)

---

৫. তাফহীমুল কুরআন, তাফসীর, সূরা আল-মুজাদালা-১৬/১৮৩

আনন্দের সাথে খাওলাকে (রা) বললেন : 'খাওলা, খুব শিগগীরই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার বিষয়টির ফায়সালা হয়ে যাবে।' এ সময়টি ছিল তাঁর জন্যে খুবই কঠিন সময়। আশা-নিরাশার দোলাচালে তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়েন। এমন আশংকার সৃষ্টি হয় যে, বিচ্ছেদের নির্দেশ আসে, আর তিনি সেই দুঃখে প্রাণ হারান। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে তাকিয়ে তাঁর হাসিমুখ দেখে আশান্বিত হলেন। খুশীর চোটে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : খুওয়ায়লা! আল্লাহ তোমার ও তোমার সংগীর ব্যাপারে ওহী নাযিল করেছেন। তারপর তিনি পাঠ করেন :

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ـ إن الله سميع بصير ـ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم ـ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ـ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ـ وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ـ ذلكم توعظون به ـ والله بما تعملون خبير .فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ـ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ـ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم .[৬]

'যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্ম দান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই : একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'

উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাযিলের পর রাসূল (সা) খাওলাকে বললেন : তোমার স্বামীকে একটি দাস মুক্ত করে দিতে বলবে।

---

৬. সূরা আল-মুজাদালা : ১-৪

খাওলা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাস মুক্ত করার মত সামর্থ্য তার নেই।

নবী (সা) বললেন : একাধারে দু'মাস সাওম পালন করতে হবে। খাওলা বললেন : সে যে বৃদ্ধ, সাওম পালন করার সামর্থ্য তার কোথায়? দিনে দু' তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে।

নবী (সা) বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

খাওলা বললেন : এর জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য তার নেই। তবে আপনি সাহায্য করলে তা করা যেতে পারে। তখন নবী কারীম (সা) ষাটজন মিসকীনকে দু' বেলা খাওয়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য দান করলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী কারীম (সা) যত পরিমাণ দ্রব্য দিয়েছিলেন, খাওলা (রা) ঠিক সেই পরিমাণ নিজের নিকট থেকে স্বামীকে দেন তার কাফ্‌ফারা আদায় করার জন্যে।[৭]

স্ত্রী খাওলা তো গেছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যিহারের ফায়সালা জানার জন্যে। আর এদিকে স্বামী আওস (রা) অস্থিরভাবে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বুক তাঁর দুরু-দুরু কাঁপছে, না জানি কি ফায়সালা নিয়ে আসে। এক সময় দূরে খাওলাকে দেখে তিনি অস্থিরভাবে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন : খাওলা কি হয়েছে?

খাওলা বললেন : ভালো। তুমি সৌভাগ্যবান। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সিদ্ধান্তের কথা জানান ও সেই কাফ্‌ফারা আদায় করেন।[৮]

আল্লাহ তা'আলা হযরত খাওলাকে (রা) সম্মান দান করে তাঁর ফরিয়াদের জবাবে সূরা আল-মুজাদালার উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। তাতে তিনি কেবল যিহারের বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট ও যন্ত্রণা দূর করার ব্যবস্থাই করেননি, বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দেন : যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন। খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা সব শুনেছেন।[৯] আয়াতগুলো নাযিলের পর খাওলার (রা) নাম "আল-মুজাদিলা" (বাদানুবাদকারিণী) হয়ে যায়।

খাওলা ছিলেন আনসারদের মধ্যে অন্যতম বিশুদ্ধভাষিণী মহিলা। অলঙ্কার মণ্ডিত ভাষায় চমৎকার ভঙ্গিতে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর

---

৭. আল-ইসাবা-৪/২৯০

৮. তাবাকাত-৮/৩৭৯-৩৮০; সাজারাত আয-যাহাব-১/১৩৮-১৩৯; আনসাব আল-আশরাফ-১/২৫১; তাফহীম আল-কুরআন-১৬/১৮৫-১৮৬

৯. তাফসীরুল কুরতুবী ও তাফসীরু ইবন কাছীর, সূরা আল-মুজাদিলার তাফসীর, আয়াত ১-৪

(সা) নিকট তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে অভিযোগ উত্থাপন করেন, এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন :[১০]

يا رسول الله! أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني.

'হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার অর্থ-সম্পদ ভোগ করেছে ও আমার যৌবনকে উপভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমি আমার উদরকে তার জন্যে বিছিয়ে দিয়েছি। আর এখন যখন আমার বয়স হয়েছে এবং আমার সন্তানাদি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন সে আমার সাথে "যিহার" করেছে।'

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তবে তাতে একটি শিল্পরূপ আছে। মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। তাঁর ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট শ্রুত ও গৃহীত হওয়া এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহর নিকট থেকে অনুকূল ফরমান জারী হওয়া এমন একটা ব্যাপার যার দরুন সাহাবীদের সমাজে তাঁর এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। ইবন আবী হাতিম ও বাইহাকী বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, হযরত 'উমার (রা) একবার কয়েকজন সঙ্গী সাথীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। 'উমার (রা) দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং মাথা নত করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য শুনলেন। তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন : আপনি এই বৃদ্ধার কারণে কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। 'উমার (রা) বললেন : তোমরা কি জানো, কে এই মহিলা? ইনি খাওলা বিনত ছা'লাবা। ইনি এমন এক মহিলা, যার অভিযোগ সপ্তম আসমানের উপর শ্রুত হয়েছে। আল্লাহর শপথ! ইনি যদি আমাকে রাত পর্যন্তও দাঁড় করিয়ে রাখতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেবল সালাতের সময়ই তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতাম।[১১]

ইবন আবদিল বার তাঁর "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে কাতাদা (রহ) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই মহিলা (খাওলা) পথিমধ্যে 'উমারের (রা) সম্মুখীন হলে তিনি তাঁকে সালাম করলেন। মহিলা সালামের জবাব দেয়ার পর বলতে লাগলেন : ওহো, হে 'উমার এমন একটা সময় ছিল যখন আমি তোমাকে উকাজের বাজারে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তোমাকে সকলে 'উমাইর বলতো। হাতে লাঠি নিয়ে ছাগল চরাতে। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকেরা তোমাকে 'উমার বলতে শুরু করলো। আরো কিছু দিন পর তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হতে লাগলো। আমি বলি কি, প্রজা সাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে একটু ভয় করে চলবে। স্মরণ রাখবে, যে লোক আল্লাহর অভিশাপকে ভয় করে, তার জন্যে দূরের লোকও নিকট আত্মীয়ের মত হয়ে

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪০৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৩১
১১. তাফহীমুল কুরআন-১৬/১৮২

যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে, তার সম্পর্কে আশংকা, সে যে জিনিসকে রক্ষা করতে চায়, তাই হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে।

একথা শুনে 'উমারের (রা) সঙ্গী জারূদ আল-'আবদী বললেন : ওহে মহিলা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের সাথে খুব বেয়াদবীর কথাবার্তা বলছো।

'উমার (রা) বললেন : তাঁকে বলতে দাও। তুমি কি জানো তিনি কে? তাঁর কথা তো সপ্তম আসমানের উপরও শুনা গিয়েছে, 'উমারকে (রা) তো অবশ্যই শুনতে হবে।[১২]

এই হলেন খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা), একজন ঈমানদার আনসারী মহিলা– যাঁর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যার ওসীলায় ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রবর্তিত এবং মুসলিম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা জানা যায়, তিনি খিলাফতে রাশিদার বেশীরভাগ সময় জীবিত ছিলেন এবং এ সময়কালেই ইনতিকাল করেছেন।

---

১২. ইযালাতুল খাফা-১/৫১; আল-ইসতী'আব-৪/২৮৩; আল-ইসাবা-৪/২৮৩; কান্‌য আল-'উম্মাল-১/৩৮৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩৬

হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা)

হাওয়ার পিতার নাম ইয়াযীদ ইবন সিনান। মদীনার 'আবদুল আশহাল গোত্রের মেয়ে। তিনি মদীনার কায়স ইবন খুতায়মের স্ত্রী ছিলেন। মদীনার মহান আনসারী সাহাবী সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছিলেন হাওয়ার মা 'আকরাব বিন্‌ত মু'আযের আপন ভাই। সুতরাং বিখ্যাত সাহাবী সা'দ ছিলেন হাওয়ার মামা। মহান বদরী সাহাবী রাফি' ইবন ইয়াযীদ (রা) হাওয়ার সহোদর। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে, মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) যে সকল মহিলাকে সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন তিনি তাঁদের একজন। হাওয়া 'আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাই'আতের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন।[১]

মদীনার যে ক'জন মহিলা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বাই'আত করেন, এই হাওয়া তাঁদের অন্যতম। 'আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা উম্মু 'আমির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি, লাইলা বিন্‌ত আল-হুতায়ম ও হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ– এই তিনজন একদিন মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে আমাদের চাদর দিয়ে সারা দেহ ঢেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা সালাম দিলাম। তিনি আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমরা পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে জানতে চাইলেন : তোমরা কি জন্য এসেছো?

আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ইসলামের বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করতে এসেছি। আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি।

রাসূল (সা) বললেন : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের ইসলামের প্রতি হিদায়াত দান করেছেন। আমি তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করলাম। উম্মু 'আমির (রা) বলেন : অতঃপর আমি একটু রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এগিয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন : আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করি না। হাজার মহিলার উদ্দেশ্যে আমার যে কথা, একজন মহিলার জন্যও আমার সেই এক কথা।

উম্মু 'আমির বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমরা প্রথম বাই'আত গ্রহণকারী।[২]

ইসলামের কারণে যাঁরা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, হাওয়া তাঁদের অন্যতম। তাঁর স্বামী কায়স ইবন খুতায়ম ছিলেন মদীনার আওস গোত্রের খ্যাতনামা কবি। তিনি পৌত্তলিকতার উপর অটল থাকলেও তাঁর অজ্ঞাতে স্ত্রী হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তা জানতে পেরে তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর নির্যাতন আরম্ভ

---

১. আল-ইসাবা-৪/২৭৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯১

২. তাবাকাত-৮/১২; আল-ইসাবা-৪/২৭৬

করেন। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, নামাযরত অবস্থায় সিজদায় গেলে মাটিতে ফেলে দিতেন।[৩] হাওয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। রাসূল (সা) তখন মক্কায়। মদীনা থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় যেতেন তাঁদের মুখে তিনি মদীনার হাল-হাকীকত অবগত হতেন। তাঁদের কাছেই তিনি হাওয়ার উপর নির্যাতনের কথা অবগত হন। মৃত্যুর পূর্বে একবার কায়স মক্কার "যুল মাজায"-এর মেলায় যান। রাসূল (সা) খবর পেয়ে তাঁর অবস্থানস্থলে গিয়ে হাজির হন। রাসূলকে (সা) দেখে কায়স সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং খুবই সম্মান ও সমাদর করেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি এই বলে সময় নেন যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে আরো একটু চিন্তা করে দেখবেন। রাসূল (সা) তাতে রাজি হন। তারপর তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, তোমার স্ত্রী হাওয়া বিন্ত ইয়াযীদ তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাক। আমি চাই তুমি আর তাকে কোনভাবে কষ্ট দিবে না। আল্লাহকে ভয় কর। তার ব্যাপারে আমার কথা মনে রেখ।[৪]

কায়স বললেন : আবুল কাসিম! আপনার সম্মানে আমি তাকে আর কোন রকম কষ্ট দিব না। রাসূলকে (সা) কথা দিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। স্ত্রীকে বললেন, তোমার সেই বন্ধু আমার সাথে দেখা করেছেন এবং তোমাকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। সুতরাং এখন থেকে আমি আর তোমাকে কিছু বলবো না। তুমি স্বাধীনভাবে তোমার দীন চর্চা করতে পার।[৫]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্ত্রীকে বলেন : তুমি তোমার দীন যেভাবে ইচ্ছা পালন করতে পার। আমি আর কোন রকম বাধা দিব না। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর চেহারা ও সুন্দর আকৃতির কোন মানুষ আর দেখিনি।[৬]

এরপর হাওয়া (রা) স্বামীর নিকট ইসলামের যা কিছু গোপন রেখেছিলেন সবই প্রকাশ করে দেন। প্রকাশ্যেই ইসলাম চর্চা করতে থাকেন। কায়স আর মোটেও বাধা দেননি। প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবরা যখন তাঁকে বলতো, তুমিতো পৌত্তলিক ধর্মের উপর অটল আছ, কিন্তু তোমার স্ত্রী তো মুহাম্মাদের (সা) অনুসারী হয়ে গেছেন। তিনি বলতেন : আমি মুহাম্মাদকে কথা দিয়েছি যে, আমি আর তাকে কোন কষ্ট দেব না এবং তাকে দেওয়া কথা আমি রক্ষা করবো। কায়সের এ অঙ্গীকার পালন এবং স্ত্রীকে নির্যাতন না করার কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : وفى الأديعج অর্থাৎ কাঁচা-পাকা জোড়া ভ্রূ বিশিষ্ট লোকটি কথা রেখেছে।[৭]

এভাবে নির্বিঘ্নে হাওয়া ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন। এর মধ্যে রাসূল (সা)

---

৩. আল-ইসাবা-৪/২৭৬

৪. তাবাকাত-৩/৩২৪; ৮/২৩; আ'লাম আন-নিসা'- ১/৩০৪

৫. ইবন সাল্লাম, তাবাকাত আশ-শু'আরা'-১৯২, ১৯৩

৬. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৪৫৬; আ'লাম আন-নিসা'-১/৩০৪

৭. উসুদুল গাবা-৫/৪৩১; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯৪

হিজরাত করে মদীনায় চলে আসলেন। হাওয়া আরো কিছু আনসারী মহিলাদের সাথে প্রথম পর্বেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে বাই'আত সম্পন্ন করেন।

কায়স ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে হাওয়ার (রা) গর্ভে জন্ম নেওয়া তাঁর দুই ছেলে ইয়াযীদ ও ছাবিত– উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উহুদ যুদ্ধে ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং দেহের বারোটি স্থানে আঘাত পান। এদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তরবারি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে "জাসির" নামে সম্বোধন করে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এভাবে : "يَاجَاسِرُ أَقْبِلْ، يَاجَاسِرُ أَدْبِرْ" – হে জাসির! সামনে এগিয়ে যাও। জাসির! পিছনে সরে এসো।

আবূ 'উবায়দার (রা) নেতৃত্বে পরিচালিত "জাসর"-এর যুদ্ধে এই ইয়াযীদ শাহাদাত বরণ করেন।[৮] আর ছাবিত, ইবন 'আবদিল বার "আল ইসতী'আব" গ্রন্থে বলেছেন, তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[৯]

উল্লেখ্য যে, কায়স ইবন খুতায়মের দুই বোন– লাইলা ও লুবনা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত করেন। হযরত হাওয়ার শেষ জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি কখন, কোথায় এবং কিভাবে মারা গেছেন সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। তবে তিনি যে একজন ভালো মুসলমান হতে পেরেছিলেন, ইতিহাসের সকল সূত্র সে কথা বলেছে।[১০]

---

৮. প্রাগুক্ত

৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯২

১০. আল-ইসাবা-৪/২৭৬

শিফা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ (রা)

হযরত শিফা (রা) মক্কার কুরায়শ খান্দানের 'আদী শাখার কন্যা। ডাকনাম উম্মু সুলায়মান। পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদি শামস', মাতা একই খান্দানের 'আমর ইবন মাখযূম শাখার সন্তান ফাতিমা বিন্‌ত আবী ওয়াহাব।[১] আবূ হুছমা ইবন হুযায়ফা আল-'আদাবীর সঙ্গে শিফার বিয়ে হয়।[২] অনেকে বলেছেন, তাঁর আসল নাম লায়লা এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতি আরোপিত উপাধি আশ-শিফা নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩]

হিজরাতের পূর্বে মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম পর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতকারী মহিলাদের মধ্যে তিনিও একজন।[৪] যে সকল মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত করেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[৫] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূল (সা)ও তাঁর এ ভক্তি-ভালোবাসাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শিফার গৃহে যেতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। হযরত শিফা (রা) তাঁর গৃহে রাসূলের (সা) জন্য একটি বিছানা এবং এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র বিশেষভাবে রেখে দেন। রাসূল (সা) তা ব্যবহার করতেন। হযরত শিফার ইনতিকালের পর তাঁর সন্তানরা এসব জিনিস অতি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবন হাকাম (মৃ. ৬৫ হি.) তাদের নিকট থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নেন। ফলে তা শিফার পরিবারের বেহাত হয়ে যায়।[৬]

হযরত 'উমার (রা) শিফাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মতামতের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। তিনি শিফাকে বাজার পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কিছু দায়িত্ব প্রদান করেন।[৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে একটি বাড়ী দান করেন। সেই বাড়ীতে তিনি ছেলে সুলায়মানকে নিয়ে বাস করতেন।[৮]

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে ডেকে এনে একটি চাদর দান করেন। ঠিক সে সময় উপস্থিত 'আতিকা বিন্‌ত উসাইদকেও অপেক্ষাকৃত একটি ভালো চাদর দান করেন। অভিযোগের সুরে শিফা খলীফাকে বলেন : আপনার হাত ধুলিমলিন হোক!

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৬; আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৪/৩৩৩
২. তাবাকাত-৮/২৬৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩২
৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, টীকা নং-১, পৃ. ১৫৯
৪. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৫৯
৬. তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৮৭; আল-ইসতী'আব-৪/৩৫৮
৭. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৫০; আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
৮. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৬১

আপনি তাকে আমার চাদরের চেয়ে ভালো চাদর দান করেছেন। অথচ আমি তার আগে মুসলমান হয়েছি এবং আমি আপনার চাচাতো বোন। তাছাড়া আমি এসেছি, আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই। আর সে নিজেই চলে এসেছে। জবাবে 'উমার (রা) বললেন : আমি তোমাকে ভালো চাদরটি দিতাম; কিন্তু সে এসে পড়ায় তাঁকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। কারণ বংশগত দিক দিয়ে সে রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকতর নিকটবর্তী।[৯]

হযরত শিফাও ছিলেন হযরত 'উমারের (রা) গুণমুগ্ধা। সময় ও সুযোগ পেলেই 'উমারের (রা) আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। যেমন, একদিন তিনি কয়েকজন যুবককে তাঁর সামনে দিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে চাপাস্বরে কথা বলতে বলতে যেতে দেখে প্রশ্ন করলেন এদের অবস্থা এমন হয়েছে কেন? লোকেরা বললো : এরা 'আবিদ– আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল ব্যক্তিবর্গ। হযরত শিফা (রা) একটু রাগত স্বরে বললেন :[১০]

كان والله ـ عمر إذا تكلم أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أوجع ، هو والله الناسك حقا.

'আল্লাহর কসম! 'উমার যখন কথা বলতেন, উচ্চস্বরে বলতেন, যখন হাঁটতেন, দ্রুতগতিতে হাঁটতেন, যখন কাউকে মারতেন, অত্যন্ত ব্যথা দিতেন। আল্লাহর কসম! তিনিই সত্যিকারের 'আবিদ।'

হযরত 'উমার (রা) হযরত শিফার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতেন, তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। স্বামী-সন্তানদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদেরকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। শিফা (রা) বলেন : একদিন 'উমার (রা) আমার গৃহে এসে দু'জন পুরুষ লোককে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। উল্লেখ্য যে, লোক দু'জন হলেন তাঁর স্বামী ও ছেলে সুলায়মান। 'উমার প্রশ্ন করলেন : এদের ব্যাপারটি কি? এরা কি সকালে আমাদের সাথে জামা'আতে নামায পড়েনি? বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! তারা জামা'আতে নামায পড়েছে। সারা রাত নামায পড়ে সকালে ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে ঘুমিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তখন ছিল রমাদান মাস। 'উমার বললেন : সারা রাত নামায পড়ে ফজরের জামা'আত ত্যাগ করার চেয়ে ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করা আমার অধিক প্রিয়।[১১]

তিনি কিছু ঝাড়ফুঁক ও লিখতে জানতেন। জাহিলী যুগে এ দু'টি বিষয় অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন এবং বিনয়ের সাথে বলেন, জাহিলী জীবনে আমি কিছু ঝাড়ফুঁক জানতাম। আপনি অনুমতি দিলে শোনাতে পারি। রাসূল (সা) অনুমতি দেন এবং তিনি সেই মন্ত্র শোনান। রাসূল (সা) বলেন, তুমি

---

৯. আল-ইসতী'আব-৪/৩৫৮; উসুদুল গাবা-৫/৪৯৭; সাহাবিয়াত, পৃ. ২৪০

১০. তারীখ আত-তাবারী-২/৫৭১; তাবাকাত-৩/২৯০

১১. কান্‌য আল-'উম্মাল-৪/২৪৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১২৩

এই মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক চালিয়ে যেতে পার। হাফসাকেও (উম্মুল মু'মিনীন) শিখিয়ে দাও।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন :

علمى حفصة رقية النملة كما عملتيها الكتابة .

'তুমি নামলার মন্ত্র হাফসাকে শিখিয়ে দাও, যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো।' এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনি হযরত হাফসাকে (রা) লেখা শিখিয়েছিলেন।[১২] উল্লেখ্য যে, আধুনিককালের চিকিৎসাবিদদের মতে "নামলা" একজিমা ধরনের এক প্রকার চর্মরোগ।[১৩] রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে তিনি সেই মন্তর মহিলাদেরকে শেখাতেন।[১৪]

হযরত শিফা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি এবং 'উমার (রা) থেকে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র সুলায়মান, পৌত্র আবূ সালামা আবূ বকর ও 'উছমান এবং আবূ ইসহাক ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৫] তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-১২ (বারো)।[১৬]

তাঁর দুই সন্তানের কথা জানা যায়– পুত্র সুলায়মান এবং এক কন্যা– যিনি শুরাহবীল ইবন হাসানার (রা) স্ত্রী ছিলেন। সুলায়মান ছিলেন একজন জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তি। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।[১৭]

হযরত শিফার (রা) মৃত্যুসন জানা যায় না। তবে অনেকে হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ের কথা বলেছেন।[১৮]

হযরত শিফার বর্ণিত একটি অন্যতম হাদীছ হলো :[১৯]

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال : إيمان بالله وجهاد فى سبيله وحج مبرور.

'রাসূলুল্লাহকে (সা) সর্বোত্তম 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন :

---

১২. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
১৩. আ'লাম আন-নিসা'-২/২০১
১৪. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৬০
১৫. তাহ্যীবুত তাহযীব-১২/৪২৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩৩
১৬. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
১৭. তাবাকাত-৮/২৬৮
১৮. আ'লাম আন-নিসা'-২/১৬৩
১৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৭; আল-ইসাবা-৪/৩৩৩

আল্লাহর উপর ঈমান, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং হজ্জে মাবরূর বা আল্লাহর নিকট গৃহীত হজ্জ।'

তাবারানী ও বায়হাকী হযরত শিফার (রা) একটি চমকপ্রদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শিফা (রা) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম এবং কিছু সাদাকার আবেদন জানালাম। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে চললেন, আর আমিও চাপাচাপি করতে লাগলাম। এর মধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। আমি বেরিয়ে আমার মেয়ের ঘরে গেলাম। মেয়ের স্বামী ছিল শুরাহ্‌বীল ইবন হাসানা। আমি এ সময় শুরাহ্‌বীলকে ঘরে দেখে বললাম : নামায শুরু হতে চলেছে, আর তুমি এখন ঘরে? আমি তাকে তিরস্কার করতে লাগলাম। সে বললো : খালা! আমাকে তিরস্কার করবেন না। আমার একখানা মাত্র কাপড়, তাও রাসূল (সা) ধার নিয়েছেন। আমি বললাম : আমি যাকে তিরস্কার করছি তার এই অবস্থা, অথচ আমি তার কিছুই জানিনে। শুরাহ্‌বীল বললো : আমার একখানা মাত্র তালি দেয়া কাপড় আছে।[২০]

---

২০. কান্‌য আল-'উম্মাল-৪/৪১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬

হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)

হযরত হামনা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকটাত্মীয়া। রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারামা ফুফু উমাইমা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিবের কন্যা। তিনি একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো বোন, অন্যদিকে শালীও। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের সহোদরা।[১] মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম দূত ও দা'ঈ (ইসলাম প্রচারক) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) তাঁর প্রথম স্বামী।[২]

হযরত হামনার (রা) স্বামী মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) ছিলেন মক্কার বিত্তবান পরিবারের এক সুদর্শন যুবক। তাঁর মা খুনাস বিন্‌ত মালিকের ছিল প্রচুর সম্পদ। শৈশব থেকে তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। মা তাঁকে সবসময় দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদে সাজিয়ে রাখতো। মক্কায় তাঁর চেয়ে দামী সুগন্ধি আর কেউ ব্যবহার করতো না। পায়ে পরতেন হাদরামাউতের জুতো। পরবর্তীকালে রাসূল (সা) মুস'আবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন :

"ماراأيت بمكة أحدًا أحسن لـمةً ولاأرقَّ حُلَّةً ولاانعم نعمة من مصعب بن عمير."

'আমি মুস'আবের চেয়ে চমৎকার জুলফী, অধিকতর কোমল চাদরের অধিকারী এবং বেশী বিলাসী মক্কায় আর কাউকে দেখিনি।'

এই যুবক যখন শুনলেন রাসূল (সা) আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে অবস্থান করে গোপনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেন তখন একদিন সেখানে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে তিনি হলেন মাদরাসায়ে নববীর ছাত্র। নবীর (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লাভ করেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় শিক্ষকের এমন আস্থা অর্জন করেন যে, তিনি তাঁকে দূত ও দা'ঈ হিসেবে মদীনায় পাঠান। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দূত ও দা'ঈ।[৩]

মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করেন হামনা তাঁদের একজন। হামনার গোটা পরিবারই ছিল মুসলমান। মক্কায় তাঁদের উপর কুরায়শদের অত্যাচার মাত্রাছাড়া রূপ ধারণ করলে তাঁরা নারী-পুরুষ সকলে মদীনায় হিজরাত করেন। হিজরাতকারী পুরুষরা হলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, তাঁর ভাই আবূ আহমাদ, 'উকাশা ইবন মিহ্‌সান, শুজা', 'উকবা, ওয়াহাবের দুই পুত্র, আরবাদ এবং নারীরা হলেন : যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ, উম্মু

---

১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩১; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্‌-১/২৪৩
২. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৯১; তাবাকাত-৮/২৪১; আল-ইসতী'আব-৪/২৬২
৩. নিসা' মিন আসর আন-নুবুওয়াহ্‌, পৃ. ৫০

হাবীব বিন্‌ত জাহাশ, জুযামা বিন জানদাল, উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিনত ছুমামা, উমাইয়া বিনত রুকাইস, সাখবারা বিনত তা'মীম ও হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)।[৪]

মদীনায় আসার পর হযরত হামনা (রা) অন্য ঈমানদার মহিলাদের মত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। নবী (সা) ও স্বামীর নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে আরো শিক্ষিত করে তোলেন। নিজের নৈতিক মান আরো উন্নত করেন। ফলে মদীনার সমাজে তাঁরা একটি সম্মানজনক মর্যাদার আসন লাভ করেন। এখানে তাঁদের কন্যা সন্তান যয়নাব বিন্‌ত মুস'আব জন্মগ্রহণ করে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মাদানী জীবনে যখন প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরম্ভ হয় তখন হামনার (রা) ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসিত ও আদর্শমানের। উহুদ যুদ্ধে হামনা (রা) আরো কিছু মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেন। সেদিন তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুদ্ধের একজন সৈনিক, প্রত্যক্ষদর্শী হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : 'আমি উহুদের যুদ্ধের দিন উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাকে (রা) নিজ নিজ পিঠে পানির মশক ঝুলিয়ে বহন করতে দেখেছি। হামনা বিন্‌ত জাহাশকে দেখেছি তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাতে এবং আহতদের সেবা করতে। আর উম্মু আয়মানকে দেখেছি আহতদের পানি পান করাতে।'[৬]

উহুদ যুদ্ধে মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা)সহ সত্তরজন মুসলিম মুজাহিদ শহীদ হন। যুদ্ধ শেষে হামনা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : হামনা! হিসাব কর।

হামনা : কাকে?

রাসূল (সা) : তোমার মামা হামযাকে।

হামনা : إنا لله وإنا اليه راجعون , আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন এবং তাঁকে জান্নাত দান করুন!

নবী (সা) আবার বললেন : আরেকজনকে গণনা কর।

হামনা : কাকে?

নবী (সা) : তোমার স্বামী মুস'আব ইবন 'উমাইরকে।

হামনা জোরে একটা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন : হায় আমার দুঃখ!

তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন : "নারীর হৃদয়ে স্বামীর অবস্থান এমন এক স্থানে যা অন্য কারো জন্য নেই।" এ মন্তব্য তখন করেন যখন তিনি দেখেন, হামনা

---

৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭২; দাররুস সাহাবা-৫৫৬

৫. তাবাকাত-৩/১১৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

৬. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী-১/২৪৯, ২৫০; দাররুস সাহাবা-৫৫৬

তাঁর মামা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে অটল রয়েছেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে ভেঙ্গে পড়েছেন।

রাসূল (সা) হামনাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে এমন আচরণ করলে কেন?

হামনা বললেন : তাঁর সন্তানদের ইয়াতীম হওয়ার কথা মনে হল এবং আমি শঙ্কিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।[৭]

রাসূল (সা) হামনার জন্য দু'আ করলেন, আল্লাহ যেন তাঁর সন্তানদের জন্য মুস'আবের স্থলে ভালো কাউকে দান করেন। অতঃপর হামনা (রা) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহকে (রা) বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, এই তালহা হলেন, জীবদ্দশায় যে দশজন জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন তাদের অন্যতম। এই তালহার ঔরসে হামনা জন্ম দেন ছেলে মুহাম্মাদ ইবন তালহাকে। হামনার (রা) সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন দারুণ স্নেহশীল।[৮]

উহুদ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে হামনা (রা) যোগদান করতে থাকেন। খায়বারেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে যান এবং বিজয়ের পর সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে তিরিশ ওয়াসাক রাসূল (সা) তার জন্য নির্ধারণ করে দেন।[৯]

হযরত হামনার (রা) ছেলে মুহাম্মাদ ইবন তালহার জন্মের পর তিনি তাকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান এবং আবেদন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর একটা নাম রেখে দিন। রাসূল (সা) তার মাথায় হাত বুলিয়ে নাম মুহাম্মাদ এবং ডাকনাম আবুল কাসিম রাখেন। রাশিদ ইবন হাফস আয-যুহ্‌রী বলেন, আমি সাহাবীদের ছেলেদের কেবল চারজনকে পেয়েছি যাঁদের প্রত্যেকের নাম মুহাম্মাদ এবং ডাকনাম আবুল কাসিম। তাঁরা হলেন : ১. মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা), ২. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা), ৩. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), ৪. মুহাম্মাদ ইবন তালহা (রা)।[১০]

হযরত হামনার (রা) ছেলে এই মুহাম্মাদ ইবন তালহা উত্তরকালে একজন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও সত্যনিষ্ঠ আবেদ ব্যক্তিতে পরিণত হন। অতিরিক্ত সিজদাবনত থাকার কারণে তাঁর উপাধি হয় 'সাজ্জাদ'। হিজরী ৩৬ সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে উটের যুদ্ধে পিতা তালহার সাথে শাহাদাত বরণ করেন। তালহার (রা) ঔরসে হামনা (রা) আরেকটি পুত্র সন্তান জন্ম দেন। তার নাম 'ইমরান ইবন তালহা (রা)।[১১]

হযরত হামনার (রা) মহত্ব ও মর্যাদা অনেক। তিনি হযরত নবী কারীম (সা) থেকে

---

৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮

৮. আল-ইসাবা-২/২২১; আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮; সুনান আবী দাউদ, হাদীছ নং-১৫৯০

৯. তাবাকাত-৮/২৪১; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫২

১০. আল-ইসাবা-৩/৩৫৭

১১. তাবাকাত-৫/১৬৬; জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর পুত্র ইমরান ইবন তালহা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের বোন। বর্ণিত হয়েছে, যয়নাবের (রা) জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বোন হামনাকে (রা) বলেন : আমি আমার কাফন প্রস্তুত করে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর খলীফা 'উমার (রা) আমার কাফন পাঠাতে পারেন। যদি পাঠান, তুমি যে কোন একটি সাদাকা করে দিও। যয়নাব (রা) মারা গেলেন। 'উমার (রা) পাঁচ প্রস্থ কাপড় পাঠালেন। সেই কাপড় দ্বারা তাঁকে কাফন দেওয়া হয়। আর যয়নাবের (রা) প্রস্তুতকৃত কাপড় হামনা সাদাকা করে দেন।[১২] এ ঘটনা ইঙ্গিত করে যে, হযরত হামনা (রা) হিজরী ২০ (বিশ) সনের পরেও জীবিত ছিলেন। কারণ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের (রা) ইনতিকাল হয় হিজরী বিশ সনে।[১৩] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্যসহকারে ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে এক প্রশংসিত জীবন-যাপন করে তিনি পরলোকে যাত্রা করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) পূতঃপবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের ঘটনায় যারা বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা হলেন আবদুল্লাহ ইবন উবায়, যায়দ ইবন রিফা'আ, মিসতাহ ইবন উছাছা, হাস্সান ইবন ছাবিত ও হামনা বিনতে জাহাশ। এদের মধ্যে প্রথম দুইজন মুনাফিক এবং অপর তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিনজন নিজেদের কিছু মানবিক দুর্বলতা ও ভ্রান্তিবশতঃ এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।[১৪]

হযরত আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) এঁদের সকলকে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করেন।[১৫] হযরত হামনার (রা) এমন কর্মে জড়িত হওয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, যেহেতু আমার সতীনদের মধ্যে একমাত্র তাঁর বোন যয়নাব ছাড়া আর কেউ আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন না, তাই তিনি তাঁর বোনের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ফিতনায় জড়িয়ে পড়েন।[১৬]

---

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫; আল-ইসাবা-৪/৩০৮
১৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৫৪
১৪. তাফহীমুল কুরআন, খণ্ড ৩, সূরা আন-নূর, পৃ. ১৩৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৮৮
১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/১৬০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯০
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩০০

খান্‌সা বিন্‌ত 'আমর ইবন আশ-শারীদ (রা)

হযরত খানসার আসল নাম 'তুমাদির'। চপল, চালাক-চোস্ত স্বভাব ও মন কাড়া চেহারার জন্যে খান্‌সা নামে ডাকা হতো। খান্‌সা অর্থ বন্যগাভী ও হরিণী। শেষ পর্যন্ত আসল নামটি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় এবং খানসা নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।[১] পিতার নাম 'আমর ইবন শারীদ। তিনি ছিলেন কায়স গোত্রের সুলায়ম খান্দানের সন্তান।[২] বানু সুলায়ম হিজায ও নাজদের উত্তরে বসবাস করতো।[৩]

দুরায়দ ইবন আস-সিম্মাহ্‌ ছিলেন প্রাচীন আরবের একজন বিখ্যাত নেতা। খানসার বিয়ের বয়স হওয়ার পর দুরায়দ একদিন দেখলেন, অতি যত্ন সহকারে খানসা তাঁর একটি উটের গায়ে ওষুধ লাগালেন, তারপর নিজে পরিচ্ছন্ন হলেন। এতে দুরায়দ মুগ্ধ হলেন এবং তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খানসা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে :[৪]

أترانى تَارِكَةً بَنِي عَمِّي كَأَنَّهُمْ عَوَالِي الرِّمَاحِ وَمُرتَثَّةً بَنِي جُشَمَ؟

'তুমি কি দেখতে চাও যে, আমি আমার চাচাতো ভাইদেরকে এমনভাবে ত্যাগ করি যেন তারা তীরের উপরিভাগ এবং বানু জুশামের পরিত্যক্ত বৃদ্ধ?'

দুরায়দ প্রত্যাখ্যাত হয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে যার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। তার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ :[৫]

حُيُّوا تُمَاضِرَ وَارِبعُوا صَحبِى + وقِفُوا فَإِنَّ وَقُوفَكم حَسبِى

أخناسُ قَد هَامَ الفُؤادُ بِكُم + وَأَصَابَةَ تبلُ مِنَ الحُبِّ.

'হে আমার সাথী-বন্ধুগণ, তোমরা তুমাদিরকে স্বাগতম জানাও এবং আমার জন্য অপেক্ষা কর। কারণ, তোমাদের অবস্থানই আমার সম্বল। খুনাস (হরিণী) কি তোমাদের হৃদয়কে প্রেমে পাগল করে তুলেছে এবং তার ভালোবাসায় তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছো?'

দুরায়দের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর খানসা বিয়ে করেন স্বগোত্রীয় যুবক রাওয়াহা ইবন 'আবদিল 'উয্‌যাকে। তাঁর ঔরসে পুত্র আবূ শাজারা 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। কিছুদিন পর রাওয়াহা মারা গেলে তিনি মিরদাস ইবন আবী 'আমরকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে দুই পুত্র- ইয়াযীদ ও মু'আবিয়া এবং এক কন্যা 'উমরা।[৬]

---

১. সাহাবিয়াত- পৃ. ১৮১
২. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/২৮৭
৩. ডঃ 'উমার ফাররূখ : তারিখ আল-আদাব-১/৩১৭
৪. ইবন কুতায়বা : আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-পৃ. ১৬০
৫. আল-ইসাবা-৪/২৮৭
৬. আস-সুয়ূতী : দুররুল মানছূর, পৃ. ১১০; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ, পৃ. ১৬০

মক্কায় যখন রিসালাত-সূর্যের উদয় হয় এবং তার কিরণে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে তখন খানসার (রা) দুই চোখ বিশ্বাসের দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। তিনি নিজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে ছুটে যান এবং ইসলামের ঘোষণা দান করেন। এ সাক্ষাতে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। রাসূল (সা) দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যসহকারে তাঁর আবৃত্তি শোনেন এবং তাঁর ভাষার শুদ্ধতা ও শিল্পরূপ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে আরো শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৭]

খানসা (রা) কবি ছিলেন। তবে তিনি কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে মাঝে মধ্যে দুই-চারটি বয়েত (শ্লোক) রচনা করতেন। আরবের বিখ্যাত আসাদ গোত্রের সাথে তাঁর গোত্রের যে যুদ্ধ হয়, তাতে তাঁর আপন ভাই মু'আবিয়া নিহত হন এবং সৎ ভাই সাখর প্রতিপক্ষের আবু ছাওর আল-আসাদী নামের এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত নিযায় মারাত্মকভাবে আহত হন। প্রায় এক বছর যাবত সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে ভাইকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ক্ষত খুব মারাত্মক ছিল। প্রিয় বোনকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তিনি একদিন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৮]

খানসা (রা) তাঁর পরলোকগত দুইটি ভাইকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিশেষত সাখরের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য, বীরত্ব, দানশীলতা, সুদর্শন চেহারা ইত্যাদি কারণে তাঁর স্থান ছিল খানসার (রা) অন্তরের অতি গভীরে। একারণে তার মৃত্যুতে তিনি সীমাহীন দুঃখ পান। আর সেদিন থেকেই তিনি সাখরের স্মরণে অতুলনীয় সব মরসিয়া (শোকগাঁথা) রচনা করতে থাকেন।[৯] ইবন কুতায়বা বলেন :[১০]

وَلَم تَزَلْ تَبكِيهِ حَتّى عَمِيَت.

'সাখরের শোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে যান।'

সাখরকে এত গভীরভাবে ভালোবাসার একটি কারণ ছিল। খানসা (রা) বিয়ে করেছিলেন এক অমিতব্যয়ী ভদ্র যুবককে। তিনি তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ বাজে কাজে উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। খানসা গেলেন ভাই সাখরের নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু সাখর তাঁর সম্পদের অর্ধেক বোনের হাতে তুলে দিলেন। তিনি তা নিয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। উড়নচণ্ডি স্বামী অল্প দিনের মধ্যে তাও শেষ করে ফতুর হয়ে যায়। খানসা (রা) আবার গেলেন সাখরের নিকট। এবারও সাখর তাঁর সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি বোনকে দিয়ে দেন।[১১] এভাবে সাখর তাঁর সৎ বোনের অন্তরের গভীরে এক স্থায়ী আসন গড়ে তোলেন।

সাখরের স্মরণে রচিত মরসিয়ায় হযরত খানসা (রা) এমন সব অন্তর গলানো শব্দে নিজের তীব্র ব্যথা-বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা শুনে বা পাঠ করে মানুষ অস্থির না হয়ে পারে

৭. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/৫৫০
৮. আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৪/২৯৬
৯. উসুদুল গাবা - ৫/৪৪১
১০. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ- ১৬১
১১. ডঃ উমার ফাররূখ- ১/৩১৭

না। যে কোন লোকের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাতে বিধৃত আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে প্রফেসর আর, এ, নিকলসন বলেছেন :[১২]

'It is impossible to translate the poignant and vivid emotion, the energy of passion and noble simplicity of style which distinguish the poetry of Khansa.'

তার একটি মরসিয়ার কয়েকটি বয়েত নিম্নে উদ্ধৃত হলো, যাতে তার শিল্পরূপ, অলঙ্করণ ও স্টাইল প্রত্যক্ষ করা যায়।

اَعَينَىَّ جُودًا وَلاَتَجمُدَا + أَلاَ تَبكِيانِ لِصَخرِ النَّدَى

ألاَ تَبكِيانِ الـجَرِىَّ الـجَمِيلَ + ألاَ تَبكِيانِ الفَتى السَّيِّدى

طَوِيلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ + وَسَادَ عَشِيرَتَهُ امرَدَا

إذَا القَومُ مَدُّوا بِاَيدِيهِم + إلى الـمَجدِ ثُمَّ مَضى مَسعدَا

تَرَى الـمَجدَ يَهدِى إلى بَيتِه + يرى فضَلُ الـمَجدِ أن يُّحمَد

وَإن ذكَرَ الـمَجدَ اَلفُتيَةُ + تأَذُّرَ بالـمجدِ ثُمَّ ارتَدَى

'হে আমার দুই চোখ, উদার হও, কার্পণ্য করোনা। তোমরা কি দানশীল সাখরের জন্য কাঁদবে না? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন সাহসী ও সুন্দর পুরুষের জন্য? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন যুব-নেতার জন্য?

তার অসির হাতল অতি দীর্ঘ,[১৩] ছাইয়ের স্তূপ বিশালকায়।[১৪] সে তার গোত্রের নেতৃত্ব তখনই দিয়েছে যখন সে ছিল অল্প বয়সী।

যখন তার গোত্র কোন সম্মান ও গৌরবময় কর্মের দিকে হাত বাড়িয়েছে, সেও দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং সে সম্মান ও সৌভাগ্য নিয়েই চলে গেছে।

তুমি দেখতে পাবে যে, সম্মান ও মর্যাদা তার বাড়ীর পথ বলে দিচ্ছে। সর্বোত্তম মর্যাদাও তার প্রশংসা করা উচিত বলে মনে করে।

যদি সম্মান ও আভিজাত্যের আলোচনা করা হয় তাহলে তুমি তাকে মর্যাদার চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাবে।'

প্রাচীন আরবের নারীদের অভ্যাস ও প্রথা অনুযায়ী খানসা (রা) তাঁর ভাইয়ের কবরের পাশে সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন, তাকে স্মরণ করে মাতম করতেন এবং স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করতেন। সেই সব মরসিয়ার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[১৫]

---

১২. A Literary History of the Arabs- P. 126

১৩. 'অসির হাতল দীর্ঘ' হওয়ার অর্থ সে ছিল দীর্ঘাকৃতির।

১৪. সে ছিল খুবই অতিথি সেবক। আর সে কারণে তার গৃহে ছাইয়ের বিশাল স্তূপ হয়ে গেছে।

১৫. সাহাবিয়াত-১৮৪

يُذكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمسِ صَخرا + واذكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمسٍ

وَلَولاَ كَثرَةُ البَاكِينَ حَولِي + على مَوتَا هُم لقَتَلتُ نَفسِي

'প্রতিদিনের সূর্যোদয় আমাকে সাখরের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমি তাকে স্মরণ করি প্রতিটি সূর্যাস্তের সময়। যদি আমার চার পাশে নিজ নিজ মৃতদের জন্য প্রচুর বিলাপকারী না থাকতো, আমি আত্মহত্যা করতাম।'[১৬]

ألاَ يَاصَخرُ ان بَكَيتَ عَيْنَيَّ + فَقَد اضحَكتَنِي زَمَنًا طَوِيلاً

بَكَيتُكَ فِيْ نِسَاءِ مُعوِّلاَت + وكُنتُ أحقُّ مَن أبدَى اَلعَوِيلاَتِ

دَفَعتُ بِكَ الخُطُوبَ وَاَنتَ حَيٌّ + فَمَن ذَا يَدفَعُ الخَطبَ الجَمِيلاً

إذَا قَبحَ البُكَاءُ على قَتِيلٍ + رَأيتُ بُكَاءَكَ الحُسنَ الجَمِيلاً.

'ওহে সাখর, যদি তুমি আমার দুই চোখকে কাঁদিয়ে থাক, তাতে কি হয়েছে। তুমি তো একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাকে হাসিয়েছো।

আমি তোমার জন্য কেঁদেছি একদল উচ্চকণ্ঠে বিলাপকারিণীদের মধ্যে। অথচ যারা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে তাদের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করার আমিই উপযুক্ত।

তোমার জীবনকালে তোমার দ্বারা আমি বহু বিপদ-আপদ দূর করেছি। এখন এই বড় বিপদ কে দূর করবে?

যখন কোন নিহত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা খারাপ কাজ, তখন তোমার জন্য কান্নাকে আমি একটি খুবই ভালো কাজ বলে মনে করি।'

সাখরের মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :[১৭]

إنَّ صَخرًا لَتَأتَمُّ الهُدَاةُ بِهِ + كَاَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأسِهِ نَارٌ

'বড় বড় নেতৃস্থানীয় মানুষ সাখরের অনুসরণ করে থাকে। সাখর এমন একটি পাহাড় সদৃশ যার শীর্ষদেশে আগুন জ্বলছে।'

অর্থাৎ আরবের মানুষ যেমন পর্বত শীর্ষের প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলোতে পথ খুঁজে পায়, তেমনিভাবে সাখরের অনুসরণেও পথ পায়।

সাখরের স্মরণে তিনি নিম্নের শোকগাঁথাটিও রচনা করেন :[১৮]

---

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. আশ্-শি'রু ওয়াশ-শু'আরাউ-১৬২

১৮. আল-'ইকদুল ফারীদ-৩/২৬৮

أَلاَ مَالِعَيْنِي أَلاَ مَا لَهَا + لَقَد أخضلَ الدَّمعُ سِربَالَهَا

أمن بعد صخرٍ من آل الشَّريد + حَلَّت به الآرضُ أثقالَهَا

فَآلَيتُ أسَى عَلى هَالَكَ + وَأسَأل بَاكِيَةً مَالَهَا

وَهَمَّت بِنَفسِي على خَطَّةٍ + فَإمَّا عَلَيهَا وَإمَّا لَهَا

سَأحمل نَفسى على خَطَّةٍ + فَإمَّا عَلَيهَا وَإمَّا لَهَا

ওহে আমার চোখের কি হয়েছে, ওহে তার কী হয়েছে? সে তার জামা অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আস-শারীদের বংশধর সাখরের মৃত্যুর পরে যমীন কি তার ভারমুক্ত হয়েছে? (আরবরা বলে থাকে, একজন দুঃসাহসী অশ্বারোহী যমীনের জন্য ভীষণ ভারী। তার মৃত্যু অথবা হত্যায় যমীন সেই ভার থেকে মুক্ত হয়) অতঃপর আমি একজন ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য শপথ করে বসেছি। আর কান্নারত অবস্থায় প্রশ্ন করছি– তার কী হয়েছে?

সে নিজেই সকল দুঃখ-কষ্ট বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আমার নিজের জন্য ভালো কষ্টগুলো অধিক উপযোগী।

আমি নিজেকে একটি পথ ও পন্থায় বহন করবো– হয়তো তা হবে তার বিপক্ষে অথবা পক্ষে।

একবার খানসাকে বলা হলো : আপনার দুই ভাইয়ের কিছু গুণের কথা বলুন তো। বললেন :

كَانَ صَخْرُ وَاللهِ جُنَّةَ الزَّمَان الأغيَرِ، وَزُعَاف الخَمِيْسِ الاخمرِ وكَانَ وَاللهِ مُعَاوِيَةُ اَلقَائِلُ وَالفَاعِلُ.

‘আল্লাহর কসম, সাখর ছিল অতীত সময়ের একটি ঢাল এবং পাঁচহাতী নেযার বিষাক্ত লাল ফলা। আর আল্লাহর কসম, মু‘আবিয়া যেমন বক্তা, তেমনি করিৎকর্মাও।

আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : দুইজনের মধ্যে কে বেশী উঁচু মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী? বললেন :

أمَّا صخرٌ فَحرُّ الشَّتَاء، وَأمَّا مُعَاوِيَةُ فَبَرْدُ الهَوَاءِ.

‘সাখর হচ্ছে শীতকালের উষ্ণতা, আর মু‘আবিয়া হচ্ছে বাতাসের শীতলতা।’

আবার প্রশ্ন করা হলো : কার ব্যথা বেশী তীব্র? বললেন :

أمَّا صخْرُ فَجمَرُ الكَبِدِ، وَأمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُقَامُ الـجَسَدِ.

‘আর সাখর, সে তো হৃদপিণ্ডের কম্পন। আর মু‘আবিয়া হচ্ছে শরীরের জ্বর।’

তারপর তিনি নিম্নের পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন :

أَسَدَانِ مُحمرًا الـمَخَالِبَ نَجْدَةً + بَحرانِ فى الزَّمنِ الغَضُوبَ الأنمر

قَمَرَانِ فى النادى رَفِيعًا مُحتَدٍ + فِى الـمجدِ فَرعًا سؤدد متخيرِ.

'তারা দুইজন হলো দুঃসাহসী রক্তলাল পাঞ্জাওয়ালা সিংহ, রুক্ষ মেজাজ ক্রুদ্ধ কালচক্রের মধ্যে দুইটি সাগর, সভা-সমাবেশে দুইটি চন্দ্র, সম্মান ও মর্যাদায় অত্যুচ্চ, পাহাড়ের মত নেতা ও স্বাধীন।'[১৯]

এখানে উদ্ধৃত এ জাতীয় মমস্পর্শী মরসিয়া রচনা ও মন্তব্যের বদৌলতে হযরত খানসা (রা) ইসলাম-পূর্ব গোটা আরবে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মরসিয়া রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত খানসা (রা) মাঝে-মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী শোকের প্রতীক হিসেবে মাথায় একটা কালো কাপড় বেঁধে রাখতেন। একবার হযরত 'আয়িশা (রা) তাকে বললেন, এভাবে শোকের প্রতীক ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরে আমিও এ ধরনের কোন শোকের প্রতীক ধারণ করিনি। খানসা (রা) বললেন, নিষেধ– একথা আমার জানা ছিলনা। তবে আমার এ প্রতীক ধারণ করার একটা বিশেষ কারণ আছে। 'আয়িশা (রা) কারণটি জানতে চাইলেন।

খানসা (রা) বললেন : আমার পিতা যার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, সে ছিল তার গোত্রের এক নেতা। তবে ভীষণ উড়নচণ্ডি মানুষ। তার ও আমার সকল অর্থ-সম্পদ জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। আমরা যখন একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লাম তখন আমার ভাই সাখর তার সব অর্থ-সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে দেয়। আমার স্বামী কিছুদিনের মধ্যে তাও উড়িয়ে ফেলে। সাখর আমার দুরবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করে এবং আবার তার সকল সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে বেছে নিতে বলে। তার স্ত্রী তখন বলে ওঠে, এর আগে একবার খানসাকে তোমার সম্পদের অর্ধেক দিয়েছো– তাও ভালো ভাগটি, এখনও আবার ভালো ভাগটি বেছে নিতে বলছো। তা এভাবে আর কতকাল চলবে? তার স্বামীর অবস্থা তো সেই পূর্বের মতই আছে। সে জুয়া খেলেই সব শেষ করে ফেলবে। সাখর তখন স্ত্রীকে নিম্নের বয়েত দুইটি আবৃত্তি করে শোনায় :[২০]

وَاللهِ لاَأَمنَحُـهَا شِرَارَهَا + وَهِيَ حصَانٌ قد كَفَتنِي عَارَهَا

وَلَو هلكتُ مَزَّقَت خِمَارَهَا + وَجَعَلَت مِن شَعَر صِدَارَهَار

---

১৯. প্রাগুক্ত-৩/২৬৭

২০. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৪/২৯৬

'আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আমার সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ দিবনা। সে একজন সতী-সাধ্বী নারী, আমার জন্য হেয় ও লাঞ্ছনা যথেষ্ট। আমি মারা গেলে সে তার ওড়না আমার শোকে ফেড়ে ফেলবে এবং কেশ দিয়ে শোকের প্রতীক ফেটা বানিয়ে নিবে।'
উম্মুল মু'মিনীন, তাই আমি তার স্মরণে শোকের এই প্রতীক ধারণ করেছি।[২১]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালের কোন এক সময় খানসা (রা) গেলেন খলীফার দরবারে। তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর এবং তখনও তিনি মৃত ভাইদের জন্য শোক প্রকাশ করে চলেছেন। তার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে ঝরতে গণ্ডদেশে দাগ পড়ে যায়। খলীফা প্রশ্ন করেন : খানসা, তোমার মুখে এ কিসের দাগ? তিনি বলেন : এ আমার দুই ভাইয়ের জন্য দীর্ঘদিন কান্নার দাগ। খলীফা বললেন : তাদের জন্য এত শোক কেন, তারা তো জাহান্নামে গেছে। খানসা (রা) জবাব দিলেন :[২২]

ذلِكَ ادعىَ لَحُزنِى عَلَيهِمَا، لَقَد كُنتُ مِن قَبلُ أَبكِى لَهُمَا مِنَ الثَّأر وَأنَـا اليَـومُ أبكِـى لَهُمَا مِنَ النَّار.

'তাদের জন্য আমার শোক করার এটাই বড় কারণ। পূর্বে তাদের রক্তের বদলার জন্য কাঁদতাম, আর এখন কাঁদি তাদের জাহান্নামের আগুনের জন্য।'
ইবন কুতায়বার বর্ণনা মতে খানসা (রা) বলেন :[২৩]

كنتُ أبكى لَصَخرٍ مِنَ القَتلِ فَانَا أبكِى لَهُ اليَومَ مِنَ النَّار.

'আগে কাঁদতাম সাখরের নিহত হওয়ার জন্য। আর এখন কাঁদি তার জাহান্নামের শাস্তির কথা ভেবে।'

হযরত খানসা (রা) জাহিলী জীবন থেকে ইসলামী জীবনে উত্তরণের পর আচার ও সংস্কারে এবং চিন্তা ও বিশ্বাসে একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন। নিরন্তর জিহাদই যে একজন সত্যিকার মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য– একথাটি তিনি অনুধাবনে সক্ষম হন। আর এজন্য তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হননি।

হিজরী ষোল সনে খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনী অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সাথে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করে। উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈনিক হতাহত হয়। হযরত খানসা (রা) তাঁর চার ছেলেকে সংগে করে এ যুদ্ধে যোগ দেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে তিনি চার ছেলেকে একত্র করে তাদের সামনে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক যে ভাষণটি দান করেন ইতিহাসে তা সংরক্ষিত হয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম :[২৪]

২১. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১
২২. ডঃ 'উমার ফাররূখ-১/৩১৭
২৩. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; আল-'ইকদূল ফারীদ-৩/২৬৬
২৪. খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১; আল-ইসাবা-৪/২৮৮

يَابُنَيَّ، أنتم أسلَمتُم طائِعِينَ، وَهَاجَرتُم مُختَارِينَ، وَوَاللهِ الَّذى لاإله غَيرَهُ، إنَّكُم لَبنُـو رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا أنَّكُـمْ بَنُـو إمـرَأةٍ وَاحِـدَةٍ، مَـا خُنـتُ أبَـاكُمْ، وَلاَفَضَحـتُ خَـالَكُم، وَلاَهَجَّنتُ حَسَبَكُم، وَلاغَيَّرتُ نَسَبَكُم، وَقَدْ تَعلَمون مَا عَدَّ اللهُ لِلْمُسـلِمِينَ مِـنَ الثَّـوابِ العَظِيمِ فى حَربِ الكَافِرِينَ، وَاعلَمُوا أنَّ الدَّارَ البَاقِيَةَ خَيرٌ مِنَ الدَّارِ الفَانِيَةِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاأيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ. فَـإذَا اَصبَحتُمْ غَدًا، فَاغدُوا إلى قِتَالِ عَدُوِّكُم مَستَبصِرِيْنَ، وللهِ عَلى أعدَائِهِ مُستنصِرِينَ.

'আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা আনুগত্য সহকারে ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং হিজরাত করেছো স্বেচ্ছায়। সেই আল্লাহর নামের কসম– যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমরা একজন পুরুষেরই সন্তান, যেমন তোমরা একজন নারীর সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তোমাদের মাতুল কুলকে লজ্জায় ফেলিনি এবং তোমাদের বংশ ও মান-মর্যাদায় কোন রকম কলঙ্ক লেপনও করিনি। তোমরা জান, কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য কত বড় সাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা এ কথাটি ভালো রকম জেনে নাও যে, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের অনন্ত জীবন উত্তম। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।' (আলে ইমরান-২০০) আগামীকাল প্রত্যুষে তোমরা শত্রু নিধনে দূরদর্শিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করবে।'

মায়ের অনুগত ছেলেরা কান লাগিয়ে মায়ের কথা শুনলো। রাত কেটে গেল। প্রত্যুষে তারা একসাথে আরবী কবিতার কিছু পংক্তি আওড়াতে আওড়াতে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল।[২৫] এক পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত রকমের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে সকলে শাহাদাত বরণ করে। শাহাদাতের খবর মা খানসা (রা) শোনার পর যে বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা একটু দেখার বিষয়। তিনি উচ্চারণ করেন :[২৬]

اَلـحَمدُ لِلّهِ الَّذِى شَـرَّفَنِي بِقَتلِـهِم، وَأرجُـوا مِـن ربِّـى أن يَجمَعَنِـى بِـهِم فِـى مُسـتَقَرِّ رَحمتِهِ.

---

২৫. আল-কুরতুবী ও ইবন হাজার সেই সব পংক্তির অনেকগুলি তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (আল-ইসতী'য়াব-৪/২৯৬; আল-ইসাবা-৪/২৮৮)

২৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৪২; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাদেরকে শাহাদাত দান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি আমার রবের নিকট আশা করি, তিনি আখিরাতে তার অনন্ত রহমতের ছায়াতলে তাদের সাথে আমাকে একত্রিত করবেন।'

যে মহিলা জাহিলী যুগে এক সৎ ভাইয়ের মৃত্যুতে সারা জীবন মরসিয়া লিখে ও শোক প্রকাশ করে গোটা আরবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তিনিই এভাবে একসাথে চার ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের জন্য মাতম, শোকগাঁথা রচনা বা শোকের প্রতীক ধারণ– কোন কিছু করেছেন বলে কোন কথা জানা যায় না। ঈমান কী পরিমাণ মজবুত হলে এমন হওয়া যায়?

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর ছেলেদের জীবদ্দশায় প্রত্যেককে এক শো দিরহাম করে ভাতা দিতেন। শাহাদাতের পরেও তাদের ভাতা হযরত খানসার (রা) নামে জারি রাখেন। তিনি আমরণ সে ভাতা গ্রহণ করেন।[২৭]

কবি হিসেবে হযরত খানসার (রা) স্থান

আরবী কবিতার প্রায় সকল অঙ্গনে খানসার (রা) বিচরণ দেখা যায়। তবে মরসিয়া রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। 'আল্লামা ইবনুল আসীর লিখেছেন :[২৮]

أجمَعَ أهلُ العِلمِ بِالشِّعرِ أنَّهُ لَم يَكُن إمرَأةٌ قَبلَهَا وَلاَبَعدَهَا أشعَرُ مِنهَا.

'আরবী কাব্যশাস্ত্রের পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, খানসার পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে বড় কোন মহিলা কবির জন্ম হয়নি।'

উমাইয়্যা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি জারীর (মৃত্যু-১১০ হি.)। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে? জবাবে তিনি বলেছিলেন :[২৯]

أنَا لَولاَ الخَنسَاء 'যদি খানসা না থাকতেন তাহলে আমিই।'

বাশশার বিন বুরদ ছিলেন 'আব্বাসী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তিনি বলেন, আমি যখন মহিলা কবিদের কবিতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তখন তাদের প্রত্যেকের কবিতায় একটা না একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করি। লোকেরা প্রশ্ন করলো : খানসার কবিতারও কি একই অবস্থা? বললেন : তিনি তো পুরুষ কবিদেরও উপরে।[৩০]

সকল আরব কবি উমাইয়্যা যুগের লায়লা উখাইলিয়্যাকে একমাত্র খানসা (রা) ছাড়া আরব মহিলা কবিদের মাথার মুকুট জ্ঞান করেছেন। আধুনিক যুগের মিসরীয় পণ্ডিত ড: 'উমার ফাররূখ হযরত খানসার কাব্য প্রতিভা ও তাঁর কবিতার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :[৩১]

---

২৭. আল-ইসাবা-৪/২৮৮; খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫, ডঃ উমার ফাররূখ-১/৩১৮

২৮. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১

২৯. দুররুল মানছূর-১১০

৩০. তাবাকাত আশ-শু'আরাউ-২৭১

৩১. তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩১৮

خنساءُ أعظمُ شَوَاعِرَ العَرَبِ عَلى الا طَلاق، شِعرُهَا مُقطَّعَات كُلُّهُ، وَهُـوَ فَصِيـحُ اللَّفـظِ رَقِيقٌ مَتينُ السَّبكِ رَائِقُ الدِّيبَاجَةِ، وَقَد غَلَبَ عَلى شِعرِهَا الفَخرُ قَلِيـلاً والرِّثَـاءِ كَثـيراً لِّمَا رَأينَا مِن فَجيعَتِهَا بِأخوَيهَا خَاصةً. وَرِثَاؤُهَا وَاضِحُ الـمَعَانِي رَقِيقٌ صادِقُ العَاطِفَةِ، بَدوِىٌّ الـمَذهَبِ عَلى كَثرَةِ مَافِيه مِنَ التَّلَهُّفِ وَالـمُبَالَغَةِ فِي ذِكرٍ مَحَامِدِ أخوَيهَا.

'খানসা সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তাঁর কবিতা সবই খণ্ড খণ্ড। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, সূক্ষ্ম, শক্ত গঠন ও চমৎকার ভূমিকা সম্বলিত। তার কবিতায় গৌরব' গাথার প্রাধান্য অতি সামান্য। যতটুকু আমরা দেখেছি, বিশেষত তার দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি যে দুঃসহ ব্যথা পান সেজন্য মরসিয়ার প্রাধান্য অনেক বেশী। তার মরসিয়ার অর্থ স্পষ্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল এবং আবেগ-অনুভূতির সঠিক মুখপত্র। তাতে অত্যধিক দুঃখ ও পরিতাপ এবং দুই ভাইয়ের প্রশংসায় অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও তা বেদুঈন পদ্ধতি ও স্টাইলের।'

জাহিলী যুগে সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা প্রদর্শনী ও সভা-সমাবেশ করার রীতি ছিল। এর উদ্দেশ্য হতো পরস্পর মত বিনিময়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করতো। সমগ্র আরববাসী দূর দূরান্ত থেকে এসব মেলায় ছুটে আসতো। এর সূচনা হতো রাবী'উল আওয়াল মাস থেকে। এ মাসের প্রথম দিন দুমাতুল জান্দালে বছরের প্রথম মেলা বসতো। এই মেলা শেষ করে তারা হিজরের বাজারে চলে যেত। তারপর উমানে, সেখান থেকে হাদারামাউতে। তারপর ইয়ামনের সান'আর আশে-পাশে কোথাও দশ, আবার কোথাও বিশ দিন অবস্থান করতো। এভাবে গোটা আরব ঘোরার পর হজ্জের কাছাকাছি সময়ে জুলকা'দা মাসে মক্কার কয়েক মাইল দূরে 'উকাজের[৩২] বাজারে বছরের সর্বশেষ মেলা বসতো। এ মেলাটি ছিল আরবের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। আরবের সকল গোত্রের লোক, বিশেষত গোত্র-নেতারা এ মেলায় অবশ্যই যোগদান করতো। কোন গোত্র-নেতা কোন কারণে অংশগ্রহণ করতে না পারলে প্রতিনিধি পাঠাতো। এ মেলার অঙ্গনে আরববাসী তাদের গোত্রীয় নেতা নির্বাচন, আন্ত-গোত্র কলহের মীমাংসা, পারস্পরিক হত্যা

৩২. 'উকাজ : নাখলা ও তায়িফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার বসতো। ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে এ বাজারের পত্তন হয় এবং হিজরী ১২৯ সনে খারেজীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত চালু ছিল। (ড: আবদুল মুন'ইম খাফাজী ও ড: সালাহ উদ্দীন আবদুত তাওয়াব : আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল- জাহেলিয়্যা ওয়া সাদরিল ইসলাম-পৃ. ২৮) তারপর খারেজীদের ভয়ে সেই যে 'উকাজের বাজার বন্ধ হয়ে যায়, আজ পর্যন্ত আর চালু হয়নি। 'উকাজের পর আরবের মাজান্না ও জুলমাজাযের মত প্রাচীন বাজারও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মক্কার এ জাতীয় সর্বশেষ বাজারটি ধ্বংস করা হয় ১৯৭ হিজরীতে। (আল-আযরুকী : আখবারু মক্কাহ্-১২১-২২)

ও সংঘাতের অবসান ইত্যাদি বিষয়ের চূড়ান্ত করতো। এই মেলায় মক্কার কুরাইশ গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সবার উপরে। যখন যাবতীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যেত তখন প্রত্যেক গোত্রের কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতো। সেসব কবিতার বিষয় হতো বীরত্ব, সাহসিকতা, দানশীলতা, অতিথি সেবা, পূর্ব পুরুষের শৌর্য-বীর্য, গৌরব, শিকার, আনন্দ-উৎসব, খুন-খারাবি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি-সন্ধি, প্রেম-বিরহ, শোক ইত্যাদির বর্ণনা। এখানেই নির্ধারিত হতো আরব কবিদের স্থান ও মর্যাদা।

কবি খানসাও এ সকল মেলা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন এবং 'উকাজে তার মরসিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকৃতি পায়। তিনি যখন উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসতেন তখন অন্য কবিরা তার চার পাশে ভীড় জমাতো। সবাই তার কবিতা শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকতো। এক সময় সকলকে মরসিয়া শুনিয়ে তৃপ্ত করতেন।

এ সকল মজলিসে খানসার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে তার তাঁবুর দরজায় একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হতো, আর তাতে লেখা থাকতো–

أرثى العرب কথাটি। যার অর্থ আরবের শ্রেষ্ঠ মরসিয়া রচয়িতা। ইবন কুতায়বা বলেন :[৩৩]

كانت تَقِفُ بِالـمَوسِمِ فَتَسُومُ هَودَجَهَا بِسُومَةٍ وَتَعَاظَمَ العَرَبُ بِمُصِيبَتِـهَا بِأَبِيـهَا عَمرٍو

وَاخَوِيهَا صَخرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَتُنشِدُهُم فَتَبكِي النَّاسُ.

'তিনি এসব মৌসুমী মেলায় অবস্থান করতেন। তার হাওদাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। তার পিতা 'আমর এবং দুই ভাই– সাখর ও মু'আবিয়ার মৃত্যুর বিপদটিকে আরববাসী খুব বড় করে দেখতো। তিনি কবিতা পাঠ করতেন, আর লোকেরা কাঁদতো।'

জাহিলী আরবে বহু বড় বড় কবি জন্মেছিলেন। আন-নাবিগা আজ-জুরইয়ানী (মৃত্যু ৬০৪ খ্রি.) সেই সব বড় কবিদের একজন। তার কাব্যখ্যাতি আজও বিশ্বব্যাপী। তার আসল নাম যিয়াদ ইবন মু'আবিয়া এবং ডাকনাম আবূ উমামা। আবূ উবায়দা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :[৩৪]

هُوَ مِنَ الطَبَّقَةِ الأولى الـمُقَدَّمِينَ عَلى سَائِرِ الشُّعَرَاء.

'সকল কবির পুরোভাগে অবস্থানকারী প্রথম স্তরের অন্যতম কবি তিনি।' উন্নত মানের প্রচুর কবিতা রচনার কারণে তাঁকে 'আন-নাবিগা' বলা হয়। 'উকাজ মেলায় কেবল তাঁরই জন্য লাল তাঁবু নির্মাণ করা হতো। এ ছিল একটি বিরল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক, যা কেবল তিনি লাভ করার যোগ্য বলে ভাবা হতো। অন্য কারও জন্য এমন লাল তাঁবু নির্মাণ করা যেত না। এর কারণ, কাব্য ক্ষেত্রে যিনি সর্বজনমান্য, কেবল তিনিই এ মর্যাদা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। ইবন কুতায়বা বলেন :[৩৫]

---

৩৩. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; সিফাতু জাযীরাতিল 'আরাব-২৬৩

৩৪. সাহাবিয়াত-১৮৬

৩৫. আস-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০

وَكَانَ النَّابِغَةُ تُضْرَبُ لَهُ قُبَّةٌ حَمرَاءُ مِن آدم بِسُوق عُكَاظٍ وَتَأْتِيهِ الشُّعَرَاءُ فَتَعرِضُ عَلَيْـهِ أَشْعَارَهَا.

'আন-নাবিগার জন্য 'উকাজে লাল রঙ্গের চামড়ার তাঁবু টাঙ্গানো হতো। সেই তাঁবুতে কবিরা এসে তাকে কবিতা শোনাতো।'

'উকাজের মেলা উপলক্ষে কবি আন-নাবিগার সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন হতো। আরবের বড় বড় কবিগণ এ সম্মেলনে যোগ দিতেন এবং নিজ নিজ কবিতা পাঠ করে স্বীকৃতি লাভ করতেন। একবার এমনি এক সম্মেলনে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ তিন কবি- আল-আ'শা আবূ বাসীর, হাস্সান ইবন ছাবিত ও খানসা যোগ দেন। প্রথমে আল-আ'শা, তারপর হাস্সান কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে পাঠ করেন খানসা। তার পাঠ শেষ হলে সভাপতি আন-নাবিগা তাকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَاللهِ لَولاَ أَنَّ أَبَا بَصِير أَنشَدَنِي آنفًا لَقُلْتُ إِنَّكَ أَشعَرُ الأَنس وَالجِنَّ.

'আল্লাহর কসম! এই একটু আগে যদি আবূ বাসীর আমাকে তার কবিতা না শোনাতেন তাহলে আমি বলতাম, জিন ও মানুষের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

আন-নাবিগার এ মন্তব্য শুনে কবি হাস্সান দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে– 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার চেয়ে এবং আপনার পিতা ও পিতামহের চেয়েও বড় কবি। আন-নাবিগা হাস্সানের হাত চেপে ধরে বলেন : 'ভাতিজা, তুমি আমার এ শ্লোকটির চেয়ে ভালো কোন শ্লোক বলতে পারবে কি?

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ الَّذِى هُوَ مَدرِكِى + وَإن خِلتُ أَنَّ الـمُنْتَآى عَنك وَاسِعُ

'নিশ্চয় তুমি সেই রাত্রির মত, যে রাত্রি আমাকে ধারণ করে। যদিও আমি ধারণা করেছি, তোমার থেকে আমার দূরত্ব অনেক ব্যাপক।' অর্থাৎ রাত্রির মত তুমি আমাকে বেষ্টন করে আছ– তা আমি যত দূরেই থাকি না কেন।

তারপর তিনি খানসাকে বলেন : 'তাকে আবৃত্তি করে শোনাও।'

খানসা তার আরো কিছু শ্লোক আবৃত্তি করেন। তারপর আন-নাবিগা মন্তব্য করেন :

وَاللهِ مَارَأَيتُ ذَاتَ ثَدَّين أَشعَرُ مِنك.

'আল্লাহর কসম! আমি দুই স্তনবিশিষ্ট কাউকে তোমার চেয়ে বড় কবি দেখিনি। অর্থাৎ তোমার চেয়ে বড় কোন মহিলা কবিকে দেখিনি।' সাথে সাথে খানসা আন্-নাবিগার কথার সংশোধনী দেন এভাবে– لا واللهِ وَلا ذَا خُصيَين.

'না, আল্লাহর কসম! দুই অণ্ডকোষধারীদের মধ্যেও না।' অর্থাৎ কেবল নারীদের মধ্যে নয়, বরং পুরুষদের মধ্যেও আপনি আমার চেয়ে বড় কোন কবি দেখেননি।[৩৬]

---

৩৬. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী : কিতাবুল আগানী-১১/৬; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০,

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে আন-নাবিগার প্রশ্নের জবাবে হাস্‌সান তাঁর নিম্নের শ্লোকটি পাঠ করে শোনান :

لَنَا الـجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلمَعنَ فِي الضُّحى + وَأسيافُنَا يَقطُرنَ مِنَ نَجدَةٍ دَمًا

'আমাদের আছে অনেক বড় বড় স্বচ্ছ ও ঝকঝকে বরতন, পূর্বাহ্ন বেলায় যা চকচক করতে থাকে। আর আমাদের তরবারিসমূহ এমন যে তার হাতল থেকে ফোটা ফোটা রক্ত ঝরতে থাকে।' কবি হাস্‌সান তাঁর শ্লোকে নিজের অতিথি সেবা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবি আন-নাবিগা মতান্তরে খানসা হাস্‌সানের শ্লোকটির কঠোর সমালোচনা করে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন এবং তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৭]

মোটকথা, কাব্য শক্তি ও প্রতিভার দিক দিয়ে হযরত খানসার (রা) স্থান দ্বিতীয় স্তরের তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে অনেক উঁচুতে। তার কবিতার একটি দিওয়ান ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের একটি প্রকাশনা সংস্থা সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দিওয়ানটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়।[৩৮]

হযরত খানসার (রা) মৃত্যু সন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। একটি মতে, হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনা পর্বে হি: ২৪/ খ্রি: ৬৪৪-৪৫ সনে তিনি মারা যান। পক্ষান্তরে অপর একটি মতে, হি: ৪২/খ্রি: ৬৬৩ সনের কথা এসেছে।[৩৯]

৩৭. কুদামা ইবন জা'ফার : নাকদুশ শি'র- পৃ. ৬২; আল- আগানী-৯/৩৪০

৩৮. সাহাবিয়াত-১৮৮,

৩৯. ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩১৮।

আসমা' বিন্‌ত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়্যা (রা)

হযরত আসমা' (রা) একজন মহিলা আনসারী সাহাবী। তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান এবং মাতা উম্মু সা'দ ইবন য়ায়স ইবন মাস'উদ। তাঁর স্বামী সা'ঈদ ইবন 'আম্মারা- যিনি আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী নামে প্রসিদ্ধ।[১] হযরত আসমা'র ডাকনাম ছিল উম্মু সালামা, মতান্তরে উম্মু 'আমির। তিনি মদীনায় বিখ্যাত আওস গোত্রের বানূ 'আবদিল আশহাল শাখার সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী মুআয ইবন জাবালের (রা) ফুফুর কন্যা।[২] ইবন হাজার তাঁকে মু'আয ইবন জাবালের চাচাতো বোন বলেছেন।[৩]

হযরত আসমা'র (রা) জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে বেশী কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী দারুণ বাকপটু মহিলা। বুদ্ধিমত্তা, ধর্মভীরুতা, ইবাদাত-বন্দেগী, হাদীছ বর্ণনা ইত্যাদির জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর আরো একটি বড় পরিচয় তিনি একজন বীর যোদ্ধা। মহিলাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কথা বলার জন্য তাঁকে বলা হতো- মহিলাদের মুখপাত্রী। একটি বর্ণনা মতে, তিনি আকাবার শেষ বাই'আতে অংশগ্রহণ করেন।[৪]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসেছেন। একদিন সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে আছেন। এমন সময় আসমা' এলেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে ছোট-খাট এ ভাষণটি দিলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একদল মুসলিম মহিলার পক্ষ থেকে তাদের কিছু কথা বলার জন্য এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নারী-পুরুষ উভয় জাতির জন্য পথপ্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন। আমরা মহিলারা আপনার উপর ঈমান এনে আপনার অনুসারী হয়েছি। কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করি। আমরা গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষের যৌন তৃপ্তি পূরণ করি এবং তাদের সন্তানদের ধারণ করি। আর আপনারা পুরুষরা জুম'আ, নামাযের জামা'আত ও জানাযায় শরীক হতে পারেন। হজ্জে যান। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আপনারা আল্লাহর পথে জিহাদে চলে যান। আর আমরা তখন আপনাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করি, ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করি, কাপড় তৈরীর জন্য চরকায় সূতা কাটি। আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা কি আপনাদের সাওয়াবের অংশীদার হবো না? আমার পিছনে যে সকল মহিলা আছেন, তাদেরও আমার

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৬; আল-ইসাবা-৪/৮৯
২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭৮
৩. আল-ইসাবা-৪/২২৫
৪. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭; টীকা-৪।

মত একই বক্তব্য ও একই মত।"

রাসূল (সা) আসমা'র বক্তব্য শোনার পর সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তোমরা কি এর চেয়ে আরো সুন্দর করে দীন সম্পর্কে জানতে চায় এমন কোন মহিলার কথা শুনেছো? তাঁরা বললেন : আমাদের তো ধারণাই ছিল না যে, একজন মহিলা এমন প্রশ্ন করতে পারেন। তারপর রাসূল (সা) আসমা'কে লক্ষ্য করে বলেন : "নারী যদি তার স্বামীর সাথে সদাচরণ করে,তার মন যুগিয়ে চলে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছামত আনুগত্য করে এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব-অধিকার পূরণ করে তাহলে সেও পুরুষের সমান প্রতিদান লাভ করবে। যাও, তুমি একথা তোমার পিছনে রেখে আসা অন্য নারীদেরকে বলে দাও।"

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে এ সুসংবাদ শুনে আসমা' আনন্দের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করতে করতে ফিরে যান।[৫]

হযরত আসমা' যে মহিলা দলটির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সেই দলে তাঁর খালাও ছিলেন। তাঁর হাতে সোনার চুড়ি ও আংটি ছিল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এই অলঙ্কারের যাকাত দেওয়া হয়? বললেন : না। রাসূল (সা) বললেন : তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তোমাকে আগুনের চুড়ি ও আংটি পরান? আসমা' তখন খালাকে বললেন : খালা, তুমি এগুলো খুলে ফেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব অলঙ্কার খুলে ছুড়ে ফেলে দেন। তারপর আসমা' বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি অলঙ্কার না পরি তাহলে স্বামীদের নিকট তো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বো। বললেন : রূপোর অলঙ্কার বানিয়ে তাতে জাফরানের রং লাগিয়ে নাও। সোনার চাকচিক্য দেখা যাবে। আলোচনার এ পর্যায়ে বাই'আতের সময় হয়ে যায়। রাসূল (সা) তাঁদেরকে কয়েকটি অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করান। এই সময় আসমা' বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা স্পর্শ করে আমাদের এ বাই'আত সম্পন্ন করি। রাসূল (সা) বললেন : আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করি না।[৬] কোন কোন সূত্রে অলঙ্কারের ঘটনাটি খোদ আসমা'র বলে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

হযরত আসমা' (রা) সব সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আশে পাশে অবস্থান করতেন। একদিন রাসূল (সা) তার সামনে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। রাসূল (সা) এ অবস্থায় উঠে চলে গেলেন। ফিরে এসে

---

৫. আল-ইসতী'আব-৪/২৩৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯৮, ৩৯৯; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৪৯। আত-তূসী এ ঘটনাটি আসমা' বিন্ত 'উবায়দ আল-আনসারিয়্যার প্রতি আরোপ করেছেন। ইবন মুন্দাহ্ ও আবূ নু'আয়ম এ ঘটনাটি আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ আল-আশহালিয়্যার বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আসমা' আল-আশ্হালিয়্যা ও আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান ভিন্ন দুই মহিলা। ইবন 'আবদিল বার উপরোক্ত দুজনকে একই মহিলা বলেছেন এবং তাঁর মতে এ মহিলাই রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইমাম আহমাদও এ রকম মত পোষণ করেছেন। (আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; টীকা-১)

৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬১

৭. সাহাবিয়াত-৩০২

দেখলেন, আসমা' একই অবস্থায় কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কাঁদছো কেন? আসমা' বললেন : আমাদের অবস্থা এমন যে, দাসী আটা চটকাতে বসে, আর এদিকে আমাদের ক্ষিধেও পেয়ে যায়। তার খাবার তৈরী শেষ না হতেই আমরা খাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। দাজ্জালের সময় যখন অভাব দেখা দেবে তখন আমরা ধৈর্য ধরবো কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন : সেদিন তাসবীহ ও তাকবীর ক্ষুধা থেকে রক্ষা করবে। এত কান্নাকাটি ও হাহুতাশের প্রয়োজন নেই। তখন আমি যদি জীবিত থাকি, তোমাদের জন্য ঢাল হয়ে থাকবো। অন্যথায় আমার পরে আল্লাহ প্রত্যেকটি মুসলমানকে রক্ষা করবেন।[৮]

হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর পরিবারের অন্য লোকদের সাথে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে আসার অল্প কিছুদিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে যান। এই অনুষ্ঠানে হযরত আসমা'ও ছিলেন। 'আয়িশাকে (রা) যারা নববধূর বেশে সাজিয়েছিলেন আসমা' তাঁদের অন্যতম। সাজগোজ শেষ হলে 'আয়িশাকে (রা) একটি আসনে বসিয়ে স্বামী রাসূলকে (সা) সংবাদ পাঠানো হয়। তিনি এসে 'আয়িশার (রা) পাশে বসে পড়েন। মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ একজন এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দেন। তিনি সামান্য পান করে 'আয়িশার (রা) হাতে দেন। তিনি লজ্জায় মাথা নত করে রাখেন। তখন আসমা' ধমকের সুরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যা দিচ্ছেন তা গ্রহণ কর। হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে দুধের পেয়ালা নিয়ে সামান্য পান করে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ফিরিয়ে দেন। তিনি পেয়ালাটি আসমা'র হাতে তুলে দেন। পেয়ালাটির যে স্থানে রাসূল (সা) মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন ঠিক সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করার জন্য আসমা' পেয়ালাটি ঘোরাতে থাকেন। রাসূল (সা) বলেন অন্য মহিলাদেরকেও দাও। কিন্তু উপস্থিত অন্য মহিলারা বললেন, আমাদের এখন পান করার ইচ্ছা নেই। জবাবে রাসূল (সা) বললেন : ক্ষুধার সাথে মিথ্যাও? অর্থাৎ ক্ষুধার সাথে মিথ্যাকে এক করে ফেলছো?[৯]

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল বীরাঙ্গনা মুজাহিদের নাম পাওয়া যায় হযরত আসমা'র নামটি তাদের শীর্ষে শোভা পায়। এমনই হওয়া উচিত। কারণ, তিনি এমন এক পরিবারের সন্তান যাদের সকলে আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তার জন্য জীবন কুরবানী করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহর (সা) মাদানী জীবনের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে এই পরিবারের লোকেরা তাঁদের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের দিন সাতজন আনসার ও দু'জন কুরাইশ, মোট নয়জন মুজাহিদসহ রাসূল (সা) মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

---

৮. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৩

৯. প্রাগুক্ত-৬/৪৫৮, ৪৬১

শত্রু পক্ষের আঘাতে এক পর্যায়ে রাসূল (সা) আহত হন। তখন রাসূল (সা) তাঁর সংগের এই ক'জন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বলেন : যে এদেরকে আমাদের থেকে দূরে তাড়িয়ে দিতে পারবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা তিনি একথা বলেন যে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

আনসারদের এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। রাসূল (সা) আবারো পূর্বের মত একই কথা বললেন। এবারো একজন আনসারী এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে একে একে সাতজন আনসারীই শহীদ হলেন।[১০] এর সপ্তম জন ছিলেন আসমা'র ভাই 'আম্মারা ইবন ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান। শত্রু পক্ষের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে তিনি যখন পড়ে গেলেন ঠিক তখনই একদল মুসলিম মুজাহিদ এসে উপস্থিত হন। তারা পৌত্তলিক বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের কবল থেকে আম্মারাকে উদ্ধার করেন। রাসূল (সা) চেঁচিয়ে তাদেরকে বলেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাসূল (সা) নিজের পায়ের উপর তার মাথা রেখে তাকে শুইয়ে দেন। এ অবস্থায় তার যখন মৃত্যু হলো তখন দেখা গেল তার মুখ রাসূলুল্লাহর (সা) পদযুগলের উপর। এই উহুদ যুদ্ধে আসমা'র পিতা ইয়াযীদ, আসমা'র আরেক ভাই 'আমির এবং চাচা যিয়াদ ইবন আস-সাকান (রা) শহীদ হন।[১১]

তাঁর পরিবারের সদস্যদের এভাবে শাহাদাত বরণে জিহাদের প্রতি আসমা'র আগ্রহ ও আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে অনেকগুলো অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। বাই'আতে রিদওয়ান, মক্কা বিজয় ও খাইবর অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, আসমা' (রা) হিজরী ১৫ সনে সংঘটিত ইয়ারমূক যুদ্ধে যোগদান করেন এবং তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে একাই নয়জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[১২]

হযরত আসমা' (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য ও সান্নিধ্যে কাটান। সব সময় তাঁর আশে পাশেই থাকতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার সামান্য সুযোগকেও হাতছাড়া করতেন না। রাসূলের (সা) সকল কথা কান লাগিয়ে শুনতেন এবং স্মরণ রাখতেন। সময়ে-অসময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। এ কারণে আনসারী মহিলাদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারীর গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ৮১ (একাশি)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৩]

হযরত আসমা' (রা) থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : মাহমূদ ইবন 'আমর (তাঁর ভাগ্নে) আল-আনসারী, আবূ সুফইয়ান মাওলা ইবন আহমাদ, 'আবদুর

---

১০. সহীহ মুসলিম : বাবু গাযওয়াতি উহুদ।

১১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮০

১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৭; আল-ইসাবা-৪/২২৯; আ'লাম আন-নিসা'-১৬৮; মাজমা' আয-হাওয়ায়িদ-৯/২৬০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭

১৩. আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; নিসা' মিন 'আসর-আন-নুবুওয়াহ্-৮০

রহমান ইবন ছাবিত আস-সামিত আল-আনসারী, মুজাহিদ ইবন জুবায়র, মুহাজির ইবন আবী মুসলিম ও শাহর ইবন হাওশাব। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে।[১৪] ইমাম আল-বুখারী তাঁর "আল-আদাব আল-মুফরাদ" গ্রন্থেও সংকলন করেছেন।[১৫]

হযরত আসমা' (রা) বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে মোটামুটি আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, উপলক্ষ, শরী'আতের বিভিন্ন বিধান, রাসূলুল্লাহর (সা) গুণাবলী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা যায়। যেমন সূরা আল-মায়িদা নাযিল হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) উষ্ট্রী আল-'আদবা'র লাগাম ধরা ছিলাম। রাসূল (সা) তখন তার পিঠে বসা। এমতাবস্থায় উষ্ট্রীর বাহু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল।[১৬]

জামা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় পোশাক। আসমা' (রা) সেই জামার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : রাসূলুল্লাহর (সা) জামার হাতা ছিল হাতের কবজী পর্যন্ত।[১৭]

এ হাদীছটিও আসমা' (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ইহুদীর নিকট কিছু খাদ্যের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্মটি বন্ধক রাখা অবস্থায় ইনতিকাল করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর আবূ যার আল-গিফারী (রা) যে শাসকদের কঠোর সমালোচনা করবেন এবং এর জন্য যে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হবে এ বিষয়ের একটি হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন।[১৮]

হাদীছ, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে মদীনার আনসারদের মহানুভবতা, উদারতা ও অন্যকে প্রাধান্য দানের গুণের অনেক কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে তাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক মু'জিযা যে প্রকাশ পেয়েছিল সেকথাও এসেছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে আসমা'কে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযার কথা আসমা'র যবানীতে বর্ণনা করেছেন। আসমা' বলেন : আমি একদিন দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করছেন। আমি ঘরে এলাম এবং কিছু হাঁড়ওয়ালা গোশ্ত ও রুটি নিয়ে তাঁর সামনে রেখে বললাম : আমার বাবা-মা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এগুলো আপনি রাতের খাবার হিসেবে খেয়ে নিন। তিনি সঙ্গীদের ডেকে বললেন : বিসমিল্লাহ বলে তোমরা খেতে শুরু কর। সেই সামান্য খাবার রাসূলুল্লাহ (সা) খেলেন, তাঁর সঙ্গীরা খেলেন এবং বাড়ীর যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাই খেলেন। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! সর্বমোট চল্লিশজন লোক খাওয়ার পরও আমি দেখলাম বেশীর ভাগ গোশ্ত ও রুটি রয়ে গেছে। তারপর রাসূল (সা)

---

১৪. আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৬৬

১৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮১

১৬. তাফসীর ইবন কাছীর-২/২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২২

১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৭০৫

১৮. ইবন মাজাহ (২৮৩৮); আত-তিরমিযী-(১৭৬৫); হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭

আমাদের একটি মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে বিদায় নেন। আমরা সেই মশ্‌কটি সংরক্ষণ করেছিলাম। কারো অসুখ হলে তাকে সেই মশকে পানি পান করানো হতো এবং মাঝে মাঝে বরকত লাভের উদ্দেশ্যেও তাতে পান করা হতো।[১৯]

তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণা ছিলেন। একবার শাহর ইবন হাওশাব তাঁর বাড়ীতে এলেন। তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আসমা' (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ঘটনা শুনিয়ে বলেন : এখন তো নিশ্চয় আর খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে না। শাহর বললেন : আম্মা! এমন ভুল হবে না।[২০]

হযরত আসমা' (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মদীনা ত্যাগ করে শামে চলে যান। এ সময় ইয়ারমূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি দিমাশ্‌কে অবস্থান করে সেখানে হাদীছ বর্ণনা করতে থাকেন। একথা ইবন 'আসাকির আবূ যুর'আর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসমা'র (রা) মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায় না। 'আল্লামা আয-যাহাবী (রহ) বলেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার (রা) শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২১] উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ ১৪ রাবী'উল আউয়াল ৬৪হি. মৃত্যুবরণ করেন। আয-যাহাবী আরো বলেছেন, আসমা' (রা) দিমাশ্‌কে বসবাস করেন এবং দিমাশ্‌কে বাবুস সাগীরে তাঁর কবর বিদ্যমান।[২২] একথারই সমর্থন পাওয়া যায় ইবন কাছীরের মন্তব্যে। হিজরী ৬৯ সনে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের নামের মধ্যে তিনি আসমা'র নামটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, দিমাশ্‌কের বাবুস সাগীরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের খিলাফতকালে হযরত আসমা' ইনতিকাল করেছেন।[২৩] তার সন্তানাদির কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

---

১৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮২
২০. আল-ইসতী'আব-৩/৭২৬; মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৮
২১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮৩
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২২০, ২৯৬
২৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৮৩

উম্মু রূমান বিন্‌ত ‘আমির (রা)

হযরত উম্মু রূমানের (রা) পরিচয় এই রকম : উম্মু রূমান বিন্‌ত ‘আমির ইবন ‘উয়াইমির ইবন ‘আবদু শাম্‌স ইবন ‘উত্তাব ইবন উযাইনা আল-কিনানিয়া।[১] ইতিহাসে নামটির দুই রকম উচ্চারণ দেখা যায়– উম্মু রূমান ও উম্মু রাওমান। ইবন ইসহাক তাঁর আসল নাম “যায়নাব” বলেছেন, তবে অন্যরা বলেছেন ‘দা’আদ’।[২] তিনি উম্মু রূমান ডাকনামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

আরব উপ-দ্বীপের ‘আস-সারাত’ (السَّرَاةُ)[৩] অঞ্চলে উম্মু রূমানের জন্ম হয় এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন। বিয়ের বয়স হলে ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ ইবন সাখবারা আল-আযদীর সাথে বিয়ে হয়। আত-তুফাইল ইবন ‘আবদিল্লাহ নামে তাদের এক ছেলে হয়। সে ছিল ইসলামপূর্ব আল-আইয়্যাম আল-জাহিলিয়্যার যুগ। গোটা আরবে তখন অনাচার ও অশান্তি বিরাজমান। আরব উপ-দ্বীপে যতটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল, বলা চলে তা কেবল উম্মুল কুরা মক্কা নগরীতেই ছিল।

وإذ قال ابراهيمُ رب اجعل هذا البلد أمنا...[৪]

‘ইবরাহীম যখন বলেছিল হে প্রভু! আপনি এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন...।’ এ সম্মানিত ও গৌরবময় শহরের কেন্দ্রস্থলেই ছিল আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের ঘর কা‘বা। যুগে যুগে মানুষ এই শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে এসে কা‘বার পাশে বসবাস করতে চেয়েছে। উম্মু রূমানের স্বামী ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছেরও স্বপ্ন ছিল এই পবিত্র কা‘বার প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করার। সেই স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি একদিন স্ত্রী উম্মু রূমান ও ছেলে আত-তুফাইলকে সংগে নিয়ে জন্মভূমি আস-সারাত থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি তৎকালীন আরবের নিয়ম-অনুযায়ী সেখানকার অধিবাসী আবূ বকরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে তিনি আবূ বকরের আশ্রয়ে পরিবারসহ মক্কায় বসবাস শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা যান। বিধবা উম্মু রূমান তাঁর ছেলেসহ বিদেশ-বিভূঁয়ে দারুণ অসহায় অবস্থায় পড়েন।

এই বিপদের মধ্যে উম্মু রূমান একটা আশার আলো দেখতে পান। তাঁদের আশ্রয়দাতা আবূ বকর ছিলেন একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও দানশীলতার অধিকারী। মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর স্বভাব। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার পৌত্তলিক শক্তি আবূ বকরের (রা) উপর বাড়াবাড়ি শুরু করলে তিনি দেশ ত্যাগের ইচ্ছা করেন। তখন ইবন আদ-দিগান্না কুরাইশদের তিরস্কার করে যে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেন

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৩; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০৯; সিয়ারু আ‘লাম আন-নুবালা’-২/১৩৫
২. আল-ইসাবা-৪/৪৩৩; আর-রাওদ আল-আনুফ-৪/১২
৩. মু‘জাম আল-বুলদান-৩/২০৪-২০৫; السراة দ্র.।
৪. সূরা ইবরাহীম-৩৫

তাতে আবূ বকরের (রা) সদগুণাবলী চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন :[৫]

أتخرجون رجلا يُكسب المعدوم ويصل الرَّحم ويحمل الكلّ، ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق.

'এমন একটি লোককে তোমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো যে কিনা হত-দরিদ্রদের সাহায্য করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে, অন্যের বোঝা বহন করে, অতিথিকে আহার করায় এবং বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করে?' এমন ব্যক্তি তাঁর আশ্রয়ে থাকা সন্তানসহ এক অসহায় বিধবাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন কিভাবে? তিনি উম্মু রূমানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁকে বিয়ে করে তাঁর ছেলেসহ নিজের পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। এভাবে উম্মু রূমান (রা) একটি চমৎকার ঘর ও সংসার লাভ করেন। আবূ বকরের (রা) সাথে বৈবাহিক জীবনে তিনি তাঁকে এক ছেলে ও এক মেয়ে– 'আবদুর রহমান ও 'আয়িশাকে (রা) উপহার দেন।[৬] এই 'আয়িশা (রা) পরবর্তীকালে 'উম্মুল মু'মিনীন' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জাহিলী যুগে আবূ বকর (রা) কুতাইলা বিন্ত 'আবদিল 'উযযা আল-'আমিরিয়াকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ছেলে 'আবদুল্লাহ ও মেয়ে আসমা' (রা)। ইসলাম গ্রহণ না করায় কুতাইলার সাথে আবূ বকরের (রা) ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইসলামী জীবনে আবূ বকর বিয়ে করেন 'আসমা' বিন্ত 'উমাইসকে (রা)। তাঁর গর্ভে জন্ম হয় ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকরের (রা)। তিনি হাবীবা বিন্ত খারিজাকেও বিয়ে করেন এবং মেয়ে উম্মু কুলছূম মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় আবূ বকর ইনতিকাল করেন।[৭]

ইসলাম গ্রহণ

সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা একথা সমর্থিত যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে যিনি সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দেন, স্বভাবতঃই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুহূর্তে নিজের আপনজনদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করে থাকবেন। একথা জানা যায় যে, তিনি তাঁর মা উম্মুল খায়র সালমা বিন্ত সাখর (রা)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে নিয়ে হাজির করেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি স্ত্রী উম্মু রূমানকেও ইসলামের দা'ওয়াত দেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তাঁরা ইসলামী দা'ওয়াতের একেবারে সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণকারী দলটির সদস্য হওয়ার অনন্য গৌরবের অধিকারী হন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৮]

---

৫. নিসা' 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৬৯-২৭০
৬. প্রাগুক্ত; নিসা' হাওলার রাসূল-২৬৪
৭. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল-জান্নাহ্-৮৪
৮. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল-লুগাত-২/১৮৩

لم أعقل أبوىّ إلاوهما يدينان الدين ـ

'আমার পিতাকে চেনার পরই দেখেছি তাঁরা দুইজন এ দীন ধারণ করেছেন।'

ইবন সা'দ বলেন : أسلمت أمْ رومان بمكة قديمًا وبايعت وهاجرت

'উম্মু রূমান মক্কায় বহু আগে ইসলাম গ্রহণ করে বাই'আত করেন এবং হিজরাতও করেন।'[৯]

ইসলাম গ্রহণের পর মনে-প্রাণে ইসলামের শিক্ষায় নিজেকে ও নিজের পরিবারকে গড়ে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ইসলামের মহত্ব ও বাস্তব চিত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। ইসলামী দা'ওয়াতের প্রয়োজনে রাসূল (সা) সময়-অসময়ে আবূ বকরের (রা) গৃহে যেতেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) এমন শুভাগমনে উম্মু রূমানসহ বাড়ীর সকলে দারুণ খুশী হতেন। নিজেদের সাধ্যমত এই মহান অতিথির সেবা করতেন। উম্মু রূমানের (রা) ছিল একটা স্বচ্ছ মন, একটা মমতায় ভরা অন্তর যা শক্ত ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। বিপদে ধৈর্য ধরার অসীম শক্তিও তাঁর মধ্যে ছিল। মক্কার দুর্বল মুসলমানদের উপর পৌত্তলিকদের নির্মম অত্যাচার দেখে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। তিনি দেখতেন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বামী আবূ বকরকে (রা) দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে এবং নিজের অর্থে দাসদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। তাঁর মহৎ কাজে তিনি উৎসাহ দিতেন।

তিনি ঘর-গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি ছেলে 'আবদুর রহমান ও মেয়ে 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। আল্লাহ-ভীতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার উপর ছেলে-মেয়েকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন অন্তকরণ প্রথম থেকেই তাঁকে বলছিল, মেয়ে 'আয়িশা ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য এক বিশেষ ভূমিকা রাখবে। রাসূল (সা) সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা যখন তখন বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। মাঝে মাঝে তিনি উম্মু রূমানকে ঘর-গৃহস্থালীর কর্ম সম্পাদন ও সন্তানদের লালন-পালনের ব্যাপারে দিক নির্দেশনাও দিতেন।

ছোট বেলায় 'আয়িশা (রা) মাঝে মাঝে মাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। মা মেয়েকে শাস্তিও দিতেন। রাসূল (সা) এতে কষ্ট অনুভব করতেন। একবার তিনি উম্মু রূমানকে বলেন :[১০]

يا أم رومانَ استوصى بعائشة خيرا واحفظينى فيها.

'উম্মু রূমান! আপনি 'আয়িশার সাথে ভালো আচরণ করুন এবং তার ব্যাপারে আমার কথা স্মরণে রাখুন।'

একদিন রাসূল (সা) আবূ বকরের (রা) গৃহে এসে দেখেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে 'আয়িশা (রা) কাঁদছেন। তিনি উম্মু রূমানকে বলেন : আপনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। উম্মু রূমান বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মেয়ে আমার বিরুদ্ধে তার বাপের কাছে

---

৯. তাবাকাত-৮/২৭৬
১০. প্রাগুক্ত

লাগায়। রাসূল (সা) বললেন : যা কিছু করুক না কেন তাকে কষ্ট দিবেন না।[১১]

সন্তানদের প্রতি মায়া-মমতা, স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য, সর্বোপরি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা উম্মু রূমান ও তাঁর পরিবারটিকে একটি আদর্শ স্থানে পরিণত করে। স্বামীর সাথে পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন সিদ্ধান্তমূলক কাজ করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কন্যা 'আয়িশার (রা) বিয়ের পয়গামের সময় উম্মু রূমানের ভূমিকা এর উত্তম দৃষ্টান্ত।

হিজরাতের তিন বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) শোকে কাতর হয়ে পড়েন। একদিন তাঁকে বিষণ্ন দেখে 'উছমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিনৃত হাকীম (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : কাকে? খাওলা বললেন : বিধবা ও কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে, যাকে আপনার পসন্দ হয় তাঁর বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (সা) আবার জানতে চাইলেন : তারা কারা? খাওলা বললেন : বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিনৃত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রীটি আবূ বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন : ভালো। তুমি তার সম্পর্কে কথা বলো।

হযরত খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে আবূ বকরের বাড়ীতে যান এবং উম্মু রূমানকে (রা) অত্যন্ত আবেগের সুরে বলেন : উম্মু রূমান! আল্লাহ তা'আলা আপনার বাড়ীতে এত খায়র ও বরকত (কল্যাণ ও সমৃদ্ধি) দান করেছেন কিসের জন্য? উম্মু রূমান (রা) বললেন : কেন, কি হয়েছে খাওলা?

খুশীতে ঝলমল চেহারায় খাওলা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার কথা বলেছেন (বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন)।

উম্মু রূমান (রা) ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভাবলেন। আস্তে আস্তে তাঁর চেহারাটি দীপ্তিমান হয়ে উঠলো। বললেন : খাওলা! আপনি একটু বসুন, আবূ বকর এখনই এসে পড়বেন।

আবূ বকর (রা) আসলেন। উম্মু রূমান (রা) তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : মুত'ইম ইবন 'আদী তার ছেলে জুবাইরের সাথে 'আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিল এবং আমি তাঁকে কথাও দিয়েছিলাম। আমি আমার অঙ্গীকার তো ভঙ্গ করতে পারবো না।

আবূ বকর (রা) মুত'ইম ইবন 'আদীর কাছে যেয়ে বললেন : তোমার ছেলের সাথে 'আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত কি, বল। মুত'ইম তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। মুত'ইমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে স্ত্রী বললেন, এ মেয়ে আমাদের ঘরে এলে আমাদের ছেলে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। এ প্রস্তাবে আমার মত নেই। আবূ বকর (রা) মুত'ইমের দিকে ফিরে বলেন : তোমার মত কি? মুত'ইম বললেন : সে যা বলেছে, আমার মতও তাই। আবূ বকর (রা) বাড়ী ফিরে এসে খাওলাকে বলেন : আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসুন। রাসূল (সা) এলেন এবং বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হলো।[১২]

---

১১. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-৫/৫৭

১২. মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০-২১১; তাবাকাত-৮/৫৮; আয-যাহাবী : তারীখ-১/২৮০-২৮১; সিয়ারু

'আতিয়্যা (রা) এই বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'আয়িশা (রা) অন্য মেয়েদের সাথে খেলছিলেন। তাঁর সেবিকা এসে তাঁকে নিয়ে যায় এবং আবূ বকর (রা) এসে বিয়ে পড়িয়ে দেন। এ বিয়ে যে কত অনাড়ম্বর ছিল তা অনুমান করা যায় 'আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলছেন : যখন আমার বিয়ে হয়, আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। যখন মা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করতে লাগলেন তখন বুঝলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর মা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন।[১৩] মোটকথা উম্মু রূমান (রা) মেয়ে আয়িশাকে (রা) ভবিষ্যতের উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে, নবীগৃহের কর্ত্রী হিসেবে এবং তার ঘরে যাতে ওহী নাযিল হতে পারে সে রকম যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

হিজরাত

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবূ বকর (রা) রাতের অন্ধকারে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলেন। ছূর পর্বতের গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় উম্মু রূমানের ঘুম দূর হয়ে গেল। একদিকে আবূ বকর (রা) ছেলে-মেয়েদের জন্য ঘরে কোন অর্থ রেখে যাননি সে দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে প্রিয় নবী (সা) ও স্বামীর নিরাপত্তার দুর্ভাবনা। কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্থির ও অটল থেকে সকল দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপদে মদীনায় পৌঁছার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকেন।

মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিছা (রা) ও রাফি'কে (রা) মক্কায় পাঠান। আবূ বকরও (রা) তাঁদের সাথে 'আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে দুই অথবা তিনটি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত পুত্র 'আবদুল্লাহকে বলে পাঠান যে, সে যেন আসমা', 'আয়িশা ও তাঁদের মা উম্মু রূমানকে নিয়ে মদীনায় চলে আসে। এই সকল লোক যখন মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখন তালহা ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযাত্রী হন। আবূ রাফি' ও যায়িদ ইবন হারিছার (রা) সংগে উম্মু কুলছূম, ফাতিমা, উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, উম্মু আয়মান ও উসামা ইবন যায়িদ (রা) এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকরের (রা) সংগে উম্মু রূমান, আসমা' ও 'আয়িশা (রা) ছিলেন।[১৪]

এই কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা করে যখন হিজাযের বানূ কিনানার আবাসস্থল 'আল-বায়দ' পৌঁছে তখন 'আয়িশা (রা) ও তাঁর মা উম্মু রূমান (রা) যে উটের উপর ছিলেন সেটি বেয়াড়া হয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন, এই বুঝি হাওদাসহ ছিটকে পড়ছেন। মেয়েদের যেমন স্বভাব, মার নিজের জানের প্রতি

আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৪৯

১৩. তাবাকাত-৮/৫৯-৬০

১৪. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৬৯-২৭০

কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কলিজার টুকরো মেয়ে 'আয়িশার (রা) জন্য অস্থির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তিনি চেঁচিয়ে বলতে থাকেন : !واعروساه وابنتاه

'নতুন বউকে বাঁচাও, আমার মেয়েকে বাঁচাও!'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, এ সময় আমি কাউকে বলতে শুনলাম : أرسلى خطامه - উটের লাগাম ঢিলা করে দাও।' আমি লাগাম ঢিলা করে দিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় উটটি শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।[১৫] তাঁরা নিরাপদে ছিলেন এবং নিরাপদেই মদীনায় পৌঁছেন।

হযরত উম্মু রূমান (রা) ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মদীনার বানূ আল-হারিছ ইবন খাযরাজের মহল্লায় অবতরণ করেন এবং সাত-আট মাস সেখানে বসবাস করেন। উল্লেখ্য যে, 'আয়িশা (রা) মায়ের সাথেই থাকেন। মক্কা থেকে আগত অধিকাংশ মুহাজিরের জন্য মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। বহু নারী-পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবূ বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা-মেয়ের অক্লান্ত সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। স্বামী সুস্থ হওয়ার পর মেয়ে 'আয়িশা (রা) শয্যা নিলেন। তাঁর অসুস্থতা এত মারাত্মক ছিল যে, মাথার প্রায় সব চুল পড়ে যায়।[১৬] মায়ের সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর মা উম্মু রূমান (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন? বললেন : মাহর পরিশোধ করার মত অর্থ এখন আমার হাতে নেই। আবূ বকর (রা) বললেন : আমার অর্থ গ্রহণ করুন। আমি ধার দিচ্ছি। অতঃপর রাসূল (সা) মাহরের সমপরিমাণ অর্থ আবূ বকরের (রা) নিকট থেকে ধার নিয়ে 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন।

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী-পরিবারকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এই সফরে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। এই সফর থেকে ফেরার পথে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে একটা দুষ্টচক্র হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের উদ্দেশ্যে দুর্নাম রটিয়ে দেয়। প্রায় এক মাস যাবত এই মিথ্যা দোষারোপের কথা মদীনার সমাজে উড়ে বেড়াতে থাকে। স্বয়ং নবী (সা) ও আবূ বকরের (রা) পরিবার এক দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। উম্মু রূমানের (রা) কানে মেয়ের এ অপবাদের কথা পৌঁছানোর পর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান।[১৭] কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পেয়ে নিজেকে শক্ত করেন এবং সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দেন। প্রথম দিকে লোকেরা যা বলাবলি করতো তা 'আয়িশার (রা) নিকট গোপন রাখা হয়। পরে যখন তিনি জানলেন তখন এই গোপন করার জন্য মাকে বেশ বকাবকি করেন।[১৮] আয়িশা (রা) সফর থেকে মদীনায় ফিরে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই মায়ের কাছে চলে যান। তারপর এই মারাত্মক

---

১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২২১; আল-ইসতী'আব-৪/৪৩৪

১৬. সাহীহ আল-বুখারী : বাবুল হিজরাহ্; তাবাকাত-৮/৬৩

১৭. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭২

১৮. নিসা' হাওলার রাসূল-২৬৭

সঙ্কটকালের পুরো এক মাস মায়ের কাছেই থাকেন। এ সময় উম্মু রূমানকে (রা) একজন আদর্শ মা হিসেবে মেয়ের পাশে থাকতে দেখা যায়। তিনি সব সময় মেয়েকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিতেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের উপর ভরসা করার কথা বলতেন। এ সময় একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) পিতৃ-গৃহে আসলেন। আবূ বকর ও উম্মু রূমান (রা) মনে করলেন আজ হয়তো কোন সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরা উভয়ে কাছে এসে বসলেন। রাসূল (সা) 'আয়িশাকে (রা) বললেন : 'আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এসব কথা আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আশা করি আল্লাহ তা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর বাস্তবিকই যদি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। পিতাকে বললাম : আপনি রাসূলে কারীমের (সা) কথার জবাব দিন। তিনি বললেন : মেয়ে! আমি জানিনা রাসূলুল্লাহকে (সা) আমি কি বলবো। আমি মাকে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) জবাব দিন। বললেন : আল্লাহর রাসূলকে (সা) কি বলবো তা আমার জানা নেই।[১৯]

এরই মধ্যে রাসূলের (সা) উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সৃষ্টি হলো। এমনকি তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা মুবারক হতে ঘামের ফোঁটা টপটপ করে পড়তে লাগলো। এমন অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি তো পূর্ণমাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আবূ বকর ও মাতা উম্মু রূমানের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। আল্লাহ কোন মহাসত্য প্রকাশ করেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ছিলেন অস্থির, উদ্বিগ্ন। ওহীকালীন অবস্থা শেষ হলে রাসূলে কারীমকে (সা) খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাসি মুখে প্রথম যে কথাটি বলেন তা এই : 'আয়িশা, তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা আন-নূর-এর ১১ থেকে ২১ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শোনান। আমার মা আমাকে বললেন : ওঠো, রাসূলুল্লাহর (সা) শুকরিয়া আদায় কর।[২০]

আদরের মেয়ে 'আয়িশার (রা) প্রতি কলঙ্ক আরোপের ঘটনায় উম্মু রূমানের (রা) পরিবারে যে উৎকণ্ঠা ও অশান্তি ভর করে তা ওহী নাযিলের পর দূর হয়ে যায়। পূর্ব থেকেই মানুষের নিকট এই পরিবারটির যে মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল তা আরো শতগুণে বেড়ে যায়। মা হিসেবে উম্মু রূমানের (রা) খুশীর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ঘটনায় মা উম্মু রূমানের (রা) দেহ ও মনের উপর দিয়ে এক বিরাট ধকল যায়। এটি সামাল দেওয়ার পর তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে শয্যা নেন। মেয়ে 'আয়িশা (রা) সুস্থ করে তোলার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ

---

১৯. তাফসীর ইবন কাছীর, তাফসীর আল-কুরতুবী : সূরা আন-নূর, আল-আয়াত : ১১-২১; বুখারী-৬/১২৭; তাফসীর সূরা আন-নূর।

২০. মুসলিম : হাওদিছ আল-ইফক (২৭৭০); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/১৬০

হয়। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের যিল হাজ্জ মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।[২১]

উম্মু রূমান একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টিই ছিল একমাত্র কাম্য। স্বামীর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁকে ইসলামের সেবায় আরো বেশী সময় দানের সুযোগ করে দিতেন। একদিন স্বামী আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকজন মেহমান নিয়ে গৃহে আসলেন। তাঁদেরকে রাতে আহার করাতে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে জরুরী তলব এলো। তিনি উম্মু রূমানকে (রা) বলে গেলেন, আমার ফিরতে দেরী হবে, তোমরা মেহমানদেরকে খেতে দিবে। কথা মত উম্মু রূমান (রা) যথাসময়ে ছেলে 'আবদুর রহমানের দ্বারা মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করলেন; কিন্তু তাঁরা মেজবানের অনুপস্থিতিতে খেতে অস্বীকার করলেন। গভীর রাতে আবূ বকর (রা) ফিরে এসে যখন জানলেন মেহমানগণ অভুক্ত রয়েছেন। তখন তিনি উম্মু রূমান ও ছেলে 'আবদুর রহমানের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। এমনকি ছেলেকে মারতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত মেহমানদের মধ্যস্থতায় তিনি শান্ত হন। মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করা হয়। সকলে পেট ভরে খাওয়ার পর উম্মু রূমান বলেন, যে খাবার তৈরী করা হয়েছিল তার তিন গুন খাবার এখনও রয়ে গেছে। আবূ বকর (রা) সে খাবার রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে পাঠিয়ে দেন। (বুখারী১/৮৪, ৮৫)

তিনি একজন 'আবিদা (ইবাদাত-বন্দেগীকারিণী) মহিলা ছিলেন। ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি স্বামী তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। একদিন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে চোখ বাঁকা করে এদিক ওদিক দেখছেন। আবূ বকর (রা) লক্ষ্য করে এমন বকুনি দেন যে, তাঁর নামায ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হয়। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি :[২২]

إذا قام أحدكم فى الصلاة فليسكن أطرافه ولايميل ميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة.

'তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে, তার দৃষ্টি স্থির রাখবে। ইহুদীদের মত এদিক ওদিক ঝোঁকাবে না। দৃষ্টির স্থিরতা নামাযের পূর্ণতার অংশ।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিকে শাশুড়ী হওয়া, অন্যদিকে ইসলামের সেবায় অবদানের কারণে উম্মু রূমানের (রা) প্রতি দারুণ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাই মেয়ে-জামাই যখন তাঁর উপস্থিতিতে কোন কথাবার্তা বলতেন তিনি নীরবে শুনতেন। মাঝে মধ্যে মেয়ে-জামাইয়ের মিষ্টি-মধুর কলহে মধ্যস্থতাও করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই প্রথমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার (রা) আলোচনা করতেন, তাঁর নানা গুণের কথা বলতেন। এতে 'আয়িশার (রা) নারী-প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়। একদিন তিনি বলে

---

২১. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭২
২২. হায়াত আস-সাহাবা-৩/১৩৭

ফেলেন, মনে হয় খাদীজা (রা) ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন নারী নেই। আয়িশার (রা) এমন প্রতিক্রিয়ায় রাসূল (সা) বেশ মনঃক্ষুণ্ন হন। মা হিসেবে উম্মু রূমান (রা) এবার সামনে আসেন। তিনি জামাইকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আয়িশা ও আপনার কী হলো? তার বয়স অল্প, আপনার মত ব্যক্তির থেকে সে ক্ষমাই পেতে পারে।[২৩]

উম্মু রূমানের (রা) পরিবার সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দু'আ চাইতেন। একদিন আবূ বকর (রা) ও উম্মু রূমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। তিনি বললেন : আপনারা কি জন্য এসেছেন? তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সামনে আপনি 'আয়িশার মাগফিরাত কামান করে দু'আ করুন। রাসূল (সা) বললেন :

اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لايغادرها ذنب.

'হে আল্লাহ! তুমি 'আয়িশা বিন্‌ত আবী বকরের জাহিরী ও বাতিনী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও, যাতে তার আর কোন গুনাহ্ না থাকে।'

এই দু'আর পর রাসূল (সা) শ্বশুর-শাশুড়ীকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বলেন : 'যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন সেদিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমার উম্মাতের সকল মুসলমানের জন্য এই দু'আ।'[২৪]

হযরত উম্মু রূমানের (রা) মৃত্যুতে মেয়ে 'আয়িশা (রা) ও পরিবারের অন্যরা যেমন শোকাভিভূত হন, তেমনি জামাই রাসূলে কারীমও (সা) দুঃখ পান। তাঁর জীবদ্দশায় যেমন রাসূল (সা) তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, মৃত্যুর পরও তাঁর মরদেহের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) মাত্র পাঁচ ব্যক্তির কবরে নেমে তাঁদের লাশ কবরে শায়িত করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন নারী ও দুইজন পুরুষ। মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার কবরে নেমেছেন। আর মদীনায় অপর চারজনের মধ্যে উম্মু রূমান (রা) অন্যতম। বাকী' গোরস্তানে রাসূলে কারীম (সা) কবরে উম্মু রূমানের (রা) লাশ শায়িত করে এই দু'আ করেন :[২৫]

اللهم إنَّه لم يخفَ عليك مالقيت أم رومان فيك وفي رسولك.

'হে আল্লাহ! উম্মু রূমান তোমার এবং তোমার রাসূলের সন্তুষ্টির পথে যা কিছু সহ্য করেছে তা তোমার কাছে গোপন নেই।'

তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে আরো বলেন :[২৬]

---

২৩. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-৩/৪০১

২৪. তুহফাতুস সিদ্দীক ফী ফাদায়িলি আবী বকর আস-সিদ্দীক-৯৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫৮

২৫. আল-ইসতী'আব-৪/৪৩১; আল-ইসাবা-৪/৪৩৩; ওয়াফা আল-ওয়াফা-৩/৮৯৭

২৬. তাবাকাত-৮/২৭৭; কান্‌য আল-'উম্মাল-১২/১৪৬; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪২০; আর-রাওদ আল-আন্‌ফ-৪/২১

من سرّه أن ينظر إلى إمرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان.

'তোমাদের কেউ যদি (জান্নাতের) আয়তলোচনা হূর দেখে খুশী হতে চায় সে উম্মু রূমানকে দেখতে পারে।'

যেহেতু الحـور العـين জান্নাতেই হবে, তাই রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীতে বুঝা যায় উম্মু রূমান (রা) নিশ্চিত জান্নাতী হবেন। এ বাণীতে সেই সুসংবাদই দেওয়া হয়েছে।

হযরত উম্মু রূমানের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ) হাদীছটি সংকলন করেছেন।

উম্মু 'আতিয়্যা বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

উম্মু 'আতিয়্যা (রা) একজন আনসারী মহিলা। পিতার নাম আল-হারিছ।[১] তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের মহিলা সাহাবী। উম্মু 'আতিয়্যা তাঁর ডাকনাম। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম নুসাইবা বিন্‌ত আল-হারিছ।[২] উল্লেখ্য যে, একই সাথে নুসাইবা নাম ও উম্মু 'আতিয়্যা ডাকনামের দ্বিতীয় কোন মহিলা সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে রাসূল (সা) মদীনায় আসার পর পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং বাই'আত করেন। উম্মু 'আতিয়্যা সেই বাই'আতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আসলেন তখন আনসার মহিলাদের একটি গৃহে একত্র করলেন। তারপর সেখানে 'উমার ইবন আল খাত্তাবকে (রা) পাঠালেন। তিনি এসে দরজার অপর পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন, মহিলারাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের নিকট এসেছি। আমরা বললাম : রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর প্রতিনিধিকে স্বাগতম। তিনি বললেন : আপনারা একথার উপর বাই'আত করুন যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেন না, চুরি করবেন না, ব্যভিচার করবেন না, আপনাদের সন্তানদের হত্যা করবেন না, কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করবেন না এবং কোন ভালো কাজে অবাধ্য হবেন না।

আমরা বললাম : হ্যাঁ, আমরা মেনে নিলাম। তারপর 'উমার (রা) দরজার বাহির থেকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন এবং ঘরের ভিতরে মহিলারাও নিজ নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন। (মূলতঃ এ হাত বাড়ানো ছিল বাই'আতের প্রতীকস্বরূপ। কোন মহিলা 'উমারের রা. হাত স্পর্শ করেননি।) তারপর 'উমার (রা) বলেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! উম্মু 'আতিয়্যা (রা) আরো বলেন : আমাদের ঋতুবতী মহিলা ও কিশোরীদের দুই 'ঈদের সময় 'ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, লাশের পিছে পিছে যেতে বারণ করা হয় এবং আমাদের জুম'আ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এদিন উম্মু 'আতিয়্যা "দোষারোপ" ও 'ভালো কাজে অবাধ্য হওয়া" কথা দুইটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন।[৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মহিলাদের জিহাদে গমনের অনুমতি দান করেছিলেন। বাস্তবে মুহাজির আনসারদের বহু মহিলা, এমনকি রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের কেউ কেউ জিহাদে যোগদান করেছেন। যেমন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) উহুদ ও বানু আল-

---

১. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৪; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৫৫; উসুদুল গাবা-৫/৬০৩
২. আল-কামূস আল-মুহীত, মাদ্দা "نسب"
৩. হায়াত আস-সাহাবা-১/২৫১-২৫২

Contents

মুসতালিক যুদ্ধে এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) খায়বার অভিযান ও মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে মহিলারা সাধারণতঃ সেবামূলক কর্মে, যেমন আহতদের সেবা, ঔষধ খাওয়ানো, খাদ্য প্রস্তুত করা, পানি পান করানো ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকতেন। উম্মু 'আতিয়্যাও রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে যুদ্ধে গেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন :

غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام وأدارى الجرحى وأقوم على المرضى.[৪]

'আমি নবীর (সা) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁদের পিছনে তাঁবুতে থেকে তাদের জন্য খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ঔষধ পান করাতাম এবং রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।' খায়বার যুদ্ধে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) বিশজন মহিলার একটি দলের সাথে জিহাদের ছোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন।

নবী পরিবারের সাথে হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। মাঝে মধ্যে হযরত 'আয়িশাকে (রা) হাদিয়া-তোহফা দিতেন। একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কাছে আহার করার মত কোন কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন : নেই। তবে উম্মু 'আতিয়্যা নুসাইবাকে সাদাকার ছাগলের কিছু গোশত পাঠানো হয়েছিল, তিনি আবার তা থেকে কিছু পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন : তা তার জায়গা মত পৌঁছে গেছে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কন্যাদের সাথেও হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) সম্পর্ক ছিল। তার প্রমাণ এই যে, হিজরী অষ্টম সনের প্রথম দিকে হযরত যায়নাবের (রা) ইনতিকাল হলে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাঁকে গোসল দেন। তিনি সে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إغسلْنَها وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، واجعلن فى الآخرة كافورًا أو شيئا من كافور، فإذا غَسَلْتُنَّهَا فأعلمننى. فلما غسلناها أعطانا حقوه ـ إزاره ـ فقال : أشعرنها إياه.[৬]

'যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) মারা গেলে রাসূল (সা) বললেন : তোমরা তাকে

৪. আত-তাজ আল-জামি' লিল উসূল-৪/৩৪৪; তাবাকাত-৮/৪৫৫; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫; আল-মাগাযী-২/৬৮৫; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪২

৫. আল-ইসাবা-৪/৪৫৫

৬. মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক : আল-জানায়িয; তাবাকাত-৮/৩৪, ৩৫; উসুদুল গাবা-৫/৬০৩; আয-যাহাবী : তারীক-২/৫২০

বেজোড়ভাবে তিন অথবা পাঁচবার করে গোসল দিবে। শেষবার কর্পূর বা কর্পূর জাতীয় কিছু দিবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা তার গোসল শেষ করলে রাসূল (সা) নিজের একটি লুঙ্গি আমাদের দিয়ে বলেন : এটি তার গায়ে পেঁচিয়ে দেবে।'

রাসূলুল্লাহর (সা) আরেক কন্যা উম্মু কুলছূম (রা) ইনতিকাল করলে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাঁকেও গোসল দেন।[৭] এমনিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মদীনার বহু মৃত মহিলার গোসল দানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

খিলাফতে রাশিদার সময় হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) এক ছেলে কোন এক যুদ্ধে যান এবং মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তাকে বসরায় আনা হয়। এ খবর পেয়ে মা উম্মু 'আতিয়্যা (রা) খুব দ্রুত সেখানে ছুটে যান। কিন্তু তাঁর পৌঁছার একদিন পূর্বে ছেলের ইনতিকাল হয়। বসরায় বানূ খালাফ-এর প্রাসাদে ওঠেন এবং সেখান থেকে আর কোথাও যাননি। ছেলের মৃত্যুর তৃতীয় দিন সুগন্ধি আনিয়ে গায়ে মাখেন এবং বলেন :

لاتحد المرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.[৮]

'একজন নারীর তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা উচিত নয়। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।'

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সবসময় মৃত্যু ব্যক্তির জন্য আহাজারি ও মাতম করা থেকে দূরে থাকতেন। বাই'আতের সময় যখন মাতম করতে নিষেধ করা হয় তখন তিনি বলেন, অমুক খান্দানের লোক আমার নিকট এসে কান্নাকাটি করে গেছে, আমাকেও তার বদলা হিসেবে তাদের কোন মৃতের জন্য কেঁদে আসা উচিত। তাঁর এমন কথায় রাসূল (সা) নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে সেই খান্দানটি ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন।[৯]

যে সকল আনসারী মহিলা তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আন-নাওবী (রহ) উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) চল্লিশটি হাদীছ উম্মু 'আতিয়্যার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া একটি করে হাদীছ উভয়ের গ্রন্থে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০] সুনানে আরবা'আতেও তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)সহ বহু বিশিষ্ট তাবি'ঈ তাঁর থেকে

---

৭. আত-তাবারী : তারীখ-২/১৯২; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং-১৪৫৮; তাবাকাত-৮/৩৮; আল-ইসাবা-৪/৪৬৬
৮. সাহীহান : আত-তালাক; তাফসীর আল-খাযিন-১/২৩৯
৯. সাহীহ মুসলিম-১/৪০১; মুসনাদ-৬/৪০৭
১০. তাহযী আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৪

সেই হাদীছগুলো শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। যেমন : হাফসা বিন্‌ত সীরীন (মৃ. ১০১ হি.), তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর, 'আলী ইবন আল-আকমার, উম্মু শুরাহী (রহ) ও অন্যরা।[১১]

ইমাম আয-যাহাবী উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) ফকীহ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিম্নের এ বর্ণনাটির প্রতি লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন :

نُهينا عن إتباع الجنازة ولم يُعْزَمْ علينا.

'আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কঠোরভাবে করা হয়নি।' তিনি বলতে চেয়েছেন, মহিলাদেরকে শবাধারের পিছে পিছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার মত তেমন কঠোর নয়। সুতরাং তা হারামের পর্যায়ে নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ের।[১২]

ইবন 'আবদিল বার (রহ) উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) বসরার অধিবাসী গণ্য করেছেন। বিখ্যাত মহিলা তাবি'ঈ হাফসা বিন্‌ত সীরীন (রহ)ও এমন কথা বলেছেন।[১৩] বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি মদীনা ত্যাগের পর আর সেখানে ফিরে আসেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বসরায় থেকে যান। বসরাবাসী সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবি'ঈন ও সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। আহ্‌লি বায়ত তথা নবী-পরিবারের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক আজীবন বহাল থাকে। হযরত আলী (রা) তাঁর গৃহে আহার করে বিশ্রাম নিতেন।[১৪]

বসরায় তিনি একজন ফকীহ মহিলা সাহাবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর হাদীছের সমঝ-বুঝ, শরী'আতের বিধান সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্যের কথা জানাজানি হওয়ার পর সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই কন্যাকে গোসল দিয়েছিলেন এবং সে কথা বর্ণনা করতেন তাই বসরায় বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরাম এবং মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের (রহ) মত উঁচু স্তরের ফকীহ তাবি'ঈ তাঁর নিকট এসে মৃতের গোসল দানের নিয়ম-পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতেন।[১৫]

ধারণা করা হয় তিনি হিজরী ৭০ (সত্তর) সনের শেষ দিকে বসরায় ইনতিকাল করেন।[১৬]

---

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৮; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৫৫
১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১২১, টীকা-১
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. তাবাকাত-৮/৪৫৬; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫
১৫. আল-ইসতী'আব-৪/৪৫২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/৩১৮

যায়নাব বিন্‌ত আবী মু'আবিয়া (রা)

সেকালে আরবে যায়নাব নামটি বেশ প্রচলিত ছিল। সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এ নামের অনেক মহিলাকে পাওয়া যায়। বিশ্বাস ও কর্ম গুণে যে সকল যায়নাব ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন, আমাদের যায়নাবও তাঁদের একজন। তিনি বিখ্যাত ছাকীফ গোত্রের কন্যা। পিতা 'আবদুল্লাহ আবূ মু'আবিয়া ইবন 'উত্তাব। স্বামী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)।[১]

তিনি একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। নিজ হাতে তৈরী জিনিস বিক্রী করে নিজের ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি অন্যদের সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্য মহিলাদের সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'আত করেন। খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[২]

যে সকল মহিলা সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ করে বর্ণনা করেছেন যায়নাব (রা) তাঁদের অন্যতম। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা মোট আটটি। তিনি সরাসরি রাসূল (সা) থেকে এবং স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ও 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩] আর তাঁর সূত্রে এ সকল হাদীছ বর্ণনা করেছেন :

আবূ 'উবায়দা, 'উমার ইবন আল-হারিছ, বিসর ইবন সা'ঈদ, 'উবায়দ ইবন সাব্বাক, তাঁর এক ভাতিজা যার নাম জানা যায় না ও আরো অনেকে।[৪]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মহিলাদেরকে ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় কোন রকম সুগন্ধি ব্যবহার করতে যে বারণ করেছেন তা হযরত যায়নাব (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁকে বলেন : যখন তুমি 'ইশার নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবে তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।[৫]

হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কথা ও কাজ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতেন। বিন্দুমাত্র হেরফের হওয়া কল্পনাও করতে পারতেন না। নিজের পরিবারের লোকদেরকেও তেমনভাবে গড়ে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। স্ত্রী হিসেবে হযরত যায়নাব (রা) তাঁর নিকট থেকে ইসলামী বিধি-বিধান, জীবন-যাপন প্রণালীর বহু কিছু শিক্ষা লাভ করেন।

---

১. তাবাকাত-৮/২৯০; আল-ইসতী'আব-৪/৩১০; উসুদুল গাবা-৫/৪৭০; তাহযীব আত-তাহযী-১২/৪২২
২. মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ-৬/১০
৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭২
৪. আল-ইসাবা-৪/৩১৩
৫. তাবাকাত-৮/২৯০; আল-ইসতী'আব-৪/৩১০; আল-ইসাবা-৪/৩১৩

ইমাম আহমাদ (রহ) হযরত যায়নাবের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন : 'আবদুল্লাহ (স্বামী) যখন বাইরের কাজ সেরে ঘরে ফিরতেন তখন দরজায় এসে থেমে গলা খাকারি ও কাশি দিতেন, যাতে আমাদের এমন অবস্থায় দেখতে না পান যা তাঁর পছন্দ নয়। একদিন তিনি ফিরে এসে গলাখাকারি দিলেন। তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধা বসে 'হুমরা (حمرة) রোগ থেকে নিরাময়ের উদ্দেশ্যে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করছিল। তাড়াতাড়ি আমি তাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। তিনি ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসার পর দেখলেন আমার গলায় সুতা ঝুলছে। প্রশ্ন করলেন : এটা কি?

বললাম : এটা আমার জন্য মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়েছে। তিনি সেটা ধরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর বলেন : 'আবদুল্লাহর পরিবার-পরিজন শিরকের প্রতি মুখাপেক্ষীহীন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবজ ও জাদু-টোনা হলো শিরক।

আমি তাঁকে বললাম : আপনি এমন কথা বলছেন কেন? এক সময় আমার চোখ থেকে ময়লা বের হতো এবং অমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। সে আমার চোখে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিলে ভালো হয়ে যায়।

তিনি বললেন : এটা শয়তানের কাজ। সে তোমার চোখে হাত দিয়ে খোঁচাতো। সে মন্ত্র পড়ে যখন ফুঁক দিত, শয়তান খোঁচানো বন্ধ করে দিত। তোমার জন্য একথা বলাই যথেষ্ট যা নবী (সা) বলেছেন :

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَاشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقْمًا.

'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ বিপদ দূর করে দিন। আপনি নিরাময় দানকারী, আমাকে নিরাময় দিন। আপনার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় দিন যেন আর কোন রোগ না থাকে।'[৬]

ইসলামী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, স্ত্রীর যদি যাকাত ওয়াজিব হয় এমন পরিমাণ অর্থ থাকে, আর স্বামী যাকাত লাভের যোগ্য হয়, তাহলে স্বামীকে যাকাত দেওয়া উচিত। কারণ, পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, স্বামীর। সুতরাং অন্যকে যাকাতের অর্থ দেওয়ার চেয়ে স্বামীকে দিলে স্ত্রী অধিক ছোয়াবের অধিকারী হবে।

এ রকম ঘটনা হযরত যায়নাবের (রা) ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। একদিন তিনি রাসূলকে (সা) মহিলাদের সাদাকা করতে ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উৎসাহ দিয়ে বক্তৃতা করতে শুনলেন। ঘরে ফিরে দান করার উদ্দেশ্যে নিজের সকল গহনা একত্র করলেন। স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন : এই গহনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

---

৬. বুখারী : আত-তিব্ব, বাবু রাকয়াতুন নাবিয়্যি; মুসলিম : বাবু রাকয়াতিল মারীদ; আবূ দাউদ (৩৮৮৩); ইবন মাজাহ (৩৫৩০); তাফসীর ইবন কাছীর-৪/৪৯৪

বললেন : এগুলো দ্বারা আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে চাই।

বললেন : দাও, আমাকে ও আমার ছেলে-মেয়েদেরকে দাও, আমি এগুলো লাভের যোগ্য।[৭]

এরপরের ঘটনা ইমাম বুখারী হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

ইবন মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব বলেন : হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ সাদাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কিছু গহনা আছে এবং তা সাদাকা করতে চাই। কিন্তু ইবন মাস'উদ (স্বামী) মনে করে, অন্যদের চেয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে তা লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন : ইবন মাস'উদ ঠিক বলেছে। তোমার সাদাকা লাভের ক্ষেত্রে তোমার স্বামী ও ছেলে অন্যদের থেকে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ঘটনাটি 'আমর ইবন আল-হারীছ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

যায়নাব, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) স্ত্রী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

تصدقن يامعشر النساء ولومن حليكنَّ.

'হে নারী সমাজ! তোমরা সাদাকা কর– তা তোমাদের গহনাই হোক না কেন।'

যায়নাব বলেন : একথা শুনে আমি 'আবদুল্লাহর নিকট ফিরে এলাম। তাঁকে বললাম, আপনি একজন স্বল্প বিত্তের মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তাঁর নিকট যান ও জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে সাদাকা করা জায়েয হবে কিনা। জায়েয না হলে আমি অন্যদের দিব।

'আবদুল্লাহ বললেন : তুমিই বরং যাও।

আমি গেলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় আরেকজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, এই মহিলার নামও যায়নাব এবং তিনি আবূ মাস'উদ আল-আনসারীর স্ত্রী। তার ও আমার উদ্দেশ্য একই। বিলাল (রা) ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং তাঁকে বলুন, দরজায় দাঁড়ানো দুইজন মহিলা জানতে চাচ্ছে যে, স্বামী এবং তার ছোট ছেলে-মেয়েদের সাদাকা করা জায়েয হবে কিনা। আমরা কে তা তাঁকে বলবেন না।

বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন : তারা কে? বিলাল (রা) বললেন : একজন আনসারী মহিলা ও যায়নাব।

রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন : কোন যায়নাব? বিলাল বললেন : 'আবদুল্লাহ ইবন

৭. হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আসফিয়া-২/৬৯

মাস'উদের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তারা দুইটি ছোয়াব পাবে : আত্মীয়তার এবং সাদাকার।[৮]

হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হিজরী ৩২ সনে ইনতিকাল করেন। অন্তিম অবস্থায় তিনি স্ত্রী ও কন্যাদের দেখাশুনা ও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু ক্ষমতা দিয়ে যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষে একটি অসীয়াত করে যান।[৯] হযরত যায়নাব (রা) কখন কোথায় ইনতিকাল করেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন জীবিত ছিলেন এবং খিলাফতে রাশিদার শেষের দিকে ইনতিকাল করেন।[১০]

---

৮. বুখারী : আয-যাকাত, বাবুয যাকাত 'আলাল আকারিব; মুসলিম : আয-যাকাত, বাবু ফাদল আন-নাফাকাতি 'আলাল আকরাবীন ওয়া আয-যাওযি ওয়া আল-আওলাদ; উসুদুল গাবা-৫/৪৭০, ৪৭১; আল-ইসাবা-৪/৩১৩

৯. তাবাকাত-৩/১৫৯

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭৬

আর-রুবায়্যি'উ বিন্ত মু'আওবিয (রা)

মদীনার 'আদী ইবন আন-নাজ্জার খান্দানের মেয়ে আর-রুবায়্যি'উ। যে সকল আনসার পরিবার ইসলামের সেবায় মহান ভূমিকা পালন করেছে তাঁর পরিবারটি এর অন্তর্গত। প্রথম পর্বে আল্লাহর রাসূল (সা), ইসলাম ও মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের সেবায় এই পরিবারটির রয়েছে গৌরবময় অবদান। তাঁর মহান পিতা মু'আওবিয ইবন আল-হারিছ আল-আনসারী (রা)। তাঁরা মোট সাত ভাই : 'আওফ, মু'আয, মু'আওবিয, ইয়াস, 'আকিল, খালিদ, ও 'আমির। তাঁদের মা 'আফরা' বিন্ত 'উবাইদ আল-আনসারিয়্যা আন-নাজ্জারিয়্যা (রা)। তাঁর প্রথম তিন সন্তানের পিতা আল-হারিছ ইবন রিফ'আ আন-নাজ্জারী। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পিতার নামের চেয়ে মা 'আফরার (রা) নামের সাথে অধিক পরিচিত। ইতিহাসে তাঁরা أبناء عفراء ('আফরার ছেলেরা) নামে প্রসিদ্ধ। বাকী চারজনের পিতা আল-বুকাইর ইবন 'আবদি ইয়ালীল আল-লায়ছী। 'আফরার (রা) এই সাত ছেলের সকলে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। মদীনার যে ছয় ব্যক্তি মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে গোপনে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন রুবায়্যি'উ-এর চাচা 'আওফ তাঁদের একজন। তিনি একজন 'আকাবীও অর্থাৎ 'আকাবার দুইটি বাই'আতের অংশীদার। তাঁর পিতা মু'আওবিয ও অপর চাচা মু'আয (রা) 'আকাবার প্রথম বাই'আতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর দাদী 'আফরা' বিন্ত 'উবাইদ মদীনায় ইসলামের বাণী পৌঁছার সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর অন্য আনসারী মহিলাদের সাথে তিনিও বাই'আত করেন। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাতলে শামিল হয়ে তাঁর সাতটি ছেলে অংশগ্রহণ করেন এবং দু'জন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মত সৌভাগ্যের অধিকারী মুসলিম নারী জাতির মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ আছেন কি?

আর-রুবায়্যি'উ-এর মা উম্মু ইয়াযীদ বিন্ত কায়সও মদীনার 'আদী ইবন আন-নাজ্জার গোত্রের মেয়ে।

আবূ জাহল যে কিনা এই উম্মাতের ফির'আউন অভিধায় ভূষিত, বদরে তাকে 'আফরা'র দুই ছেলে হত্যা করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নেক দু'আর অধিকারী হন। তিনি দু'আ করেন :[১]

رحم الله ابنَيْ عفراء اشتركا فى قتل فرعون هذه الأمة.

'আল্লাহ 'আফরা'র দুই ছেলের প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন যারা এই উম্মাতের ফির'আউন আবূ জাহলকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেছে।'

---

১. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৯৯; আহমাদ যীনী দাহলান, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-১/৩৮৯

আর-রুবায়্যি'উ-এর মা উম্মু ইয়াযীদ বিন্ত কায়স মদীনার আন-নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। তাঁর বোন ফুরাই'আ বিন্ত মু'আওবিয। তিনিও একজন উঁচু স্তরের সাহাবিয়া ছিলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর দু'আ অতিমাত্রায় কবুল হওয়ার কারণে مُجابة الدعوة (মুজাবাতুদ দা'ওয়াহ্) বলা হতো।[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর-রুবায়্যি'উ-এর বাবা-চাচারা বদর যুদ্ধের বীর যোদ্ধা ছিলেন। সে দিন তাঁরা জীবন দিয়ে পরবর্তীকালের ইসলামের বিজয়ধারার সূচনা করেন। এদিন কুরায়শ পক্ষের বীর সৈনিক আবুল ওয়ালীদ-'উতবা ইবন রাবী'আ, তার ভাই শায়বা ও ছেলে আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবাকে সংগে নিয়ে পৌত্তলিক বাহিনী থেকে বেরিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে এসে তাদেরকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। সাথে সাথে 'আফরার তিন ছেলে মু'আওবিয, মু'আয ও 'আওফ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় তাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা প্রশ্ন করে : তোমরা কারা? তাঁরা বলেন : আমরা আনসারদের দলভুক্ত। তারা বললো : তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাই না। রাসূল (সা) তাদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরই স্বগোত্রীয় হামযা, 'আলী ও 'উবাইদাকে (রা) সামনে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। তাঁরা এগিয়ে গেলেন এবং একযোগে আক্রমণ করে এই তিন শয়তানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

আর-রুবায়্যি'উ-এর পরিবারের লোকেরা জানতো এই উম্মাতের ফির'আউন আবূ জাহল ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। সে এমন ইতর প্রকৃতির যে আল্লাহর রাসূলকে (সা) কষ্ট দেয়, তাঁকে গালি দেয়। দুর্বল মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে হত্যা করে। তাই আর-রুবায়্যি'উ-এর বাবা মু'আওবিয ও চাচা মু'আয (রা) বাগে পেলে এই নরাধমকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন হয় তাকে হত্যা করবেন, নয়তো নিজেরা শহীদ হবেন। তাঁদের আরাধ্য সুযোগটি এসে গেল। তাঁরা সাত ভাই বদর যুদ্ধে গেলেন। এর পরের ঘটনা বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) চমৎকার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩]

إني لفي الصف يوم بدر، التفتُّ فإذا عن يميني وعن يسارى فَتَيَان حديثا السن، فكأني لم آمن مكانهما، إذ قال لى أحدهم سرًّا عن صاحبه : ياعم أرني أبا جهل؛ فقلت : يابن أخي ماتصنع به؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن اقتله أو أموت دونه. قال لى الآخر سرا من صاحبه مثله. قال عبد الرحمن بن عوف : فما سرَّني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدًّا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء.

---

২. আল-ইসতী'আব-৪/৩৭৫

৩. সাহীহ আল-বুখারী : ফী ফারদিল খুমুস (৩১৪১), ফী আল-মাগাযী (৩৯৬৪, ৩৯৮৮) : মুসলিম : ফী আল-জিহাদ (১৭৫২); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৫০; বানাত আস-সাহাবা-৬৬

'বদরের দিন আমি সারিতে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি আমার দুই পাশে অল্প বয়সী দুই তরুণ। তাদের অবস্থানকে আমার নিজের জন্য যেন নিরাপদ মনে করলাম না। এমন সময় তাদের একজন অন্য সঙ্গী যেন শুনতে না পায় এমনভাবে ফিস ফিস করে আমাকে বললো : চাচা! আমাকে একটু আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিন। বললাম : ভাতিজা! তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? বললো : আমি আল্লাহর সংগে অঙ্গীকার করেছি, যদি আমি তাকে দেখি, হয় তাকে হত্যা করবো, নয়তো নিজে নিহত হবো। অন্যজনও একইভাবে একই কথা আমাকে বললো।

'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ বলেন : তখন তাদের দুইজনের মাঝখানে আমি অবস্থান করতে পেরে কী যে খুশী অনুভব করতে লাগলাম! আমি হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। সাথে সাথে দুইটি বাজ পাখীর মত তারা আবূ জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলো। তারা ছিল 'আফরার দুই ছেলে।'

আবূ জাহলকে হত্যার পর তাঁরা বীর বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বদরেই আর-রুবায়্যি'উ-এর মহান পিতা মু'আওবিয (রা) শাহাদাত বরণ করেন।[৪] আবূ জাহলকে হত্যার ব্যাপারে রাসূলকে (সা) প্রশ্ন করা হয়েছিল : তাকে হত্যার ক্ষেত্রে তাদের দুইজনের সংগে আর কে ছিল? বললেন : ফেরেশতাগণ এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ শেষ আঘাত হানে। আবূ জাহলের হত্যার পর রাসূল (সা) বললেন : আবূ জাহলের অবস্থা কি তা কেউ দেখে আসতে পারবে কি? ইবন মাস'উদ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যাচ্ছি। তিনি গিয়ে দেখেন 'আফরার দুই ছেলে তাকে এমন আঘাত হেনেছে যে সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে আর-রুবায়্যি'উ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি একজন কিশোরী। রাসূল (সা) মক্কা থেকে কূবায় এসে উঠলেন। সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর মদীনার কেন্দ্রস্থলের দিকে যাত্রা করেন এবং মসজিদে নববীর পাশে হযরত আবূ আইউব আল-আনসারীর (রা) গৃহে ওঠেন। তাঁর এই শুভাগমনে গোটা মদীনা আনন্দে ফেটে পড়ে। তাঁর গমন পথের দুই ধারে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা দাঁড়িয়ে নেচে-গেয়ে তাঁকে স্বাগতম জানায়। তাদের স্বাগত সঙ্গীতের একটি চরণ ছিল এরকম :

نحن جوار من بنى النجار ياحبذا محمد من جار.

'আমরা বানূ আন-নাজ্জারের কিশোর-কিশোরী। কি মজা! মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিবেশী।' রাসূল (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কি আমাকে ভালোবাস? তারা বললো : হাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ জানেন, আমার অন্তর তোমাদের ভালোবাসে।

---

৪. আল-ইসতিবসার-৬৬
৫. 'উয়ূন আল-আছার-১/৩১৫; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-২/৪৩৩

অনেকে বলেছেন, এই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আর-রুবায়্যি'উও ছিলেন।[৬] বয়স বাড়ার সাথে রাসূলে কারীম (সা) ও ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি নানাভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। বিভিন্ন দৃশ্যপটে তাঁকে উপস্থিত দেখা যায়। ইসলামের সেবায় অতুলনীয় ত্যাগের জন্য রাসূল (সা) এই পরিবারের সদস্যদের বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। সব সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর রাখতেন। রাসূল (সা) তাজা খেজুরের সাথে কচি শশা খেতে পছন্দ করতেন। আর-রুবায়্যি'উ বলেন : আমার পিতা মু'আওবিয ইবন 'আফরা (রা) একটি পাত্রে এক সা' তাজা খেজুর ও তার উপর কিছু কচি শশা দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। তিনি শশা পছন্দ করতেন। সেই সময় বাহরাইন থেকে রাসূলের (সা) নিকট কিছু গহনা এসেছিল। তিনি তার থেকে এক মুট গহনা নিয়ে আমাকে দেন। অপর একটি বর্ণনায় স্বর্ণের কথা এসেছে। তারপর বলেন : এ দিয়ে সাজবে। অথবা বলেন : এ দিয়ে গহনা বানিয়ে পরবে।[৭]

বিয়ের বয়স হলে বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী ইয়াস ইবন আল-বুকাইর আল-লায়ছীর সাথে বিয়ে হয় এবং তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে ছেলে মুহাম্মাদ ইবন ইয়াস। তাঁর এই বিয়ের বিশেষ মহত্ব ও মর্যাদা এই যে, বিয়ের দিন সকালে রাসূল (সা) তাঁদের বাড়ীতে যান এবং তাঁর বিছানায় বসেন। পরবর্তী জীবনে আর-রুবায়্যি'উ (রা) অত্যন্ত গর্বের সাথে সেকথা বলেছেন এভাবে :[৮]

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليَّ غداة بُنِيَ بي، فجلس على فراشي، وجويريات لنايضربن بالدوفوف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم مافي غدٍ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعي هذا وقولي التي كنت تقولين قبلها. وفي رواية : لاتقولي هذا وقلت ماتقولين.

'আমার বিয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং বিছানায় বসেন। আমাদের ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-চাচাদের প্রশংসামূলক গীত সুর করে গাচ্ছিল। এর মধ্যে একজন গাইলো : আমাদের নবী আছেন যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন : এটা বাদ দাও। আগে তোমরা যা বলছিলে তাই বল। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে :

---

৬. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৫০, ১৫১

৭. বুখারী, ফী আল-আত'ইমা-৯/৪৯৫; মুসলিম ফী আল-আশরিবা (২০৪৩); তিরমিযী (১৮৪৫) ও ইবন মাজাহ (৩৩২৫) ফী আল-আত'ইমা; মাজমা'উয যাওয়ায়িদ লিল হায়ছামী-৯/১৩

৮. বুখারী ফী আন-নিকাহ (৫১৪৭); ফী আল-মাগাযী (৪০০১); তিরমিযী-১০৯০; তাবাকাত-৮/৩২৮; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৬০৯

একথা বলো না। বরং আগে যা বলছিলে তাই বল। মূলতঃ তাঁর প্রতি যে ভবিষ্যতের জ্ঞান আরোপ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত রাখার জন্য একথা বলেন।

ইমাম আয-যাহাবী এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :[৯]

وقد زارها النبى صلى الله عليه وسلم صبيحة عُرسها صلة لرحمها.

'নবী (সা) তাঁর বিয়ের দিন সকালে তার সাথে আত্মীয়তার সূত্রে তাঁকে দেখতে যান।'

আর-রুবায়্যি'উ-এর বিয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি তথা তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল। কারণ, ইসলামের জন্য এ পরিবারটির যে ত্যাগ ও কুরবানী ছিল তা রাসূল (সা) উপেক্ষা করতে পারেননি। ইসলামের জন্য এ পরিবার তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং জীবনও দিয়েছে। সুতরাং পিতৃহারা এই মেয়েটি যার পিতা আবূ জাহলের ঘাতক এবং যিনি বদরে শাহাদাত বরণ করেছেন, তার আনন্দের দিনে রাসূল (সা) কিভাবে দূরে থাকতে পারেন?

যুদ্ধের ময়দানে

আর-রুবায়্যি'উ-এর পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জিহাদের সূচনা করেন, তাঁর মেয়ে হিসেবে তিনি সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। পিতার রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। তাই তাঁর মধ্যে ছিল জিহাদে গমনের অদম্য স্পৃহা। জিহাদের সীমাহীন গুরুত্ব তিনি পূর্ণরূপে অনুধাবন করেন। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে বেশ কিছু জিহাদে যোগ দেন। ইবন কাছীর (রহ) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে জিহাদে যেতেন। আহতদের ঔষুধ সেবন এবং ক্ষত-বিক্ষতদের পানি পান করাতেন। তিনি নিজেই বলেছেন :[১০]

كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم المجاهدين ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.

'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে জিহাদে যেতাম। মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত-নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দা মাসে হুদায়বিয়াতে মক্কার পৌত্তলিকদের সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চৌদ্দ শো মুজাহিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জীবন বাজি রাখার যে বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়, তিনিও সে বাই'আত করেন। এ বাই'আতকে বাই'আতে রিদওয়ান ও বাই'আতে শাজারা বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ বাই'আতের গুরুত্ব

---

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/১৯৮

১০. সিফাতুস সাফওয়া-২/৭১; আত-তাজ আল-জামি' লিল উসূল-৪/৩৪৪

অপরিসীম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা) যে এ বাই'আতকে খুবই পছন্দ করেছেন তা কুরআন ও হাদীছের বাণীতে স্পষ্ট জানা যায়। যেমন : আল্লাহ বলেন:[১১]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ـ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِه، وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا.

'যারা তোমার হাতে বাই'আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন।'

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'আত করাকে আল্লাহর হাতে হাত রেখে বাই'আত করা বলা হয়েছে। এতে এ বাই'আতের বিরাট গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এ বাই'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন :[১২]

لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة.

'বৃক্ষের নীচে বাই'আতকারীদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'

সেদিন বাই'আতকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) বলেন :[১৩]

أنتم اليوم خير أهل الأرض.

'আজ তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ।'

স্পষ্টভাষিণী

আবূ জাহলের ঘাতক তাঁর মহান পিতাকে নিয়ে আর-রুবায়্যি'উর (রা) গর্বের অন্ত ছিল না। আবূ জাহলের মা আসমা' বিন্‌ত মাখরামার সাথে তাঁর একটি ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। আর-রুবায়্যি'উ (রা) বলেন :

আমি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে একদিন কয়েকজন আনসারী মহিলার সাথে আবূ জাহলের মা আসমা' বিন্‌ত মাখরামার নিকট গেলাম। আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ (আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই) ছিল তাঁর আরেক ছেলে। তিনি ইয়ামন থেকে মদীনায় তাঁর মা আসমার নিকট আতর পাঠাতেন, আর তিনি তা বিক্রী করতেন। আমরাও তাঁর নিকট থেকে আতর কিনতাম। সেদিন আমার শিশিতে আতর ভরে ওযন দিলেন, যেমন আমার সাথীদের আতর ওযন দিয়েছিলেন। তারপর বললেন :

---

১১. সূরা আল-ফাতহ-১০
১২. মুসলিম (২৪৯৬); তাবাকাত-২/১০০, ১০১
১৩. বুখারী : বাবু গাযওয়াতিল ফাতহ

আপনাদের কার নিকট কত পাওনা থাকলো তা লিখিয়ে দিন। আমি বললাম : আর-রুবায়্যি'উ বিন্‌ত মু'আওবিযের পাওনা লিখুন।

আসমা' আমার নাম শুনেই বলে উঠলেন : حَلْقَى – হালকা। শব্দটি অভিশাপমূলক। অর্থাৎ গলায় যন্ত্রণা হয়ে তোমার মরণ হোক। তারপর বললেন : তুমি কি কুরায়শ নেতার হত্যাকারীর মেয়ে?

বললাম : নেতার নয়, তাদের দাসের হত্যাকারীর মেয়ে।

বললেন : আল্লাহর কসম! তোমার নিকট আমি কিছুই বেচবো না।

আমিও বললাম : আল্লাহর কসম! আমিও আপনার নিকট থেকে আর কখনো কিছু কিনবো না। তোমার এ আতরে কোন সুগন্ধিই নেই। মতান্তরে একথাও বলেন যে, আপনার আতর ছাড়া আর কারো আতরে আমি পঁচা গন্ধ পাইনি। একথাগুলো বলে আমি উঠে চলে আসি। আসলে উত্তেজনাবশতঃ আমি একথা বলি। মূলতঃ তাঁর আতরের চেয়ে সুগন্ধ আতর আমি কখনো শুকিনি।[১৪]

হাদীছ বর্ণনা

কেবল জিহাদে গমনের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল তা নয়, শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় জানা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী শোনা ও আচরণ পর্যবেক্ষণেও তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট যেতেন। তাই তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু সুনানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তেমনি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য যেমন পেয়েছেন তেমনি তাঁর হাদীছও বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ২১ (একুশ)টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সাহীহ ও সুনানের গ্রন্থাবলীতে এ হাদীছগুলো সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি।[১৫]

উঁচু স্তরের অনেক 'আলিম তাবি'ঈ তাঁর নিকট হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। সেই সকল বিখ্যাত তাবি'ঈদের কয়েকজন হলেন :

সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান। এ দুইজন হলেন সাতজন প্রথম সারির 'আলিম তাবি'ঈর অন্তর্গত। তাছাড়া আবূ 'উবায়দা মুহাম্মাদ ইবন 'আম্মার ইবন ইয়াসির, ইবন 'উমারের (রা) আযাদকৃত দাস নাফি', 'উবাদা ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা), খালিদ ইবন যাকওয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন

---

১৪. আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী-১/৮৯; তাবাকাত-৮/৩০০, ৩০১; আনসাব আল-আশরাফ-১/২৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৯৯

১৫. জাওয়ামি'উ আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-২৮২; বানাত আস-সাহাবা-১৬৭, ১৬৮

মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল, আয়িশা বিন্‌ত আনাস ইবন মালিক প্রমুখ।[১৬]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চেহারার দীপ্তি ও সৌন্দর্যের চমৎকার সব বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে কারো কারো বর্ণনার কিছু বাক্যের অনুপম শিল্পরূপ পাঠক ও শ্রোতাকে দারুণ মুগ্ধ করে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রার (রা) একটি বাক্য :[১৭]

مارأيت شيئًا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى.

'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে অধিকতর সুন্দর কোন কিছু কখনো দেখিনি। যেন সূর্য ছুটছে।' রাসূলুল্লাহর (সা) মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের চলমান দীপ্তিকে কক্ষপথে চলমান সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। এ রকম একটি অনুপম উক্তি আর-রুবায়্যি'উ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। একবার আবূ 'উবায়দা তাঁকে অনুরোধ করলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সৌন্দর্যের একটি বর্ণনা দিতে। তিনি বললেন :[১৮]

يا بنىَّ لو رأيته لقلتَ الشمس طالعة.

'বেটা, তুমি যদি তাঁকে দেখতে তাহলে বলতে, সূর্যের উদয় হচ্ছে।' সত্যি এ এক অপূর্ব বর্ণনা।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রুবায়্যি'উ-এর বাড়ীতে ওযু করেন। কিভাবে তিনি ওযু করেছিলেন, রুবায়্যি'উ (রা) তা প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে তিনি তা বর্ণনা করতেন। সে বর্ণনা শোনার জন্য বহু মানুষ তাঁর নিকট আসতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ওযুর অবস্থা বর্ণনা করার অনুরোধ জানান।[১৯] তাঁর সেই বর্ণনাটি হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[২০]

এ পৃথিবীতে এক জোড়া নর-নারীর দাম্পত্য জীবন যাপন যেমন স্বাভাবিক তেমনি সে জীবনে মনোমালিন্য, কলহ এবং বিচ্ছেদও স্বাভাবিক। আর-রুবায়্যি'উ (রা)-এর জীবনেও এমনটি ঘটেছিল। দীর্ঘদিন স্বামী ইয়াস ইবন আল-বুকাইরের সাথে থাকার পর পরস্পরের মধ্যে এমন বিরোধ সৃষ্টি হয় যে কোনভাবেই এক সাথে থাকা সম্ভব হলো না। বিষয়টির বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন : 'আমার ও আমার চাচাতো ভাই অর্থাৎ স্বামীর মধ্যে একদিন ঝগড়া হলো। আমি তাকে বললাম : আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে তুমি আমাকে পৃথক করে দাও। সে বললো : ঠিক আছে, আমি তাই করলাম। রুবায়্যি'উ (রা)

১৬. আল-ইসতী'আব-৪/৩০২; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/১৯৮
১৭. মুসনাদে আহমাদ-২/৩৫০, ৩৮০; বানাত আস-সাহাবা-১৬৬
১৮. দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্ লিল বায়হাকী-১/২০০; উসুদুল গাবা-৫/৪৫৫
১৯. তাফসীর আল-কুরতুবী-৬/৮৯
২০. আবূ দাউদ : ফী আত-তাহারা-বাবু সিফাতি ওয়াদুয়িন নাবীয়্যি (সা); আত-তিরমিযী : আত-তাহারাহ্ (৩৩); ইবন মাজাহ্ (৪১৮)

বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমার সবকিছু নিয়ে নিল, এমনকি বিছানাটিও। আমি 'উছমানের (রা) নিকট গিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি তখন অবরুদ্ধ অবস্থায়। বললেন : শর্ত পূর্ণ করাই উচিত। ইয়াসকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে তার যা কিছু আছে সব নিতে পার, এমনকি চুলের ফিতাটি পর্যন্ত।[২১] তাঁদের এই বিচ্ছেদের ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনে।

হযরত রুবায়্যি'উ (রা) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে ওফাতের সনটি জানা যায় না। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেছেন, তিনি হিজরী ৭০ (সত্তর) সনের পরে 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[২২] অবশ্য কোন কোন সূত্র হিজরী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সনে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছে। 'আল্লামা আয-যিরিক্‌লী বলেছেন, তিনি হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২৩]

---

২১. আল-ইসাবা-৪/২৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৩০০

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/৩০০

২৩. আল-আ'লাম-৩/৩৯

হিন্দ (রা) বিন্‌ত 'উতবা

'উতবা ইবন রাবী'আ ইবন 'আবদু মান্নাফ ইবন 'আবদু শামস-এর কন্যা হিন্দ। তাঁর মা সাফিয়্যা বিন্‌ত উমাইয়্যা ইবন হারিছা আস-সুলামিয়্যা। মক্কার অভিজাত কুরাইশ খান্দানের সন্তান।[১] ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী আরবে যে সকল মহিলা বিশেষ খ্যাতির অধিকারিণী তিনি তাঁদের একজন। তাঁর বড় পরিচয় তিনি উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের (রা) গৌরবান্বিতা মা।

কুরাইশ বংশের যুবক আল-ফাকিহ্ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর সাথে হিন্দ-এর প্রথম বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই ছাড়াছাড়ি হওয়ার পশ্চাতে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে, আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এই রকম :

মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার যুবক আল-ফাকিহ্ ইবন আল-মুগীরার সাথে হিন্দ-এর বিয়ে হয়। সে ছিল অতিথিপরায়ণ। অতিথিদের থাকার জন্য তার ছিল একটি অতিথিখানা। বাইরের লোক বিনা অনুমতিতে সব সময় সেখানে আসা-যাওয়া করতো। একদিন আল-ফাকিহ্ স্ত্রী হিন্দকে নিয়ে সেই ঘরে দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এক সময় হিন্দকে নিদ্রাবস্থায় রেখে সে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এ সময় একজন আগন্তুক আসে এবং একজন মহিলাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে দরজা থেকেই ফিরে যায়। ফেরার পথে লোকটি আল-ফাকিহ্'র সামনে পড়ে এবং তার সন্দেহ হয়। সে ঘরে ঢুকে হিন্দকে জিজ্ঞেস করে : এইমাত্র যে লোকটি তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে গেল সে কে? হিন্দ বললেন : আমি কিছুই জানি না। কাউকে আমি দেখিনি। আল-ফাকিহ্ তার কথা বিশ্বাস করলো না। সে হিন্দকে তার পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার জন্য বললো। ব্যাপারটি মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। হিন্দ-এর পিতা 'উতবা মেয়েকে বললো : তোমার ব্যাপারটি আমাকে খুলে বল। যদি আল-ফাকিহ্'র কথা সত্য হয় তাহলে কোন গুপ্ত ঘাতক দিয়ে আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো। তাতে চিরদিনের জন্য তোমার দুর্নাম দূর হয়ে যাবে। আর সে মিথ্যাবাদী হলে আমি ইয়ামনের একজন বিখ্যাত কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা)-এর নিকট বিচার দিব। হিন্দ বললেন : আব্বা, সে মিথ্যাবাদী।

'উতবা আল-ফাকিহ্'র নিকট গেল এবং তাকে বললো : তুমি আমার মেয়ের প্রতি একটি বড় ধরনের অপবাদ দিয়েছো। হয় তুমি আসল সত্য প্রকাশ করবে, আর না হয় ইয়ামনের কাহিনের নিকট বিচারের জন্য তোমাকে যেতে হবে। সে বললো : ঠিক আছে, তাই হোক। আল-ফাকিহ্ বানূ মাখযূমের নারী-পুরুষের একটি দল নিয়ে যেমন মক্কা

---

১. তাবাকাত-৮/২৩৫; তাযহীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫; আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৪/৪০৯

থেকে ইয়ামনের দিকে বের হলো তেমনি 'উতবাও বের হলো বানূ আবদি মান্নাফের নারী-পুরুষের একটি দল নিয়ে।

যখন তারা কাহিনের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছলো তখন হিন্দ-এর চেহারা বিরূপ হয়ে গেল। তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বললো : মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তোমার চেহারা তো এমন ছিল না? তিনি বললেন : আব্বা! আমি কোন খারাপ কাজ করেছি, এজন্য আমার চেহারার এ অবস্থা হয়নি, বরং আমি চিন্তা করছি, তোমরা যার নিকট যাচ্ছো সে তো একজন মানুষ। সে ভুল ও শুদ্ধ দুটোই করতে পারে। হতে পারে আমার প্রতি দোষারোপ করে বসলো, আর তা চিরকাল আরবের মানুষের মুখে মুখে প্রচার হতে থাকলো। পিতা বললো : তুমি ঠিকই বলেছো।

এক সময় তারা কাহিনের নিকট পৌঁছলো। মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কাহিন একেকজনের নিকট গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলছিল : যাও! তুমি তোমার কাজ কর। এক সময় সে হিন্দ-এর নিকট গেল এবং তার মাথায় হাত রেখে বললো :

قومى غير رسحاء ولازانية ، وستلدين ملكًا يسمى معاوية.

'যাও, তুমি কোন অশ্লীল কাজ করোনি এবং তুমি ব্যভিচারিণীও নও। ভবিষ্যতে তুমি এক বাদশার জন্ম দেবে যার নাম হবে মু'আবিয়া।'

হিন্দ কাহিনের নিকট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে আল-ফাকিহ্ তার হাত ধরে; কিন্তু হিন্দ সজোরে হাতটি ছাড়িয়ে নেন এবং আল-ফাকিহ্কে লক্ষ্য করে বলেন : আল্লাহর কসম! আমি চাই অন্য কারো ঔরসে আমার গর্ভে সেই সন্তানের জন্ম হোক। অতঃপর আবূ সুফইয়ান তাঁকে বিয়ে করেন এবং মু'আবিয়ার পিতা হন।

বর্ণিত হয়েছে, আল-ফাকিহ্ থেকে পৃথক হওয়ার পর হিন্দ পিতাকে বললেন : আব্বা! আমার কোন মতামত ছাড়াই এই লোকটির সাথে তুমি আমার বিয়ে দিয়েছিলে। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। এবার কোন ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্য আমার নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা না করে কারো সাথে আমার বিয়ে দেবে না। অতঃপর সুহাইল ইবন 'আমর ও আবূ সুফইয়ান ইবন হারব বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। পিতা 'উতবা হিন্দ-এর নিকট নিম্নের চরণগুলির মাধ্যমে সে পয়গাম এভাবে উপস্থাপন করলো :

أتاك سهيل وابن حرب وفيهما + رضَّالكِ ياهند الهنود ومقنَعُ ،

ومامنهما إلا يعاشْ بفضله + ومامنهما إلا يضُر وينفع

ومامنهما إلا كريم مرزّأ + ومامنهما إلا أغرّ سَمَيْدعِ

فدونكِ فاختارى فأنت بصيرة + ولاتُخْدِعى إنّ الـمُخادِعَ يَخْدَعُ.

'ওহে নারী জাতির হিন্দ! সুহাইল ও হারবের পুত্র আবূ সুফইয়ান তোমার নিকট এসেছে। তোমার প্রতি তাদের আগ্রহ ও সন্তুষ্টি আছে।

তাদের অনুগ্রহ ও কল্যাণে জীবন যাপন করা যায়। তারা ক্ষতি ও উপকার দুটোই করতে পারে।

তারা দু'জন মহানুভব ও দানশীল। তারা দু'জন উজ্জ্বলমুখমণ্ডল বিশিষ্ট সাহসী বীর।

তোমার নিকট উপস্থাপন করলাম। তুমিই নির্বাচন কর, কারণ তুমি দূরদৃষ্টিসম্পন্না বুদ্ধিমতী মহিলা। ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিও না। কারণ যে প্রতারণা করে সে প্রতারিত হয়।'

হিন্দ বললেন : আব্বা! আমি এসব কিছু শুনতে চাই না। আপনি তাদের দু'জনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আমার কাছে একটু ব্যাখ্যা করুন। তাহলে আমার জন্য অধিকতর উপযোগী কে তা আমি নির্ধারণ করতে পারবো। 'উতবা এবার সুহাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললো : একজন তো গোত্রের উঁচু স্থানীয় ও বিত্তবান। তুমি তাঁর আনুগত্য করলে সে তোমার অনুগত থাকবে। তুমি তার প্রতি বিরূপ হলে সে তোমার কাছে নত হবে। তার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে তুমি তার উপর কর্তৃত্ব করবে। আর অন্যজন উঁচু বংশ ও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সকলের নিকট পরিচিত। সে তার গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, অত্যন্ত সতর্ক, সম্পদের পাহারায় উদাসীন হয়ে ঘুমায় না এবং তার পরিবারের উপর থেকে তার লাঠি কখনো নামায় না। হিন্দ বললেন : আব্বা! প্রথম ব্যক্তি হবে একজন স্বাধীন নারীকে বিনষ্টকারী। সেই নারী বিদ্রোহী হলে আর আত্মসমর্পণ করবে না। স্বামীর ছায়াতলে মূলত সেই সবকিছু করবে। স্বামী তার আনুগত্য করলে স্ত্রীর ইশারা-ইঙ্গিতে চলবে। পরিবারের লোকেরা তাকে ভয় করে চলবে। তখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়বে। আর সে সময় সেই নারীর সকল নাজ-নোখরা ও ছলাকলাও নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে যাবে। এমতাবস্থায় সে যদি কোন সন্তানের জন্ম দেয়, সে সন্তান হবে নির্বোধ। এই লোকটির আলোচনা আমার নিকট করবেন না। তার নামও আর আমার নিকট উচ্চারণ করবেন না। আর অন্যজন পূতঃপবিত্র স্বাধীন ও কুমারী নারীর স্বামী হওয়ার যোগ্য। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ যে, তার গোত্র তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবে না এবং কোন ভয়-ভীতি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হবে না। এমন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিই আমার স্বামী হওয়ার যোগ্য। তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিন। 'উতবা আবূ সুফইয়ানের সাথে হিন্দ-এর বিয়ে দেয়। তার ঔরসে হিন্দ মু'আবিয়া নামের পুত্রের জন্ম দেয়। সুহাইল ইবন 'আমর হিন্দকে না পেয়ে দারুণ আহত হয় এবং তার মনোবেদনা একটি কবিতায় প্রকাশ করে। আবূ সুফইয়ান কবিতাটি পাঠ করে মন্তব্য করেন : হিন্দ-এর তালাক ছাড়া যদি আর কোন কিছুতে তার কষ্ট দূর হতো, আমি তা করতাম। উক্ত কবিতায় সুহাইল আবূ সুফইয়ানকে একটু হেয় করারও চেষ্টা করে। আবূ সুফইয়ান একটি কবিতায় তার জবাব দেন।

এর পরের ঘটনা। সুহাইল অন্য মহিলাকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে সুহাইলের এক ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটি বড় হলে একদিন সুহাইল তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে। পথে সে দেখতে পায় এক ব্যক্তি একটি মাদী উটের উপর সওয়ার হয়ে ছাগল চরাচ্ছে।

ছেলেটি পিতাকে বলে : আব্বা! এই ছোটগুলো কি বড়টির বাচ্চা? তার প্রশ্ন শুনে পিতা সুহাইলের মুখ থেকে স্বগতোক্তির মত বের হয় : 'আল্লাহ হিন্দ-এর প্রতি দয়া ও করুণা করুন। এ মন্তব্য দ্বারা সে হিন্দ-এর দূরদৃষ্টির কথা স্মরণ করে।[২]

ইবন সা'দ অবশ্য বলেছেন, হিন্দ-এর প্রথম স্বামী হাফ্‌স ইবন আল-মুগীরা ইবন 'আবদুল্লাহ এবং তার ঔরসে হিন্দ-এর পুত্র আবান-এর জন্ম হয়।[৩]

হিন্দ ভালোবাসতেন মুসাফির ইবন আবী 'আমরকে। মুসাফিরও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। এই মুসাফির ছিল রূপ-সৌন্দর্যে, কাব্য প্রতিভা ও দানশীলতায় কুরাইশ যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একদিন হিন্দ তাকে বললেন : যেহেতু তুমি দরিদ্র, তাই আমার পরিবার তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবে না। তুমি পার্শ্ববর্তী কোন রাজার নিকট যাও এবং সেখান থেকে কিছু সম্পদের মালিক হয়ে ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে। মুসাফির হিন্দ-এর মাহরের অর্থ লাভের আশায় হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন আল-মুনযিরের নিকট গেল। কিছুদিন পর আবূ সুফইয়ান ইবন হারব, মতান্তরে জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হীরায় গেল। মুসাফির তার নিকট মক্কার হাল-হাকীকত জিজ্ঞেস করলো এবং জানতে চাইলো সেখানকার নতুন কোন খবর আছে কিনা। আবূ সুফইয়ান বললো : নতুন তেমন কোন খবর নেই। তবে আমি হিন্দ বিন্ত 'উতবাকে বিয়ে করেছি। মুসাফির নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করতে শুরু করলো :[৪]

ألا إن هنداً أصبحت منك مَحْرما + وأصبحت من ادنى حموّتها حما

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه + يقلب بالكفين قوسا وأسهما.

'ওহে, হিন্দ তোমার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিকৃষ্টতম নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সে এমন খারাপ মানুষের মত হয়ে গেছে যে তার অস্ত্র কোষমুক্ত করে, তীর-ধনুক দু'হাত দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে।'

এক সময় মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় হলো।

পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত হিন্দ ইসলামের আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত করেননি। বরং তার এ দীর্ঘ সময় আল্লাহর রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের মাত্রাছাড়া বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতায় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময় শত্রুতা প্রকাশের কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করেননি। স্বর্ণ ও অলঙ্কারের প্রতি মহিলাদের আবেগ স্বভাবগত। কোন অবস্থাতেই তারা এ দু'টো জিনিস হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু হিন্দ দুটোর বিনিময়েও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঠেকাতে মোটেই কার্পণ্য করেননি। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) আবূ সুফইয়ানের

---

২. তারীখু দিমাশ্‌ক-তারাজিম আন-নিসা'-৪৪০-৪৪১; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৮৯; আস-সাবীহ আল-হালাবিয়্যা-৬/৮৬-৮৯; মাজমা' আয-যাওয়াহিদ-৯/২৬৭-২৬৮

৩. তাবাকাত-৮/২৩৫

৪. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪২

গৃহকে নিরাপদ বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ থাকবে। এ ঘোষণার পর আবূ সুফইয়ান ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে হিন্দ তাকে তিরস্কার করে বলেন : আল্লাহ তোমার অনিষ্ট করুন। তুমি একজন নিকৃষ্ট প্রবেশকারী।[৫] তার এমন মাত্রাছাড়া শত্রুতার কারণে রাসূল (সা) তাকে হত্যার ঘোষণা দেন। ইসলামের এহেন শত্রু মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের ঘোষণা দেন।

হিন্দ ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে একজন অনন্যা মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, দুঃসাহস ও চমৎকার বর্ণনা ক্ষমতা। আর ছিল টনটনে আত্মমর্যাদাবোধ। দারুণ বিশুদ্ধভাষিণী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন : হিন্দ ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা।[৬] চমৎকার কাব্য প্রতিভাও ছিল তাঁর। বদরে নিহতদের স্মরণে, বিশেষত তাঁর পিতা 'উতবা, ভাই আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবা এবং চাচা শায়বা ইবন রাবী'আ ও অন্যদের স্মরণে তিনি অনেক মরসিয়া রচনা করেছেন।

'উমার রিদা কাহ্হালা হিন্দ-এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[৭]

هند بنت عتبة بن ربيعة من ربات الحسن والجمال والرأى والعقل والفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والفروسية وعزة النفس الخ.

'রূপ, সৌন্দর্য, মতামত, সিদ্ধান্ত, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, ভাষার শুদ্ধতা ও অলঙ্কার, সাহিত্য, কবিতা, বীরত্ব-সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারিণী ছিলেন হিন্দ বিন্ত 'উতবা।'

বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হয়ে যখন কুরাইশ গোত্রের লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন তখন আবূ লাহাব তার প্রতিবাদ করে এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর সে হিন্দ বিন্ত 'উতবার নিকট এসে বলে : 'উতবার মেয়ে! আমি মুহাম্মাদের থেকে পৃথক হয়ে এসেছি এবং সে যা কিছু নিয়ে এসেছে বলে দাবী করছে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। আমি লাত ও 'উয্যাকে সাহায্য করেছি এবং তাদের দু'জনকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি মুহাম্মাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছি। হিন্দ মন্তব্য করলেন : 'উতবার বাবা! আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন।[৮]

ইসলামের প্রতি হিন্দ-এর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাতে তাঁর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ এবং নারী জাতির প্রতি তীব্র সহানুভূতি ও সহমর্মিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা)

---

৫. আয-যাহাবী, তারখী আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়া আল-আ'লাম-৩/২৯৮

৬. প্রাগুক্ত

৭. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪২

৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৫৪

কুরায়শ বাহিনীর সঙ্গে বদরে যান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। দুর্ভাগ্য তাঁর, মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলেন। মক্কায় অবস্থানরত স্ত্রী যায়নাবের (রা) চেষ্টায় এবং মুসলমানদের উদারতায় মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে যান। তবে মদীনা থেকে আসার সময় রাসূলুল্লাহকে (সা) কথা দিয়ে আসেন যে, মক্কায় পৌঁছে যায়নাবকে সসম্মানে মদীনায় পৌঁছে দেবেন। মক্কায় ফিরে তিনি স্ত্রী যায়নাবকে (রা) সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। যায়নাব চুপে চুপে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এ খবর হিন্দ-এর কানে গেল। তিনি গোপনে রাতের অন্ধকারে যায়নাবের নিকট গেলেন এবং বললেন : 'ওহে মুহাম্মাদের মেয়ে! শুনতে পেলাম তুমি নাকি তোমার পিতার নিকট চলে যাচ্ছ? যায়নাব (রা) বলেন : এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। হিন্দ মনে করলেন, হয়তো যায়নাব তাঁর কাছে বিষয়টি গোপন করছে, তাই তিনি বললেন : আমার চাচাতো বোন! গোপন করো না। ভ্রমণ পথে তোমার কাজে লাগে এমন কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে, অথবা অর্থের সংকট থাকলে আমাকে বল, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আমার কাছে লজ্জা করো না। পুরুষদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ তা নারীদের সম্পর্কে কোন রকম প্রভাব ফেলে না। পরবর্তীকালে যায়নাব (রা) বলেছেন, আমার বিশ্বাস ছিল তিনি যা বলছেন তা করবেন। তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভয় করেছিলাম। তাই আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা অস্বীকার করেছিলাম।[৯]

একদিন যায়নাব (রা) মক্কা থেকে মদীনার দিকে বের হলেন। কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিয়ে আবার মক্কায় ফিরিয়ে দিল। একথা হিন্দ জানতে পেরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ঘর থেকে বের হলেন এবং সেই সব দুরাচারীদের সামনে গিয়ে তাদের এহেন দুষ্কর্মের জন্য কঠোর সমালোচনা করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের চরণটিও আওড়ালেন :[১০]

أفي السلم أعيارًا جفاءً وغلظة + وفي الحرب أشباه النساء العوارك

'সন্ধি ও শান্তির সময় কঠিন ও কঠোর গাধার মত আচরণ করতে পার, আর রণক্ষেত্রে ঋতুবতী নারীর রূপ ধারণ কর।'

কুরাইশ পাষণ্ডরা যায়নাবকে (রা) মক্কায় আবূ সুফইয়ানের নিকট নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, যায়নাব (রা) সন্তানসম্ভবা ছিলেন। পাষণ্ডরা উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তিনি বেশ আঘাতও পেয়েছিলেন। তাঁর সেবা ও আদর-আপ্যায়ন করার জন্য তাঁকে নিয়ে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যার মেয়েরা বিবাদ শুরু করে দেয়। অবশেষে হিন্দ তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এ সময় হিন্দ প্রায়ই তাঁকে বলতেন, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যই।

হিজরী ২য় সনে সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখী আবূ সুফইয়ানের একটি বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে পার করা এবং মুসলমানদেরকে চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মক্কার পৌত্তলিকদের বিশাল একটি বাহিনী বের হয়। এই বাহিনীর পুরোভাগে ছিল কুরাইশদের বাছা বাছা মানুষ ও নেতৃবৃন্দ। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বদরে পৌঁছে উট জবাই করে

৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত-১/৬৫৬; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৭২

ভুরিভোজ এবং মদ পান করে আনন্দ ফূর্তি করবে। তারপর মুসলমানদের শিকড়সহ উৎখাত করবে। যাতে আরবের আর কেউ কোন দিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দুঃসাহস না করে।

মক্কার এই পৌত্তলিক বাহিনীতে ছিল হিন্দ-এর পিতা, ভাই, চাচা ও তাঁর স্বামী। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন তাঁর এক ভাই আবূ হুযাইফা ইবন 'উতবা (রা) ও তাঁর আযাদকৃত দাস সালিম (রা)। বদর যুদ্ধে এই আবূ হুযাইফার (রা) ছিল এক গৌরবজনক ভূমিকা।

এ যুদ্ধে তিনি পিতা 'উতবাকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানান। হিন্দ তাঁর ভাইয়ের এহেন আচরণের নিন্দায় নিম্নের চরণ দু'টি বলেন :[১১]

الأحول الأثعل المذموم طائره + أبو حذيفة شر الناس في الدين

أما شكرت أبًا ربَّاكَ من صغر + حتى شببتَ شبابًا غير محجون.

'ত্যাড়া চোখ, বাঁকা দাঁত ও নিন্দিত ভাগ্যের অধিকারী আবূ হুযাইফা দীনের ব্যাপারে নিকৃষ্ট মানুষ।

তোমার পিতা যিনি তোমাকে ছোটবেলা থেকে প্রতিপালন করেছেন এবং কোন রকম বক্রতা ছাড়াই তুমি পূর্ণ যুবক হয়েছো, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?'

যুদ্ধের সূচনা পর্বেই হিন্দা'র পিতা, ভাই ও চাচা নিহত হয়। শুধু তাই নয়, পৌত্তলিক বাহিনীর সত্তরজন বাছা বাছা সৈনিকও নিহত হয়। তাদের মৃত দেহ বদরে ফেলে রেখে অন্যরা মক্কার পথ ধরে পালিয়ে যায়। এই পলায়নকারীদের পুরোভাগে ছিল হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ান। এ বিজয়ে মুসলমানরা যেমন দারুণ উৎফুল্ল হন তেমনি কুরাইশ বাহিনীর খবর মক্কায় পৌঁছলে সেখানের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে হতবাক হয়ে যায়। প্রথমে অনেকে সে খবর বিশ্বাস করতে পারেনি। পরাজিতরা যখন মক্কায় ফিরতে লাগলো তখন খবরের যথার্থতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকলো না। ঘটনার ভয়াবহতায় মক্কাবাসীদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। আবূ লাহাব তো শোকে দুঃখে শয্যা নিল এবং সে অবস্থায় সাতদিন পরে জাহান্নামের পথে যাত্রা করে। তার জীবনের অবসান হয়। কুরাইশ নারীরা তাদের নিহতদের স্মরণে এক মাস ব্যাপী শোক পালন করে। বুক চাপড়িয়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে তারা মাতম করতে থাকে। নিহত কোন সৈনিকের বাহন অথবা ঘোড়ার পাশে সমবেত হয়ে তারা রোনাজারি করতে থাকে। একমাত্র হিন্দ ছাড়া এই শোক প্রকাশ ও মাতম করা থেকে মক্কার কোন নারী বাদ যায়নি। হাঁ, হিন্দ কোন রকম শোক প্রকাশ করেননি। একদিন কিছু কুরাইশ মহিলা হিন্দ-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করে : তুমি তোমার পিতা, ভাই, চাচা ও পরিবারের সদস্যদের জন্য একটু কাঁদলে না? বললেন : আমি যদি তাদের জন্য কাঁদি তাহলে সে কথা মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছে যাবে।

---

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১৬৬; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৭২

তারা এবং খাযরাজ গোত্রের নারীরা উৎফুল্ল হবে। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তেল-সুগন্ধি আমার জন্য হারাম। আমি যদি জানতাম কান্নাকাটি ও মাতম আমার দুঃখ-বেদনা দূর করে দেবে তাহলে আমি কাঁদতাম। কিন্তু আমি জানি আমার প্রিয়জনদের বদলা না নেওয়া পর্যন্ত আমার অন্তরের ব্যথা দূর হবে না।

হিন্দ তেল-সুগন্ধির ধারে কাছেও গেলেন না এবং আবূ সুফইয়ানের শয্যা থেকেও দূরে থাকলেন। পরবর্তী উহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। আর বদরে নিহতদের স্মরণে প্রচুর মরসিয়া রচনা করলেন। সেই সকল মরসিয়ার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[১২]

أبكي عميدَ الأبطحين كليهما + وحاميهما من كل باغ يريدها

أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي + وشيبة والحامي الزَّمار وليدها

أولئك آل المجد من آل غالب + في العز منها ينمي عديدها.

'আমি আল আবতাহ উপত্যকাদ্বয়ের নেতা এবং প্রতিটি বিদ্রোহীর অসৎ উদ্দেশ্য থেকে তাকে রক্ষাকারীর মৃত্যুতে কাঁদছি।

তোমার ধ্বংস হোক! জেনে রাখ, আমি কাঁদছি সৎকর্মশীল উতবা, শায়বা এবং গোত্রের নিরাপত্তা বিধানকারী তার সন্তানের জন্য। তারা সবাই গালিবের বংশধরের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক।'

বদর যুদ্ধে হিন্দ-এর পিতা 'উতবা, চাচা শায়বা এবং ভাই নিহত হলো। হিন্দ তাদের স্মরণে মরসিয়া গাইতে থাকেন। তৎকালীন 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আল-খানসা'। জাহিলী আমলের কোন এক যুদ্ধে তাঁর দু'ভাই সাখর ও মু'আবিয়া নিহত হয়। আল-খানসা' সারা জীবন তাদের জন্য কেঁদেছেন, মাতম করেছেন এবং বহু মর্মস্পর্শী মরসিয়া রচনা করে সমগ্র আরববাসীকে তাঁর নিজের শোকের অংশীদার করে তুলেছেন। এ কারণে 'উকাজ মেলায় আল-খানসা'র হাওদা ও তাঁবুর সামনে পতাকা উড়িয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। তিনি বলতেন : আমি আরবের সবচেয়ে বড় মুসীবতগ্রস্ত মানুষ। হিন্দ এসব কথা অবগত হয়ে বলতেন : আমি আল-খানসা'র চেয়েও বড় মুসীবতগ্রস্ত। তারপর তিনিও আল-খানসা'র মত হাওদা বিশেষভাবে চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন এবং উকাজে উপস্থিত হন। তিনি বলেন : আমার উট আল-খানসা'র উটের কাছাকাছি নাও। তাই করা হলো। আল-খানসা'র কাছাকাছি গেলে তিনি বললেন : বোন! আপনার পরিচয় কি? বললেন : আমি হিন্দ বিন্ত 'উতবা– আরবের সবচেয়ে বড় মুসীবতগ্রস্ত মানুষ। আমি জানতে পেরেছি, আরববাসীর নিকট নিজেকে আপনি সবচেয়ে

১২. শা'ইরাত আল-'আরাব-৪৬৮; আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৩

বড় বিপদগ্রস্ত মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আপনার সেই বিপদটি কি? বললেন : আমার পিতা 'আমর, ভাই সাখর ও মু'আবিয়ার মৃত্যু

তিনি পাল্টা হিন্দকে প্রশ্ন করলেন : তা আপনার বিপদটা কি? বললেন : আমার পিতা 'উতবা ও ভাই আল-ওয়ালীদের মৃত্যু। আল-খানসা' বললেন : এছাড়া আর কেউ আছে? তারপর তিনি আবূ 'আমর, মু'আবিয়া ও সা'খরের স্মরণে একটি মরসিয়া কবিতা আবৃত্তি করেন।[১৩]

উহুদের প্রস্তুতি

বদরের পর থেকে কুরাইশদের অন্তরে শান্তি নেই। তাদের নারীরা নিহত পুত্র, পিতা, স্বামী অথবা প্রিয়জনদের স্মরণে শোক প্রকাশ করে চলেছে। তাদের অন্তরে বড় ব্যথা। অতঃপর মক্কার পৌত্তলিকরা বদরের উপযুক্ত বদলা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মহিলারাও এবার জিদ ধরলো পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার। তবে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং আরো কিছু অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা মহিলাদের সঙ্গে নিতে রাজি হচ্ছিল না। হিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি তো বদরে প্রাণে বেঁচে গিয়ে নিরাপদে স্ত্রীর নিকট ফিরে এসেছিলে। হাঁ, এবার আমরা যাব এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। বদরে যাত্রাকালে আল-জুহফা থেকে তোমরা মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে, এবার কেউ আর তাদেরকে ফেরাতে পারবে না। সেবার তারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে।

কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে চললো। হিন্দ-এর নেতৃত্বে পনেরো জন মহিলাও তাদের সহযাত্রী হলো।[১৪] তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বদরে মুহাম্মাদের (সা) চাচা হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিব হিন্দ-এর প্রিয়তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই হিন্দ হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহশীকে নানা রকম অঙ্গীকার করে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছেন। সে যদি হামযাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তাকে প্রচুর স্বর্ণ, অলঙ্কার ও অর্থ দিবেন। উল্লেখ্য যে, এই ওয়াহশী ছিলেন জুবায়র ইবন মুতইমের ক্রীতদাস।

উহুদের ময়দানে উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। কুরাইশরা বদর ও সেখানে নিহতদের স্মৃতিচারণ করছে। হিন্দ-এর নেতৃত্বে কুরাইশ নারীরা দফ ও তবলা বাজিয়ে নিম্নের এ গানটি গাইতে গাইতে তাদের

---

১৩. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৩

১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১২-৩১৩; মক্কা থেকে আর যে সকল নারী উহুদে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো : সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার স্ত্রী বারযাহ্ বিন্ত মাস'উদ আছ-ছাকাফী, তালহা ইবন আবী তালহার স্ত্রী সালামা বিন্ত সা'দ, আল-হারিছ ইবন হিশামের স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ও 'আমর ইবন আল-'আসের স্ত্রী হিন্দ বিন্ত মুনাব্বিহ্। (আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী-১/২০২-২০৩)

সারিবদ্ধ সৈনিকদের সামনে দিয়ে চক্কর দিতে লাগলো।[১৫]

نحن بنات طارق ر + نمشی علی النمارق

إن تقبلوا نعانق + أوتدبروا نفارق.

فراق غير وامق.

'তারকার কন্যা মোরা, নিপুণ চলার ভঙ্গি। সামনে যদি এগিয়ে যাও জড়িয়ে নেবো বুকে। আর যদি হটে যাও পিছে, পৃথক হয়ে যাব চিরদিনের তরে।'

অপরদিকে মুসলমানরা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর সাহায্যকে স্মরণ করছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) কিছু দক্ষ তীরন্দাযকে পাহাড়ের উপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োগ করলেন এবং গোটা বাহিনীকে এমনভাবে সাজালেন যে, কেউ ভুল না করলে আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অবধারিত।

যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথম দিকে পৌত্তলিক বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দ্বারপান্তে পৌঁছে গেল। কুরাইশ বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কুরাইশ রমণীরা হেয়, লাঞ্ছিত অবস্থায় যুদ্ধবন্দিনী হতে চলছিল। যুদ্ধের এমন এক পর্যায়ে কিছু মুসলিম সৈনিক শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহে মনোযোগী হয়ে পড়লো, আর পাহাড়ের উপর নিয়োগকৃত তীরন্দায বাহিনীর কিছু সদস্য রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের কথা ভুলে গিয়ে স্থান ত্যাগ করলো। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের রূপ পাল্টে গেল। পলায়নপর পৌত্তলিক বাহিনী মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করলো। তারা ফিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করে বসলো। মুসলিম বাহিনী হতচকিত হয়ে পড়লো। আবার যুদ্ধ শুরু হলো। বহু হতাহতসহ সত্তর (৭০) জন মুসলিম সৈনিক শাহাদত বরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো। ওয়াহশীর হাতে হযরত হামযা (রা) শহীদ হলেন।

কুরাইশরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়লো। বদরের কঠিন বদলা নিতে পেরেছে মনে করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো। সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন হিন্দ। হামযার (রা) হত্যায় তিনি তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি কুরাইশ নারীদের সঙ্গে নিয়ে নিহত মুসলিম সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁদের নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে চরমভাবে বিকৃতি সাধন করলেন।

আল-বালাযুরী হিন্দ-এর নৃশংসতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন: 'ওয়াহশী হযরত হামযাকে হত্যা করে তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে এনে হিন্দ-এর হাতে দেয়। হিন্দ সেই কলিজা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দেন। তারপর নিজে গিয়ে কেটে-কুটে হামযার (রা) দেহ বিকৃত করে ফেলেন। হিন্দ তাঁর দেহ থেকে দু'হাতের কজী, পাকস্থলী ও দু' পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তারপর ফিরে এসে নিজের অঙ্গ থেকে মূল্যবান রত্নখচিত স্বর্ণের অলঙ্কার, যথা পায়ের খাড়ু, গলার হার ও কানের দুল খুলে ওয়াহশীর

১৫. আ'লাম আন-নিসা'- ৫/২৪৪; বিভিন্ন বর্ণনায় গানটির কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

হাতে তুলে দেন। পায়ের আংগুলে পরিহিত স্বর্ণের আংটিগুলিও খুলে তাকে দিয়ে দেন। কারণ, এই হামযা বদর যুদ্ধে তার বাবা 'উতবাকে হত্যা করেছিলেন।[১৬]

হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবানোর কথা শুনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন : যদি হিন্দ হামযার কলিজা চিবিয়ে গিলে ফেলতো তাহলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতো না। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন জাহান্নামের আগুনের জন্য হামযার গোশ্‌ত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করেছেন।[১৭]

সে এমনই এক নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ ছিল যার দায়ভার কুরাইশ দলপতি আবূ সুফইয়ানও নিতে অস্বীকার করেন। তিনি একজন মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের নিহতদের যে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে তাতে যেমন আমি খুশী নই, তেমনি অখুশীও নই। আমি কাউকে বারণও করিনি, আবার করতেও বলিনি। সবকিছু শেষ করে হিন্দ একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে নিম্নের চরণগুলি উচ্চারণ করেন :[১৮]

نحن جزيناكم بيوم بدر + والحرب بعد الحرب ذات سعر

ماكان عن عتبة لي من صبر + ولا أخي عمّه وبكرى

شفيتُ صدري وقضيت نذري + شفيت وحشيٌّ عليل صدري.

'আমরা তোমাদেরকে বদরের বদলা দিয়েছি। একটি যুদ্ধের পর আরেকটি যুদ্ধ হয় আগুনওয়ালা। আমার পিতা 'উতবা, ভাই, চাচা ও দলের জন্য আমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার অন্তরকে সুস্থ করেছি, অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি। হে ওয়াহ্‌শী! তুমি আমার অন্তরকে রোগমুক্ত করেছো।'

বদরের ক্ষতি, অপমান ও লজ্জা অনেকটা পুষিয়ে নিয়ে অন্তরভরা আনন্দ-খুশী সহকারে কুরাইশরা ফিরে চললো। হিন্দ তখন গাইতে লাগলেন :[১৯]

رجعت وفي نفسي بلابل جمّة + وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي

ولكني قد نلتُ شيئًا ولم يكن + كما كنتُ أرجو في مسيري ومطلبي

'আমি ফিরে চলেছি, অথচ আমার অন্তরে রয়েছে বহু পুঞ্জিভূত ব্যথা। আমার উদ্দেশ্য যা ছিল তার কিছু অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। তবে আমি কিছু অর্জন করেছি। আমার উদ্দেশ্য এবং আমার চলার পথে যেমনটি আমি আশা করেছিলাম তেমনটি হয়নি।'

মদীনাবাসীদের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের বেশ কয়েকটি বছর কেটে

---

১৬. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২২

১৭. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৫

১৮. আয-যাহাবী, তারীখ-২/২০৫

১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৮

গেল। খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং সবশেষে মক্কা বিজয়। কোন উপায় না দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় প্রবেশের আগের দিন কুরাইশ নেতা হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ান গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মক্কাবাসীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনার জন্য। সেখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে এসে ঘোষণা দেন : ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা শুনে রাখ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমরাও ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ, মুহাম্মাদ তোমাদের নিকট এসে গেছেন এমন শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে যার ধারণাও তোমাদের নেই। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দ তার মাথাটি সজোরে চেপে ধরে বলেন : তুমি সম্প্রদায়ের একজন নিকৃষ্ট নেতা। তারপর হিন্দ মক্কাবাসীদের প্রতি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করতে আহ্বান জানান।[২০]

ইসলাম গ্রহণ ও বায়'আত

এ ব্যাপারে সকল বর্ণনা একমত যে, মক্কা বিজয়ের দিন হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ানের ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খুব ভালো মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল তথ্য বর্ণিত হয়েছে তা একত্রিত করলে নিম্নের রূপ ধারণ করে :

হিন্দ আবূ সুফইয়ানকে বললেন : আমি ইচ্ছা করেছি, মুহাম্মাদের অনুসারী হবো।

আবূ সুফইয়ান : গতকালও তো দেখলাম তুমি এ কাজকে ভীষণ অপছন্দ করছো।

হিন্দ : আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়েছে, গত রাতের পূর্বে এই মসজিদে আর কোন দিন আল্লাহর সত্যিকার ইবাদাত হয়নি। তারা কিয়াম, রুকূ' ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যেই সেখানে এসেছে।

আবূ সুফইয়ান : তুমি যা করার তাতো করেছো। তুমি তাঁর নিকট যাওয়ার সময় তোমার গোত্রের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।[২১]

এ কথার পর হিন্দ 'উছমান, মতান্তরে 'উমারের (রা) নিকট যান। তখন হিন্দ-এর সঙ্গে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন কিছু মহিলাও ছিলেন। 'উছমান (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এলেন। হিন্দ-এর ভয় ছিল, হামযার (রা)

---

২০. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৫

২১. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলাকে ক্ষমার আওতার বাইরে রাখেন এবং তাদেরকে নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্র হত্যার নির্দেশ দেন। পুরুষরা হলো : 'ইকরিমা ইবন আবী জাহ্‌ল, হাব্বাব ইবন আল-আসওয়াদ, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবী সারাহ, মুকায়্যিস ইবন সুবাবা, আল-হুয়ায়রিছ ইবন নুকায়য। মহিলারা হলো : হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা, আমর ইবন হাশিম ইবন 'আবদুল মুত্তালিবের দাসী সাবা, হিলাল ইবন 'আবদিল্লাহর দু'জন গায়িকা– ফারতানা ও আরনাব। এ দু' গায়িকা রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দামূলক গান গেয়ে বেড়াতো। (আনসাব আল-আশরাফ-১/৩৫৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্‌-৪৮৬) ইবন হাজার এর বাইরে আরো কিছু নারী-পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী-৮/১১-১২)

সাথে তাঁর আচরণের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে পাকড়াও করতে পারেন, তাই মাথা-মুখ ঢেকে অপরিচিতের বেশে রাসূলের (সা) নিকট প্রবেশ করেন।

তাঁর সঙ্গে গেলেন আরো অনেক মহিলা। উদ্দেশ্য তাঁদের, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত হওয়া। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট বসা ছিলেন তাঁর দুই বেগম, কন্যা ফাতিমা ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের আরো অনেক মহিলা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় হিন্দ কথা বললেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন তাই আজ বড় লজ্জা ও অনুশোচনা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর মনোনীত দীনকে বিজয়ী করেছেন। আপনার ও আমার মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে সূত্রে আমি আপনার নিকট ভালো ব্যবহার আশা করি। এখন আমি একজন ঈমানদার ও বিশ্বাসী নারী– একথা বলেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে পরিচয় দেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা। রাসূল (সা) বললেন : খোশ আমদেদ। হিন্দ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! হেয় ও অপমান করার জন্য আপনার বাড়ীর চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় বাড়ী ধরাপৃষ্ঠে এর আগে আর ছিল না। আর এখন আপনার বাড়ীর চেয়ে অধিক সম্মানিত বাড়ী আমার নিকট দ্বিতীয়টি নেই।[২২]

রাসূল (সা) বললেন : আরো অনেক বেশী। তারপর তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান এবং বাই'আত গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) বললেন : তোমরা একথার উপর অঙ্গীকার কর যে, আল্লাহর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করবে না।

হিন্দ বললেন : আপনি আমাদের থেকে এমন অঙ্গীকার নিচ্ছেন যা পুরুষদের থেকে নেন না। তা সত্ত্বেও আমরা আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

রাসূল (সা) : তোমরা চুরি করবে না।

হিন্দ : আল্লাহর কসম! আমি আবূ সুফইয়ানের অর্থ-সম্পদ থেকে মাঝে মাঝে কিছু নিয়ে থাকি। আমি জানিনে, তাকি আমার জন্য হালাল হবে, নাকি হারাম হবে।

পাশে বসা আবূ সুফইয়ান বলে উঠলেন : অতীতে তুমি যা কিছু নিয়েছো তাতে তুমি হালালের মধ্যে আছ। রাসূল (সা) বললেন : তুমি তো হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা।

হিন্দ : হাঁ, আমি হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা। আপনি আমার অতীতের আচরণকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

রাসূল (সা) বললেন : তোমরা ব্যভিচার করবে না।

হিন্দ : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মুক্ত-স্বাধীন নারী কি ব্যভিচার করে?

রাসূল (সা) : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

---

২২. আসহাবে রাসুলের জীবনকথা-১/২০৫

হিন্দ বললেন : আমরা তো তাদেরকে শিশুকালে লালন-পালন করেছি। আপনি তাদের বড়দেরকে বদরে হত্যা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং তারা এ বিষয়টি ভালো জানেন।

তাঁর একথা শুনে 'উমার (রা) হেসে দেন।

রাসূল (সা) : কারো প্রতি বানোয়াট দোষারোপ করবে না।

হিন্দ : কারো প্রতি দোষারোপ করা দারুণ খারাপ কাজ।

রাসূল (সা) : কোন ভালো কাজে আমার অবাধ্য হবে না।

হিন্দ : আমরা এই মজলিসে বসার পরও কোন ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবো?

রাসূল (সা) 'উমারকে বললেন : তুমি এই মহিলাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর নিকট দু'আ কর।

'উমার (রা) তাঁদের বাই'আত গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা) মহিলাদের সাথে করমর্দন করতেন না। তিনি তাঁর জন্য বৈধ অথবা মাহরিম নারী ছাড়া অন্য কোন নারীকে স্পর্শ করতেন না, তেমনি তাদেরকে স্পর্শ করার সুযোগও দিতেন না। তাই হিন্দ যখন বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে স্পর্শ করতে চাই। বললেন : আমি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। একজন নারীর জন্য আমার যে বক্তব্য, এক শো' নারীর জন্য আমার বক্তব্য একই।

অতঃপর রাসূল (সা) আবূ সুফইয়ান ও হিন্দ-এর পূর্বের বিয়েকে বহাল রাখেন।[২৩]

নারী জাতির মধ্যে হিন্দ-এর ব্যক্তিত্বে ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ। তাঁর মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করার পর তাঁর অন্তরের সকল পঙ্কিলতা দূর করে দেয়, সাহাবিয়া সমাজে তিনি এক অনন্য মহিলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভিতরের পশুত্ব, তাঁর অন্তরের সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্নকারী মূর্খতার আবরণ এবং বিবেক ও চেতনাকে আচ্ছাদনকারী সকল অসত্য ও অসারতাকে দূর করে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে দেন। ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনো কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে নত হননি। ইসলামী বিশ্বাসকে তিনি বাস্তবে রূপদান করেন। ইসলাম পূর্ববর্তী জীবনে তাঁর গৃহে একটি মূল্যবান বিগ্রহ ছিল। ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গিয়ে– তোমার ব্যাপারে আমরা একটা ধোঁকার মধ্যে ছিলাম– একথা বলতে বলতে কুড়াল দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন।[২৪]

একথা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু উপহার পাঠান। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন। এ প্রসঙ্গে ইবন

---

২৩. তাবাকাত-৮/২৩৬, ২৩৭; আত-তাবারী, তারীখ-২/১৬১, ১৬২; আল-ইসতীআব-৪/৪১১; উসুদুল গাবা-৪/৪০৯; আস-সীরাহ্ আল-হালবিয়্যাহ্-৩/৪৬, ৪৭; এছাড়া বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈসহ বিভিন্ন গ্রন্থে ঘটনাটি কমবেশী বর্ণিত হয়েছে।

২৪. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫৭; তাবাকাত-৮/২৩৭; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬০

'আসাকির বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দ দু'টি ভূনা বকরীর বাচ্চা এবং এক মশক পানি তাঁর দাসীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। রাসূল (সা) তখন আল-আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলের (সা) সঙ্গে তখন উম্মু সালামা, মায়মূনাসহ বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের আরো কিছু মহিলা ছিলেন। খাবারগুলি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করে দাসীটি বললো : এই উপহারটুকু আমার মনিবা পাঠিয়েছেন এবং বিনয়ের সাথে এ অক্ষমতার কথাও বলেছেন : বর্তমান সময়ে আমাদের ছাগীগুলি কমই মা হচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ তোমাদের ছাগলে বরকত দিন এবং মায়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

দাসী ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর কথা হিন্দকে অবহিত করলে তিনি ভীষণ খুশী হন। পরবর্তীকালে দাসীটি বলতেন, আমরা আমাদের ছাগল ও তার মায়ের সংখ্যা এত বেশী হতে দেখেছি যা পূর্বে আর কখনো হয়নি। হিন্দ বলতেন : এটা রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ ও তাঁর বরকতে হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। তারপর তিনি এই স্বপ্নের কথা বলতেন : আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলাম, অনন্তকাল ধরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ছায়া আমার নিকটেই, কিন্তু সেখানে যেতে সক্ষম হচ্ছি না। যখন রাসূল (সা) আমাদের কাছে আসলেন, দেখলাম, আমি যেন ছায়ায় প্রবেশ করলাম।[২৫]

হিন্দ-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী

হিন্দ-এর মুখ-নিঃসৃত অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী আছে যা প্রায় প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। শব্দ এত যাদুকরী ও ভাব এত উন্নতমানের যে, তা দ্বারা তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও চমৎকার চিন্তা ও অনুধ্যান ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। এই জীবনের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, সত্যকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের কথাও তা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে ইবনুল আছীর তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[২৬]

كانت امرأة لها نفس وأنفة ورأى وعقل.

'তিনি ছিলেন একজন প্রাণসত্তার অধিকারিণী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্না এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী মহিলা।'

যেমন তিনি বলেছেন : 'নারী হলো বেড়ি। তার জন্য অবশ্যই একটি কণ্ঠের প্রয়োজন। তোমার কণ্ঠে ধারণ করার পূর্বে ভালো করে দেখে নাও, কাকে ধারণ করছো।' তিনি আরো বলেছেন : 'নারীরা হলো বেড়ি। প্রত্যেক পুরুষ অবশ্যই তার হাতের জন্য একটি বেড়ি ধারণ করবে।'[২৭]

---

২৫. তারীখু দিমাশ্ক, তারাজিম আন-নিসা'-৪৫৬, ৪৫৭

২৬. উসুদুল গাবা-৫/৫৬৩

২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/২৬৭; আল-আ'লাম-৮/৯৮

পরবর্তীকালের ঘটনা। খলীফা 'উমারের খিলাফতকাল, মক্কায় আবূ সুফইয়ানের (রা) বাড়ীর দরজার সামনে দিয়ে পানি গড়িয়ে যেত। হাজীদের চলাচলের সময় তাদের পা পিছলে যেত। 'উমার (রা) তাঁকে এভাবে পানি গড়ানো বন্ধ করতে বলেন। আবূ সুফইয়ান (রা) 'উমারের (রা) কথার গুরুত্ব দিলেন না। এরপর 'উমার (রা) একদিন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই দরজার ভিজে স্থানটিতে তাঁর পা পিছলে গেল। তিনি হাতের চাবুকটি আবূ সুফইয়ানের (রা) মাথার উপর উঁচু করে ধরে বলেন : আমি কি আপনাকে এই পানি গড়ানো বন্ধ করতে বলিনি? আবূ সুফইয়ান সঙ্গে সঙ্গে নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মুখ চেপে ধরেন। তখন 'উমার (রা) বলেন : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমনও দেখালেন যে, আমি মক্কার বাতহা' উপত্যকায় আবূ সুফইয়ানকে পিটাচ্ছি, অথচ তাঁর সাহায্যকারী নেই, আমি তাঁকে আদেশ করছি, আর তিনি তা পালন করছেন।' 'উমারের (রা) এ মন্তব্য শুনে হিন্দ বলে ওঠেন : ওহে 'উমার! তাঁর প্রশংসা কর। তুমি তাঁর প্রশংসা করলে তোমাকে অনেক বড় কিছু দেওয়া হবে।

হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) যখন ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানকে (রা) শামের ওয়ালী নিয়োগ করেন তখন মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের সংগে শামে যান। এ সময় আবূ সুফইয়ান (রা) একদিন হিন্দকে (রা) বলেন : এখন যে তোমার ছেলে মু'আবিয়া আমার ছেলে ইয়াযীদের অধীন থাকবে– এটা তোমার কেমন লাগবে? হিন্দ বললেন : যদি আরব ঐক্যে অস্থিরতা দেখা দেয় তখন দেখবে আমার ছেলে এবং তোমার ছেলের অবস্থান কি হয়। উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ (রা) ছিলেন আবূ সুফইয়ানের (রা) অন্য স্ত্রীর সন্তান। এর অল্পকাল পরে ইয়াযীদ (রা) শামে মারা যান। 'উমার (রা) তাঁর স্থলে মু'আবিয়াকে (রা) নিয়োগ করেন। এ নিয়োগ লাভের পর হিন্দ মু'আবিয়াকে (রা) বলেন : আমার ছেলে! আল্লাহর কসম! আরবের স্বাধীন নারীরা তোমার মত সন্তান খুব কম জন্ম দিয়েছে। এ ব্যক্তি তোমাকে টেনে তুলেছেন। সুতরাং তোমার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক তুমি তাঁর মর্জি মত কাজ করবে। হযরত হিন্দ-এর বিভিন্ন সময়ের এ জাতীয় মন্তব্য ও আচরণ দ্বারা বুঝা যায় হযরত 'উমারের (রা) প্রতি ছিল তাঁর দারুণ শ্রদ্ধাবোধ। সব সময় তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন।

হিন্দ একবার খলীফা 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে বাইতুল মাল থেকে চার হাজার দিরহাম ঋণের আবেদন জানিয়ে বললেন, এদিয়ে আমি ব্যবসা করবো এবং ধীরে ধীরে পরিশোধ করবো। খলীফা তাঁকে ঋণ দিলেন। তিনি সেই অর্থ নিয়ে কালব গোত্রের এলাকায় চলে যান এবং সেখানে কেনাবেচা করতে থাকেন। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন আবূ সুফইয়ান ও তাঁর ছেলে 'আমর ইবন আবী সুফইয়ান এসেছেন মু'আবিয়ার (রা) নিকট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মু'আবিয়ার (রা) নিকট চলে যান।

উল্লেখ্য যে, আগেই আবূ সুফইয়ানের (রা) সাথে তাঁর দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

মু'আবিয়া (রা) মায়ের এভাবে আসার কারণ জানতে চান। হিন্দ বলেন : আমি তোমাকে

নজরে রাখার জন্য এসেছি। 'উমার তো কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করেন। এদিকে তোমার বাবা এসেছেন তোমার নিকট। আমার ভয় হলো তুমি সবকিছু তাঁর হাতে উঠিয়ে না দাও। মানুষ জানতে পারবে না তুমি এসব জিনিস কোথা থেকে তাঁকে দিচ্ছো। পরে 'উমার তোমাকে পাকড়াও করবেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁর বাবা ও ভাইকে একশো দীনারসহ কাপড়-চোপড় ও বাহন দিলেন। ভাই আমর এ দানকে যথেষ্ট বলে মনে করলেন।

আবূ সুফইয়ান বললেন : একে বড় দান মনে করো না। হিন্দ-এর অগোচরে এ দান দেওয়া হয়নি। আর এই যে, সুন্দর পোশাক, এগুলো হিন্দ এনেছে। এরপর তাঁরা সবাই মদীনায় ফিরে আসেন। এক সময় আবূ সুফইয়ান হিন্দকে জিজ্ঞেস করেন : ব্যবসায়ে কি লাভ হয়েছে? হিন্দ বলেন : আল্লাহই ভালো জানেন। মদীনায় আমার কিছু ব্যবসা আছে। মদীনায় এসে হিন্দ তাঁর পণ্য বিক্রি করলেন এবং 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে ব্যবসায়ে তাঁর লোকসানের কথা জানালেন। 'উমার বললেন : তোমাকে দেওয়া অর্থ যদি আমার হতো আমি ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এ অর্থ তো মুসলমানদের। আর এই যে, সুন্দর পোশাক তুমি আবূ সুফইয়ানকে দিয়েছিলে তাতো এখনো তার নিকট আছে। তারপর 'উমার (রা) লোক পাঠিয়ে আবূ সুফইয়ানকে গ্রেফতার করেন। হিন্দ-এর নিকট থেকে পাওনা উসূল করে তাঁকে ছেড়ে দেন। 'উমার (রা) আবূ সুফইয়ানকে (রা) জিজ্ঞেস করেন : মু'আবিয়া আপনাকে নগদে কত দিয়েছে? আবূ সুফইয়ান বলেন : এক শো দীনার।[২৮]

"আল-'ইকদ আল-ফারীদ" গ্রন্থে এসেছে। আবূ সুফইয়ান মু'আবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় এসে 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে বলেন : আমাকে কিছু দান করুন। 'উমার (রা) বললেন : আপনাকে দেওয়ার মত আমার নিকট তেমন কিছু নেই। 'উমার (রা) সীল-মোহর একজনের হাতে দিয়ে হিন্দ-এর নিকট পাঠলেন। তাঁকে বলে দিলেন : তুমি তাকে বলবে, যে দু'টি পাত্র তুমি নিয়ে এসেছো, তা আবূ সুফইয়ান পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্র দু'টি 'উমারের (রা) নিকট নিয়ে আসা হলো। তার মধ্যে দশ হাজার দিরহাম ছিল। 'উমার (রা) পাত্রসহ দিরহামগুলো বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিলেন। 'উমারের (রা) পর 'উছমান (রা) খলীফা হলেন। তিনি সেই অর্থ আবূ সুফইয়ানকে (রা) ফেরত দিতে চাইলেন। কিন্তু আবূ সুফইয়ান তা নিতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে : যে অর্থের জন্য 'উমার আমাকে তিরস্কার করেছেন তা আমি অবশ্যই নেব না।[২৯]

হিন্দ ও মু'আবিয়া

হিন্দ-এর ছেলে মু'আবিয়া (রা)। দুধ পান করানো অবস্থায়ই তিনি ছেলেকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, উদার, ভদ্র তথা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি ছেলেকে শিশুকালে কোলে করে নাচাতে নাচাতে নিম্নের চরণগুলি সুর করে আবৃত্তি করতেন :[৩০]

---

২৮. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৯

২৯. প্রাগুক্ত; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৪৯

৩০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৮০

إن بنيَّ معرقٌ كريم + محبَّبٌ أهله حليم

ليس بفحاشٍ ولالئيم + ولابطخرور ولاشؤوم

صخربني فهر به زعيم + لايخلف الظن ولايخيم.

'আমার ছেলে সম্ভ্রান্ত মূল বা খান্দানের। তার পরিবারের মধ্যে অতি প্রিয় ও বিচক্ষণ। সে অশ্লীল কর্ম সম্পাদনকারী নয় এবং নীচ প্রকৃতিরও নয়। ভীরু ও কাপুরুষ নয় এবং অশুভ ও অকল্যাণের প্রতীকও নয়। বানূ ফিহ্‌রের শীলা, তাদের নেতা। মানুষের ধারণা ও অনুমানকে সে মিথ্যা হতে দেয় না এবং ভীত হয়ে পালিয়েও যায় না।'

মু'আবিয়া (রা) যখন ছোট্ট শিশুটি তখন একদিন একটি লোক তাঁকে দেখে মন্তব্য করে : আমার বিশ্বাস এই ছেলেটি তার জাতির নেতৃত্ব দিবে। হিন্দ বলে উঠলেন : তার সন্তান বিয়োগ হোক! সে তো তার জাতির নেতৃত্ব দিবেই।[৩১]

ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানের মৃত্যুর পর অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, আমরা আশা করি মু'আবিয়া হবে ইয়াযীদের যোগ্য উত্তরসূরী। একথা শুনে হিন্দ মন্তব্য করেন : মু'আবিয়ার মত মানুষ কারো উত্তরসূরী হয় না। আল্লাহর কসম! গোটা আরব ভূমিকে যদি এক সঙ্গে মিলিত করা হয় এবং তার মাঝখানে তাকে ছুড়ে ফেলা হয় তাহলে যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সে বেরিয়ে আসতে পারবে।[৩২] একবার তাঁকে বলা হলো : মু'আবিয়া যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার জাতিকে শাসন করবে। হিন্দ বললেন : তার সর্বনাশ হোক! যদি সে তার জাতিকে ছাড়া অন্যদেরকে শাসন না করে। একবার তিনি শিশু মু'আবিয়াকে নিয়ে তায়িফ যাচ্ছেন। উটের পিঠে হাওদার সামনের দিকে মু'আবিয়া বসা। এক আরব বেদুঈন তাকে দেখে হিন্দকে বলে : আপনি শিশুটিকে দু'হাত দিয়ে ভালো করে ধরে রাখুন এবং তাকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করুন। কারণ, ভবিষ্যতে এ শিশু একজন বড় নেতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি হবে। হিন্দ তার কথার প্রতিবাদ করে বলেন : না, বরং সে একজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহ এবং দানশীল ব্যক্তি হবে।[৩৩]

হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর মায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : হিন্দ ছিলেন জাহিলী যুগে কুরাইশদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামী যুগে একজন সম্মানিত অভিজ্ঞ মহিলা। হযরত মু'আবিয়া (রা) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও দক্ষ মানুষ। তিনি তাঁর যাবতীয় গুণ পিতার চেয়ে মায়ের নিকট থেকেই বেশী অর্জন করেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) পরবর্তী জীবনে কোথাও নিজের গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ

---

৩১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৮৭; 'উয়ূন আল-আখবার-১/২২৪
৩২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৪
৩৩. আ'লাম আল-নিসা'-৫/২৫০

উঠলে অকপটে মায়ের প্রতিই আরোপ করতেন। প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাবে তিনি গর্বের সাথে প্রায়ই বলতেন : আমি হিন্দ-এর ছেলে।[৩৪]

হযরত হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অঙ্গীকারের উপর আমরণ অটল ছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। ইয়ারমূক যুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের রোমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ছেলে মু'আবিয়ার (রা) নিকট যান।[৩৫]

হযরত হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে মু'আবিয়া ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের একটি এই :[৩৬]

قلت للنبى صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان شحيح وأنه لايعطينى وولدى إلا أخذت منه وهو لايعلم، فهل على حرج؟ قال : خذى مايكفيك وولدكِ بالمعروف.

'আমি নবীকে (সা) বললাম : আবূ সুফইয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পদ থেকে তাঁর অগোচরে আমি যা কিছু নিই তছাড়া তিনি আমার ছেলে ও আমাকে কিছুই দেন না। এতে কি আমার কোন অপরাধ হবে? তিনি বললেন : তোমার ছেলে ও তোমার প্রয়োজন পূরণ হয় ততটুকু যুক্তিসম্মতভাবে গ্রহণ কর।'

তবে ইবনুল জাওযী 'আল-মুজতানা' গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৩৭]

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় হিন্দ (রা) খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ১৪, খ্রীঃ ৬৩৫ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি যে দিন ইনতিকাল করেন সে দিনই হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) পিতা হযরত আবূ কুহাফা (রা) ইনতিকাল করেন।[৩৮] তবে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ সুফইয়ান (রা) হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে ইনতিকাল করলে জনৈক ব্যক্তি হযরত মু'আবিযার (রা) নিকট হিন্দকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি ভদ্রভাবে একথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি এখন বন্ধ্যা হয়ে গেছেন, তাঁর বিয়ের আর প্রয়োজন নেই।[৩৯]

---

৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯২

৩৫. তারীখু দিমাশ্ক, তারাজিম আন-নিসা'-৪৩৭; আল-আ'লাম-৮/৯৮

৩৬. একমাত্র তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৯; তাবাকাত-৮/২৩৭

৩৭. আ'লাম আন-নিসা-৫/২৫০

৩৮. উসুদুল গাবা-৫৬৩; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫৭

৩৯. আল-ইসাবা-৪/৪২৬; সাহাবিয়াত-২৭১

Contents

দুররা (রা) বিন্‌ত আবী লাহাব

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভের পর তিন বছর যাবত মক্কায় গোপনে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। অনেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনেন। অনেকের ঈমান আনার কথা প্রকাশ পেলেও অধিকাংশের কথা কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে গোপন থাকে। প্রথম দিকে কুরাইশরা রাসূলের (সা) প্রচারকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। তিন বছর পর হযরত জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) প্রকাশ্যে ইসলামের আহ্বান জানাতে বলেন এবং তাঁকে একথাও জানিয়ে দেন যে, তিনি হলেন একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : যখন এ আয়াত–

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ.

'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন'[১]– নাযিল হলো, রাসূল (সা) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানাতে লাগলেন : ওহে ফিহ্‌র গোত্রের লোকেরা, ওহে 'আদী গোত্রের লোকেরা!

এই আওয়ায শুনে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় সকল লোক একত্রিত হলো। যিনি যেতে পারলেন না তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠালেন কি ব্যাপার তা জানার জন্য। কুরাইশরা হাজির হলো, আবূ লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি বললেন : তোমরা বলো, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড়সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, তারা তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হাঁ বিশ্বাস করবো। কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। নবী (সা) বললেন তবে শোন, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করতে প্রেরিত হয়েছি। আবূ লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও। আমাদেরকে কি একথা বলার জন্য এখানে ডেকেছো?

আবূ লাহাব একথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। তাতে বলা হয়– تَبَّتْ يَدَاْ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

'আবূ লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।'[২]

দুর্‌রা (রা) ছিলেন এই আবূ লাহাবের কন্যা এবং 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর দাদা।

---

১. সূরা আশ-শু'আরা-২১৪

২. সহীহ মুসলিম-১/১১৪; সহীহ বুখারী-২/৭০৬; তাফসীর আল-খাযিন-৭/৩১১; তাফসীর ইবন কাছীর : সূরা আল-মাসাদ

তিনি মক্কার কুরাইশ খান্দানের হাশিমী শাখার সন্তান এবং হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চাচাতো বোন।[৩] দুর্‌রার (রা) জীবন আলোচনার পূর্বে তাঁর পিতা-মাতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহর (সা) এক চাচা। তার আসল নাম 'আবদুল 'উয্‌যা ইবন 'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম। ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) প্রতি তার ছিল দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তাঁকে কষ্ট দিতে, তাঁর ধর্ম ও সত্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। দৈহিক সৌন্দর্য ও মুখমণ্ডলের দীপ্তির জন্য তাকে "আবূ লাহাব" (অগ্নিশিখা) বলে ডাকা হতো। অথচ দীপ্তিমান মুখমণ্ডলের অধিকারীর জন্য (আবুন নূর) ابو النور অথবা أبـو الضيـاء (আবুদ দিয়া) হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভবিষ্যতে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম তাই আল্লাহ প্রথম থেকেই মানুষের দ্বারা তার নাম রেখে দেন আবূ লাহাব।[৪]

আবূ লাহাব হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চাচা হওয়া সত্ত্বেও ভাতিজার প্রতি তার বিন্দুমাত্র দয়া-মমতা ছিল না। ভাতিজা নবুওয়াত লাভের দাবী ও প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার সাথে সাথে তাদের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। ভাতিজাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য সে তার পিছে লেগে যায়। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কোন সুযোগ সে হাতছাড়া করতো না। মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে বাজার এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে তাঁর পিছনে লেগে থাকতো। ইমাম আহমাদ (রহ) আবুয যানাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুয যানাদ বলেছেন, আমাকে রাবী'আ ইবন 'আব্বাদ নামের এক ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, বলেছেন : আমি একবার যুল-মাজাযের বাজারে নবীকে (সা) দেখলাম, জনতাকে সম্বোধন করে বলছেন :

ياايها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلون.

'ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা সফলকাম হবে।' তাঁর চারপাশে জনতার সমাবেশ ছিল। আর তাঁকে অনুসরণ করতো দীপ্তিমান চেহারার এক ব্যক্তি। সে মানুষকে বলতো 'এ ধর্মত্যাগী মিথ্যাবাদী'। আমি লোকদের নিকট এই লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে বললো : সে তাঁর চাচা আবূ লাহাব।[৫]

তারিক ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুহারিবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবূ লাহাব নবীর (সা) কথা মিথ্যা প্রমাণ করতেই শুধু ব্যস্ত থাকতো না বরং তাঁকে পাথরও নিক্ষেপ করতো। এতে নবীর (সা) পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যেত।[৬]

শুধু কি তাই? সে মনে করতো তার অর্থ-সম্পদ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অপমান, লাঞ্ছনা ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) যখন তাঁর

---

৩. উসুদুল গাবা-৫/৪৪৯; আল-ইসতী'আব-৪/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৫

৪. তাফসীর ইবন কাছীর; সূরা লাহাব

৫. প্রাগুক্ত; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯১

৬. তাফহীমুল কুরআন-৬/৫২২; ফী জিলাল আল-কুরআন-৩/২৮২

সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বললো : আমার ভাতিজা যা বলছে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি কিয়ামতের দিন আমার অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্তুতিদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো। সে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা :[৭]

يَوْمَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَّبَنُوْنُ، إلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে আবূ লাহাব তার দুই পুত্র 'উতবা এবং 'উতাইবাকে রাসূলের (সা) দুই কন্যা রুকাইয়্যা এবং উম্মু কুলসুমের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলের (সা) নবুওয়াত পাওয়ার পর এবং দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচারের শুরুতে আবূ লাহাব নবীর দুই কন্যাকে তালাক দিতে তার দুই পুত্রকে বাধ্য করেছিল।[৮]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দ্বিতীয় পুত্র 'আবদুল্লাহর ইনতিকালের পর আবূ লাহাব এতো খুশী হয়েছিল যে, তার বন্ধুদের কাছে দৌড়ে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলেছিল, মুহাম্মাদ অপুত্রক হয়ে গেছে।[৯]

আবূ লাহাবের স্ত্রী তথা দুর্‌রার (রা) মা উম্মু জামীলের প্রকৃত নাম আরওয়া। সে ছিল হারব ইবন উমাইয়্যার কন্যা এবং আবূ সুফইয়ানের (রা) বোন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে সে স্বামীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। রাসূল (সা) যে পথে চলাফেরা করতেন সেই পথে এবং তাঁর দরজায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। সে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষী এবং প্রচণ্ড ঝগড়াটে ছিল। নবীকে (সা) গালাগাল দেওয়া এবং কুটনামি, নানা ছুতোয় ঝগড়া, ফেতনা-ফাসাদ এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা ছিল তার কাজ। এক কথায় সে ছিল নোংরা স্বভাবের এক মহিলা। এ কারণে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দায় বলেছেন,

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. - এবং তার স্ত্রীও সে ইন্ধন বহন করে।[১০]

এই উম্মু জামীল যখন জানতে পারলো যে, তার নিজের এবং স্বামীর নিন্দা করে আয়াত নাযিল হয়েছে তখন সে রাসূলুল্লাহকে (সা) খুঁজে খুঁজে কা'বার কাছে এলো, রাসূল (সা) তখন সেখানে ছিলেন। সংগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকও ছিলেন। আবূ লাহাবের স্ত্রীর হাতে ছিল এক মুঠ পাথর। রাসূলের (সা) কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলে আল্লাহ তার দৃষ্টি কেড়ে নেন। ফলে সে রাসূলকে (সা) দেখতে পায়নি, আবূ বকরকে (রা) দেখছিল। সে

---

৭. সূরা আশ-শু'আরা-৮৮-৮৯

৮. তাফহীমুল কুরআন-৬/৫২২; ফী জিলাল আল-কুরআন-৩/২৮২

৯. তাফহীমুল কুরআন-৬/৪৯০

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৫৫

Contents

আবূ বকরের (রা) সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথী কোথায়? আমি শুনেছি তিনি আমার নিন্দা করেছেন। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাঁকে পেয়ে যাই তবে তাঁর মুখে এ পাথর ছুড়ে মারবো। দেখ, আল্লাহর কসম! আমিও একজন কবি। এরপর সে নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করে :

مُذَمَّمًا عصينا وأَمْرَه أَبَيْنَا

وَدِيْنَه قَلَيْنَا

'মুযাম্মামের অবাধ্যতা করেছি, তাঁর কাজকে অস্বীকার করেছি এবং তাঁর দীনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি।'

উল্লেখ্য যে তৎকালীন মক্কার পৌত্তলিকরা নবী কারীমকে (সা) মুহাম্মাদ না বলে 'মুযাম্মাম' বলতো। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। আর 'মুযাম্মাম' অর্থ নিন্দিত। এরপর উম্মু জামীল চলে গেল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবীকে (সা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? বললেন : না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[১১]

ইবন ইসহাক বলেন, যেসব লোক রাসূলকে (সা) ঘরের মধ্যে কষ্ট দিত তাদের নাম হলো আবূ লাহাব, হাকাম ইবন আবুল 'আস ইবন উমাইয়্যা, 'উকবা ইবন আবী মু'ঈত, 'আদী ইবন হামরা, ছাকাফী ইবনুল আসদা' প্রমুখ। তারা সবাই ছিল রাসূলের (সা) প্রতিবেশী।[১২]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এহেন চরম দুশমনের পরিণতি কি হয়েছিল তা একটু জানার বিষয়। বদর যুদ্ধের সময় সে মক্কায় ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর শোনার পর প্লেগ জাতীয় العَدَسَةُ (আল-আদাসা) নামক একপ্রকার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তিন দিন পর্যন্ত মৃতদেহ ঘরে পড়ে থাকে। সংক্রমণের ভয়ে কেউ ধারে-কাছে যায়নি। যখন পচন ধরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন তার এক ছেলে দূর থেকে পানি ছুড়ে মেরে মৃতদেহকে গোসল দেয়। কুরাইশ গোত্রের কেউ লাশের কাছে যায়নি। তারপর কাপড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে মক্কার উঁচু ভূমিতে নিয়ে যায় এবং একটি প্রাচীরের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে পাথর চাপা দেয়। এই ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) চরম দুশমনের পার্থিব নিকৃষ্ট পরিণতি।[১৩]

এমন একটি নোংরা ও ভয়াবহ পরিবারে দুর্‌রা বিন্‌ত আবী লাহাব জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। তিনি সেই শিশুকাল থেকেই পিতা-মাতার এহেন নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ কাজ দেখতেন, কিন্তু তাদের এসব কাজ ও আচরণ মেনে নিতে পারতেন না। মনে মনে পিতা-

---

১১. প্রাগুক্ত-১/৩৫৬

১২. আর রাহীক আল-মাখতূম-১০৩

১৩. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯২

মাতার এসব ঘৃণ্য কাজকে প্রত্যাখ্যান করতেন। ধীরে ধীরে ইসলামের বাণী তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। ইসলাম তাঁর অন্তরে আসন করে নেয়। একদিন তিনি পৌত্তলিকতার অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ। (তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে)। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেমন মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন দুররার (রা) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলা চলে।

হযরত দুররা (রা) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪] তবে কখন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।[১৫] তাঁর প্রথম স্বামী আল-হারিছ ইবন নাওফাল ইবন আল-হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ পক্ষে বদর যুদ্ধে যেয়ে সে পৌত্তলিক অবস্থায় নিহত হয়। তার ঔরসে দুররা (রা) 'উকবা, আল-ওয়ালীদ ও আবূ মুসলিম– এ তিন ছেলের জন্ম দেন। মদীনায় আসার পর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দিহইয়া আল-কালবীর (রা) সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়।[১৬] এই দিহইয়া আল-কালবী (রা) ছিলেন প্রথমপর্বে ইসলাম গ্রহণকারী একজন মহান সাহাবী। বদরের পরে সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র নিয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে যান। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। জিবরীল (আ) তাঁর আকৃতি ধারণ করে মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসতেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।[১৭]

হযরত দুররা (রা) হিজরাত করে মদীনায় আসার পর যথেষ্ট সমাদর, সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেও কোন কোন মুসলিম মহিলা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর পিতা-মাতার আচরণের কথা মনে করে তাঁরা তাঁকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। দুররা (রা) বড় বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এ অবস্থা থেকে রাসূল (সা) তাঁকে উদ্ধার করেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা একত্র করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

"দুররা বিন্ত আবী লাহাব হিজরাত করে মদীনায় আসলেন এবং রাফি' ইবন আল-মু'আল্লা আয-যুরকীর (রা) গৃহে অবতরণ করেন। বানূ যুরাইক গোত্রের মহিলারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে বললো, আপনি তো সেই আবূ লাহাবের কন্যা যার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে :

تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَّتَبَّ، مَاأَغْنَى عَنْهُ مَالُه وَمَاكَسَبَ.

তাহলে তোমার এ হিজরাতে ফায়দা কোথায়?

---

১৪. আয-যিরিকলী : আল-আ'লাম-২/৩৩৮
১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৫
১৬. তাবাকাত ইবন সা'দ-৮/৫০; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৩
১৭. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৮৫

অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে দুররা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে যুরাইক গোত্রের নারীদের মন্তব্যের কথা জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করে বললেন : বস। তারপর জুহরের নামায আদায় করে মিম্বরের উপর বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন :

أيها الناس، مالى أوذى فى أهلي؟ فوالله إن شفاعتى تنال قرابتى، حتى إن صدا وحكم وسهلب لتنالهايوم القيامة.

'ওহে জনমণ্ডলী! আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় কেন? আল্লাহর কসম! আমার নিকটাত্মীয়রা কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে। এমন কি (ইয়ামানের) সুদা, হাকাম ও সাহ্‌লাব গোত্রসমূহও তা অবশ্য লাভ করবে।'[১৮]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে; রাসূল (সা) দুররার (রা) মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

أغضب الله من أغضبكِ.

'যে তোমাকে রাগান্বিত করবে সে আল্লাহকে রাগান্বিত করবে।'[১৯]

নবী পরিবারের সাথে হযরত দুররার (রা) সম্পর্ক দূরের ছিল না। এ কারণে প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট যেতেন এবং তাঁর থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার ক্ষেত্রে দুইজন পাল্লা দিচ্ছেন। যেমন একদিনের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'আমি 'আয়িশার (রা) নিকট বসে আছি, এমন সময় রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বলেন, আমাকে ওজুর পানি দাও। আমি ও 'আয়িশা দু'জনই পানির পাত্রের দিকে দৌড় দিলাম। 'আয়িশার আগেই আমি সেটা ধরে ফেললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই পানি দিয়ে ওজু করার পর আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন :

أنتِ مني وأنا منكِ - তুমি আমার (পরিবারের) একজন এবং আমিও তোমার (পরিবারের) একজন।[২০]

হযরত দুররা (রা) ছিলেন অন্যতম কুরাইশ মহিলা কবি। তিনি হাদীছও বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) থেকে সরাসরি ও 'আয়িশার (রা) সূত্রে মোট তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

---

১৮. আ'লাম আন-নিসা-১/৪০৯; উসুদুল গাবা-৫/৪৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৯০, ৪৯১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭২

১৯. আশ-শাওকানী, দুররুস সাহাবা-৫৪২

২০. ইমাম আশ-শাওকানী বলেছেন, ইমাম আহমাদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দুররা থেকে এর বর্ণনাকারীদের সূত্রের সকলে 'ছিকা' বা বিশ্বস্ত। (দুররুস সাহাবা-৫৪৩)

قالت : قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهُو على المنبر، فقال : يارسول الله أىُّ الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم : خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم.

'দুররা (রা) বলেন : রাসূল (সা) মিম্বরের উপর আছেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো? রাসূল (সা) বললেন : যে বেশী কুরআন পাঠ করে, বেশী তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে, বেশী বেশী ভালো কাজের আদেশ দেয়, বেশী বেশী খারাপ কাজ করতে বারণ করে এবং বেশী বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো।'

তাঁর থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীছটি হলো :

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايؤذى حى بميت.

'কোন মৃত ব্যক্তির কারণে কোন জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।'[২১]

তাঁর মধ্যে এক শক্তিশালী কাব্য প্রতিভা ছিল। কাব্যচর্চা করেছেন। চমৎকার ভাবসমৃদ্ধ কিছু কবিতা তাঁর নামে বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর একটি কবিতার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ[২২]

لاَقَوْا غداة الروع ضمزَزَةً   فيها السَّنَوَّرُ من بنى فهر

ملمومةً خرساء تحسبُها   لـما بدت موجًا من البحر

والجردُ كالعقبان كاسرةً   تهوى أمامَ كتائب خُضْر

منها ذعاف الموت أبْرَدُه يغلى   بهم وأحرَّه يجرى

قومٌ لو أن الصخر صالدهم   صَلُبُوا ولان عرامسُ الصخر.

'ভীতি ও আতঙ্কের দিন প্রত্যুষে তারা পাহাড়ের মত অটল বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করে যার মধ্যে বনী ফিহ্‌রের যুদ্ধের পোশাক পরিহিত নেতৃবৃন্দও আছে।

পাগলের মত উত্তেজিত ও বোবা বিশাল বাহিনী যখন দৃশ্যমান হয় তখন তোমার মনে হবে তা যেন সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

অশ্বারোহী বাহিনী শিকারী বাজপাখীর মত উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছোঁ মেরে ধূসর বর্ণের বাহিনীর সামনে নেমে আসে।

---

২১. আল-ইসতী'আব-৪/২৯১; আল-ইসাবা-৪/২৯১; আল-আ'লাম-২/৩৩৮

২২. আ'লাম আন-নিসা-১/৪০৯; শা'য়িরাত আল-আরাব-১২০; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৬

সেই তরবারির মরণরূপী মারাত্মক বিষ তাদের শীতলতম ব্যক্তিকেও উত্তেজিত করে এবং উষ্ণতমকে প্রবাহিত করে দেয়।

তারা এমন সম্প্রদায় যদি পাথর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তারাও শক্ত হয়ে যায় এবং কঠিন পাথরকেও নরম করে ফেলে।'

হযরত দুররা (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নিকট থেকে যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন তা আজীবন বজায় রাখেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আর দুররা (রা) খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ (বিশ) সনে ইনতিকাল করেন।[২৩]

উল্লেখ্য যে, ইতিহাসে দুররা নামের তিনজন মহিলা সাহাবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন : দুররা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান, দুররা বিন্‌ত আবী সালামা ও দুররা বিন্‌ত আবী লাহাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না।

---

২৩. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৬

উম্মু কুলছূম (রা) বিন্‌ত 'উকবা

মক্কার কুরায়শ খান্দানের কন্যা উম্মু কুলছূম। এটা তাঁর ডাকনাম। আসল নাম জানা যায় না। পিতা 'উকবা ইবন আবী মু'আইত আল-উমাবী, মাতা আরওয়া বিন্‌ত কুরাইয।[১] উল্লেখ্য যে, এই উম্মু কুলছূম নামে মোট সাতজন মহিলা সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়।[২] তিনি আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান ইবন 'আফফানের (রা) বৈপিত্রেয় বোন। কারণ, আরওয়া বিন্‌ত কুরাইয হযরত 'উছমানেরও (রা) মাতা। উম্মু কুলছূমের (রা) আপন দুই ভাই আল-ওয়ালীদ ও 'উমারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) পিতা ছিল মহানবীর (সা) মাক্কী জীবনের একজন জানি দুশমন। মক্কায় নবী (সা) ও দুর্বল মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি রকমের নির্যাতনের জন্য ইতিহাসে সে খ্যাত হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। উম্মু কুলছূম (রা) তখন মক্কায়। পাষণ্ড পিতার হত্যার খবর শোনার পর তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

উম্মু কুলছূম (রা) মক্কায় অল্প বয়সে পিতৃগৃহে থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে তাঁর নিকট বাই'আত করেন। তিনি ছিলেন দুই কিবলার দিকে নামায আদায়কারীদের অন্যতম।[৪]

তিনি প্রথম মুহাজির মহিলা যিনি পালিয়ে একাকী মদীনার পথে বের হন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল মক্কার এক চরম ইসলামবিদ্বেষী পরিবারে। ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হয়ে গেলে মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখী হন। তাঁর উপর যুলম-নির্যাতন নেমে আসে। ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তিনি মদীনাগামী মুহাজিরদের সাথে হিজরাত করতে না পারেন। এ অবস্থায় তাঁকে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়।

ইবন 'আবদিল বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত উম্মু কুলছূম (রা) হিজরাত করতে পারেননি। হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে তাঁর জীবনে মদীনায় হিজরাতের সুযোগ আসে এবং মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। হুদায়বিয়ার

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৬১৪; তাহযীবুল আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৬

২. দ্র. উসুদুল গাবা-৫/৬১২-৬১৫

৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৩

৪. প্রাগুক্ত

সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কার কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। উম্মু কুলছূম (রা) মদীনায় পৌঁছার দুই দিন পর তাঁর দুই সহোদর আল-ওয়ালীদ ও 'উমারা ইবন 'উকবা তাঁকে ফেরত দানের দাবী নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে। তখন সূরা আল-মুমতাহিনার ১০ম আয়াতটি নাযিল হয় এবং তাতে মক্কা থেকে আসা মহিলা মুহাজিরদেরকে ফেরত দিতে বারণ করা হয়। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) উম্মু কুলছূমকে (রা) তাঁর ভাইয়ের হাতে অর্পণ করতে অস্বীকার করেন।[৫] তিনি তাদেরকে বলেন :

كان الشرط فى الرجال دون النساء.

'শর্ত ছিল পুরুষদের সম্পর্কে, স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নয়।'[৬]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) মদীনায় হিজরাতের ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তিনি একাকী মক্কা থেকে বের হন এবং পথে খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। পায়ে হেঁটে, মতান্তরে উটের পিঠে চড়ে মদীনায় পৌঁছেন। ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেন : একমাত্র উম্মু কুলছূম (রা) ছাড়া অন্য কোন কুরায়শ মহিলার ইসলাম সহকারে একাকী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরাত করার কথা আমাদের জানা নেই।[৭]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের কাহিনী ও কৌশলের কথা তাঁর মুখেই শুনা যাক :

আমার পরিবারের একাংশ গ্রামে (মরুদ্যানে) থাকতো। আমি সেখানে একাকী যেতাম এবং তিন চারদিন সেখানে অবস্থান করে আবার মক্কায় ফিরে আসতাম। আমার এমন যাওয়া-আসাতে কেউ বারণ করতো না। এক পর্যায়ে আমি মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একদিন গ্রামের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলাম। আমাকে যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল তারা কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। আমি একাকী চলছি, এমন সময় খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোথায় যাবে?

আমি জানতে চাইলাম : আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেন এবং আপনি কে?

বললেন : আমি খুযা'আ গোত্রের লোক।

তিনি খুযা'আ গোত্রের লোক বলাতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ, এ গোত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিল। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম :

আমি কুরায়শ গোত্রের একজন নারী, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতে চাই, কিন্তু আমার পথ জানা নেই।

---

৫. আল-বায়হাকী, দালাযিল আন-নুবুওয়াহ্-৪/১৭১; আল-ইসতী'আব-৪/৪৬৫; নাসাবু কুরায়শ-১৪৫

৬. তাফহীমুল কুরআন-খণ্ড-১৭, পৃ. ৭২; ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীর ও ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআনের সূত্রে তাফহীমুল কুরআনে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. তাবাকাত-৮/২৩০

বললেন : আমি তোমাকে মদীনায় পৌঁছে দিচ্ছি।

তারপর তিনি একটি উট আমার কাছে নিয়ে আসলেন। আমি তার পিঠে চড়ে বসলাম। এক সময় আমরা মদীনা পৌঁছুলাম। তিনি ছিলেন একজন উত্তম সঙ্গী। আল্লাহ তাঁকে ভালো প্রতিদান দিন। আমি উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূলের (সা) দিকে হিজরাত করেছো?

বললাম : হাঁ। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিনা।

একটু পরে রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) নিকট আসলেন। উম্মু সালামা (রা) তাঁকে আমার বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে 'মারহাবান ওয়া 'আহলান' বলে স্বাগত জানালেন।

বললাম : আমি আমার দীনের জন্য আপনার নিকট পালিয়ে এসেছি। আমাকে আশ্রয় দিন। ফেরত পাঠাবেন না। ফেরত পাঠালে আমাকে এমন শাস্তি দিবে যা আমি সহ্য করতে পারবো না।

রাসূল (সা) বললেন : মহান আল্লাহ মহিলাদের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি অকার্যকর ঘোষণা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির যে ধারাতে মক্কাবাসীদেরকে ফেরত দানের কথা ছিল, তাতে কেবল পুরুষদের কথা উল্লেখ ছিল, মহিলাদের সম্পর্কে কোন কথা ছিল না। এরপর রাসূল (সা) নিম্নের এ আয়াত দুইটি পাঠ করেন :[৮]

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلاَتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّااَنْفَقُوْا ط وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلاَتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ط وَاتَّقُو اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরাত করে এলে তাদের পরীক্ষা করবে; আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা

---

৮. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০-১১

ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে থেকে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। ভয় কর আল্লাহকে, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু কুলছূম (রা) এবং তাঁর পরে যে সকল নারী মদীনায় এসেছেন তাঁদের সকলকে এ আয়াতের আলোকে পরীক্ষা করেছেন। হযরত ইবন 'আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলো : নারীদেরকে পরীক্ষা করার রাসূলুল্লাহর (সা) পদ্ধতি কি ছিল? বললেন : তিনি মদীনায় আগত মহিলাদের এভাবে শপথ করাতেন : আল্লাহর কসম! স্বামীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষবশত আমি ঘর থেকে বের হইনি। আল্লাহর কসম! এক যমীন থেকে অন্য এক যমীনের প্রতি আকর্ষণবশত বের হইনি। আল্লাহর কসম! পার্থিব কোন লোভ-লালসাবশত ঘর ত্যাগ করিনি। আল্লাহর কসম! কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) মুহাব্বতে ঘর ত্যাগ করেছি।[৯]

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে উম্মু কুলছূমের (রা) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে কেন্দ্র করে ইসলামী শরী'আতের অনেকগুলো বিশেষ বিধান জারী করেন। এ তাঁর জন্য এক বিশেষ মর্যাদার বিষয়।

মাদানী জীবনে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) মহিলা সাহাবীদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে এবং তাঁর ঈমানী সততাকে খুব বড় করে দেখতেন। কোন কোন জিহাদে তাঁকে সংগে নিয়ে গেছেন এবং আহতদের সেবায় নিয়োগ করেছেন। যুদ্ধলব্ধ গনীমতেও তাঁকে অংশ দিয়েছেন।[১০]

বিয়ে

হিজরাতের আগ পর্যন্ত উম্মু কুলছূম (রা) বিয়ে করেননি। মদীনায় আসার পর প্রখ্যাত চারজন সাহাবী তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠান। তাঁরা হলেন : যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম, যায়দ ইবন হারিছা, 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ ও 'আমর ইবন আল-'আস (রা)। তিনি বৈপিত্রেয় ভাই 'উছমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) সাথে পরামর্শ করেন। 'উছমান (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পরামর্শ করতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর

---

৯. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৪৮৫; তাফসীরুল খাযিন মা'আ হামিশ আল-বাগাবী-৭/৭৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৬; আয-যাহাবী ঃ তারীখ-২/৪০০; যাদুল মা'আদ-৩/৩০০

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৬

(সা) নিকট যান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁর পরামর্শ চান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : তুমি যায়দ ইবন হারিছাকে বিয়ে কর। তোমার জন্য ভালো হবে। তিনি যায়দকে বিয়ে করেন।

হযরত যায়দ (রা) মূতার যুদ্ধে শহীদ হলেন। অতঃপর হযরত যুবায়র ইবন আল-আওয়াম (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত যুবায়রের (রা) স্বভাবে একটু রূঢ়তা ছিল। বেগমদের প্রতি বেশ কঠোর আচরণ করতেন।

এ কারণে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) তালাকের আবেদন করেন এবং তিনি তালাক দেন। এভাবে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। 'আবদুর রহমান রোগাক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তখন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) মিসরের গভর্নর। তিনি উম্মু কুলছূমকে (রা) বিয়ে করেন এবং তাঁর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করেন।[১১] তখন চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলীর (রা) খিলাফাতকাল।

সন্তান

হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়ামের (রা) ঘরে যায়নাব এবং 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফের (রা) ঘরে ইবরাহীম, হুমায়দ, মুহাম্মাদ ও ইসমা'ঈলের জন্ম হয়। হযরত যায়দ ও 'আমর ইবন আল-'আসের (রা) ঘরে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হুমায়দ একজন তাবি'ঈ এবং বড় মাপের ফকীহ 'আলিম হন। তিনি বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর মামা হযরত 'উছমানের (রা) নিকট থেকে ছোট বেলায় হাদীছ শুনেছেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন : তিনি একজন খ্যাতিমান মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন। হিজরী ৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

সেকালে যখন লেখা-পড়ার মোটেই প্রচলন ছিল না তখন যে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কিছু লিখতে পড়তে জানতেন। উম্মু কুলছূম (রা) তাঁদের একজন। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দশটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র হুমায়দ ইবন 'আবদির রহমান ও ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়দ ইবন নাফি'ও তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৩] সাহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিম) তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে। একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি। ইবন মাজাহ্ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থেও হাদীছগুলো সংকলিত হয়েছে।[১৪]

---

১১. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৫; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৭৭; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪৭১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৭

১২. শাযারাত আয-যাহাব-১/৩৮৬-৩৮৭

১৩. আল-ইসতী'আব-২/৭৯৪

১৪. সাহাবিয়াত-২৪৩; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৮

আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা)

আরবের খাস'আম গোত্রের কন্যা আসমা'। পিতা 'উমাইস ইবন মা'আদ এবং মাতা খাওলা বিন্‌ত 'আওফ। মা খাওলা, যিনি হিন্দা নামেও পরিচিত, কিনানা গোত্রের মেয়ে। আসমার ডাক নাম উম্মু 'আবদিল্লাহ।[১] উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনার (রা) সৎ বোন ছিলেন।[২] হযরত 'আলী ইবন আবী তালিবের বড় ভাই জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) সাথে বিয়ে হয়।[৩] তিনি ছিলেন একদল বিখ্যাত মহিলা সাহাবীর সহোদরা অথবা সৎ বোন। তাদের সংখ্যা নয় অথবা দশজন।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় দারুল আরকামে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে তিনি মুসলমান হন।[৫] এরই কাছাকাছি সময়ে তাঁর স্বামী হযরত জা'ফারও (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে তাঁদের তিন ছেলে- 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও 'আওনের জন্ম হয়।[৭]

কয়েক বছর হাবশায় অবস্থানের পর হিজরী সপ্তম সনে খাইবার বিজয়ের সময় হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌঁছেন।[৮] মদীনায় পৌঁছে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) ঘরে যান। তখন সেখানে হযরত 'উমার (রা) উপস্থিত হন। তিনি প্রশ্ন করেন মহিলাটি কে? বলা হলো : আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস। 'উমার বললেন : হ্যাঁ, সেই হাবশী মহিলা, সেই সাগরের মহিলা! আসমা' বললেন : হ্যাঁ, সেই। 'উমার (রা) বললেন : হিজরাতের দ্বারা আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করে গিয়েছি। আসমা' বললেন : হ্যাঁ, তা আপনি ঠিক বলেছেন। আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহার করাতেন এবং মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা দেশ থেকে বহু দূরে অসহায় অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য পড়ে ছিলাম। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-মুসীবতের মুকাবিলা করছিলাম। দেখি রাসূল (সা) ফিরে আসুন, বিষয়টি তাঁকে অবহিত করবো। অনেকটা ক্ষোভের সাথে আসমা' এ কথাগুলো বলেন। এরই মধ্যে রাসূল (সা) এসে উপস্থিত হন। আসমা' (রা)

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮২
২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৭, টীকা-৭; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৪১
৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ-৮/২৮০; ইবন কুতায়বা; আল-মা'আরিফ-১৭১, ১৭৩
৪. আল-ইসাবা-৪/২৩১
৫. তাবাকাত-৮/২৮০
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৩৬
৭. প্রাগুক্ত-১/৩২৩, ২/৩৫৯; আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৩; জামহারাত আনসার আল-'আরাব-৩৯০
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৯, ২৬৯

তাঁকে সবকথা খুলে বলেন। রাসূল (সা) বলেন : তারা তো এক হিজরাত করেছে, আর তোমরা করেছো দুই হিজরাত। এদিক দিয়ে তোমাদের মর্যাদা বেশি।[৯]

'আমির থেকে বর্ণিত হয়েছে। আসমা' অভিযোগ করেন এ ভাষায় : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকেরা মনে করে যে, আমরা মুহাজির নই। জবাবে রাসূল (সা) বলেন : যারা এমন কথা বলে তারা অসত্য বলে। তোমাদের হিজরাত দুইবার হয়েছে। একবার তোমরা নাজ্জাশীর নিকট হিজরাত করেছো। আরেকবার আমার নিকট।[১০]

রাসূলুল্লাহর (সা) এ মুখ নিঃসৃত সুসংবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে হাবশায় হিজরাতকারী ব্যক্তিরা দারুণ উৎফুল্ল হন। তাঁরা আসমার নিকট এসে এ সুসংবাদের সত্যতা যাচাই করে যেতেন।[১১]

ঐতিহাসিক মূতার যুদ্ধ হয় হিজরী অষ্টম সনে। হযরত আসমার (রা) স্বামী জা'ফার (রা) ছিলেন এ যুদ্ধের একজন অন্যতম সেনা অধিনায়ক। যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। খবরটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছার পর তিনি আসমার (রা) বাড়ীতে ছুটে যান এবং বলেন, জা'ফারের ছেলেদেরকে আমার সামনে নিয়ে এসো। আসমা' ছেলেদেরকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চোখ দুইটি পানিতে ভিজে গেল। তিনি ছেলেদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেন। আসমা' জিজ্ঞেস করলেন, জা'ফারের কি কোন খবর পেয়েছেন? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, সে শহীদ হয়েছে।" এতটুকু শুনতেই আসমা' চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং বাড়ীতে একটা মাতমের রূপ ধারণ করে। প্রতিবেশী মহিলারা তাঁর পাশে সমবেত হয় এবং তাঁকে বলে, রাসূল (সা) বুকে হাত মারতে নিষেধ করছেন। সেখান থেকে উঠে রাসূল (সা) নিজের ঘরে ফিরে এলেন এবং বললেন : তোমরা জা'ফারের ছেলেদের জন্য খাবার তৈরি কর। কারণ তাদের মা আসমা' শোক ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে।[১২]

অতঃপর রাসূল (সা) ব্যথিত চিত্তে বিমর্ষ মুখে মসজিদে গিয়ে বসেন এবং হযরত জা'ফারের (রা) শাহাদাতের খবর ঘোষণা করেন। ঠিক এ সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলে, জা'ফারের স্ত্রী মাতম শুরু করেছেন এবং কান্নাকাটি করছেন। তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি যাও এবং তাদেরকে এমন করতে বারণ কর। কিছুক্ষণ পর লোকটি আবার ফিরে এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা তো বিরত হচ্ছে না। তিনি লোকটিকে আবার একই কথা বলে পাঠালেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না। তখন রাসূল (সা) বললেন, তার মুখে মাটি ভরে দাও। সহীহ বুখারীতে একথাও এসেছে যে, হযরত 'আয়িশা (রা) ঐ লোকটিকে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এ কাজ (মুখে

---

৯. ফাতহুল বারী-৭/৩১৭; আল-মাগাযী-বাবু গাযওয়াতি খায়বার; মুসলিম, হাদীছ নং-২৫০৩; ফী ফাদায়িলি আস-সাহাবা; কানযুল 'উম্মাল-৮/৩৩৩

১০. তাবাকাত-৮/২৮১; আল-ইসাবা-৪/২৩১

১১. বুখারী-২/৬০৭-৬০৮; তাবাকাত-৮/২৮১

১২. মুসনাদ-৬/৩৭০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৮০

মাটি ভরা) না কর তাহলে রাসূল (সা) কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন না। তৃতীয় দিন রাসূল (সা) আসমার বাড়ী যান এবং তাঁকে শোক পালন করতে বারণ করেন।[১৩]

দ্বিতীয় বিয়ে

স্বামী হযরত জা'ফারের (রা) শাহাদাতের ছয় মাস পরে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইন যুদ্ধের সময়কালে হযরত আবু বাক্রের সাথে আসমার দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং বিয়েটি পড়ান।[১৪] এই বিয়ের দুই বছর পর দশম হিজরীর জুলকা'দা মাসে আবু বাকরের (রা) ঔরসে ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকরের জন্ম হয়। আসমা' তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের কাফেলার সাথে শরীক হয়ে মক্কার পথে ছিলেন। জুল হুলায়ফা পৌঁছার পর মুহাম্মাদ ভূমিষ্ঠ হয়। এখন তিনি হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে সংশয়িত হয়ে পড়েন। স্বামী আবু বাকরও (রা) তাঁকে মদীনায় ফেরত পাঠাতে চাইলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) মতামত জানতে চাওয়া হলো। রাসূল (সা) বললেন, তাকে বলো সে যেন গোসল করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়।[১৫]

হিজরী অষ্টম সনে প্রথম স্বামী জা'ফারের ইনতিকালে হযরত আসমা' (রা) ভীষণ ব্যথা পান। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই শোক ও দুঃখকে তিনি সবর ও শোকরে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু হিজরী ১৩ সনে দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবু বাকরের (রা) মৃত্যুতে তিনি আবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তিনি এ শোকও কাটিয়ে ওঠেন। মৃত্যুকালে আবু বাকর (রা) ওসীয়াত করে যান, স্ত্রী আসমা' তাঁকে অন্তিম গোসল দিবেন। আসমা' তাঁকে গোসল দেন।[১৬] গোসল দেয়া শেষ হলে তিনি উপস্থিত মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলেন : আমি রোযা আছি। আর দিনটিও ভীষণ ঠাণ্ডার। আমাকেও কি গোসল করতে হবে? লোকেরা বললো : না।[১৭]

হযরত আবু বাকরের (রা) ইনতিকালের সময় তাঁর ঔরসে আসমার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান মুহাম্মাদের বয়স প্রায় তিন বছর ছিল।[১৮] পরবর্তীকালে এই মুহাম্মাদ তৃতীয় খলীফা হযরত উছমানের (রা) হত্যার মত মারাত্মক ট্রাজেডীর এক অন্যতম সাক্ষী অথবা নায়কে পরিণত হন।

দ্বিতীয় স্বামী আবু বাকরের (রা) মৃত্যুর পর হযরত আসমা' হযরত 'আলীকে (রা) তৃতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। শিশু মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর মায়ের সাথে সৎ পিতা 'আলীর (রা) সংসারে চলে আসেন এবং তাঁর স্নেহছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে হযরত 'উছমান (রা) হত্যার দায়-দায়িত্ব যে অনেকে হযরত 'আলীর (রা) উপর চাপাতে চেয়েছিলেন, তার মূল কারণ এই সৎ পুত্র মুহাম্মাদের আচরণ।

---

১৩. মুসনাদ-৬/৩৬৯
১৪. আল-ইসাবা-৪/২৩১
১৫. তাবাকাত-৮/২৮২; মুসনাদ-৬/৩৬৯; মুসলিম-৩/১৮৫-১৮৬
১৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/২২৩; তাবাকাত-৮/২৮৩
১৭. মুওয়াত্তা-১/২২২-২২৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৬
১৮. তাবাকাত-৮/২৮৪

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন, হযরত আসমার দুই ছেলের নাম মুহাম্মাদ– মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর। একদিন এই দুই ছেলে একজন আরেকজনের উপর কৌলিন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বলতে থাকে, আমি তোমার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান। আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে বেশী সম্মানীয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ বিতর্ক চলতে থাকে। হযরত 'আলী (রা) তাদের মা আসমাকে বললেন, তুমিই তাদের এ বিবাদের ফয়সালা করে দাও। আসমা' বললেন, আমি আরব যুবকদের মধ্যে জা'ফারের চেয়ে ভালো কাউকে পাইনি, আর বৃদ্ধদের মধ্যে আবু বাকরের চেয়ে বেশী ভালো কাউকে দেখিনি। 'আলী (রা) বললেন, তুমি তো আমার বলার কিছু রাখলে না। তুমি যা বলেছো, তাছাড়া অন্য কিছু বললে আমি বেজার হতাম। আসমা' তখন বলেন, আর ভালো মানুষ হিসেবে আপনি তিনজনের মধ্যে তৃতীয়।[১৯]

হযরত 'আলীর (রা) ঔরসে হযরত আসমা' ছেলে ইয়াহইয়াকে জন্মদান করেন। তবে ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'আলীর (রা) ঔরসে আসমার গর্ভে দুই ছেলে– ইয়াহইয়া ও 'আওনের জন্ম হয়। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, বেশীর ভাগ সীরাত বিশেষজ্ঞ উক্ত মতটিই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত মতটিকে 'আল্লামা ইবনুল আছীর ভুল বলেছেন। তিনি লিখেছেন, এটা ইবনুল কালবীর একটা কল্পনা। আর তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী।[২০] তাহলে হযরত আসমার (রা) তিন স্বামীর ঘরে মোট সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচজন। হযরত জা'ফারের ঘরে মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ, 'আওন, আবু বাক্‌রের (রা) ঘরে মুহাম্মাদ এবং 'আলীর (রা) ঘরে ইয়াহইয়া।[২১] পাঁচজনই পুত্র সন্তান।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর খলীফা 'উছমানের খিলাফতকালের বিদ্রোহ ও বিশৃংখলায় জড়িয়ে পড়েন। আর এরই প্রেক্ষিতে হিজরী ৩৮ সনে তিনি মিসরে নিহত হন। গাধার চামড়ার মধ্যে ভরে তাঁর মৃতদেহ জ্বালিয়ে ফেলে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। ছেলের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে স্বভাবতঃই মা আসমা' ভীষণ দুঃখ পান। কিন্তু ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্য ধারণ করেন। এই মর্মন্তুদ খবর শোনার পর জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যান।[২২]

হযরত আসমা' (রা) হাবশা অবস্থানকালে সেখানকার সাদামাটা ধরনের টোটকা চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অন্তিম রোগশয্যায় এবং পার্থিব জীবনের প্রান্ত সীমায় তখন উম্মু সালামা ও আসমা' (রা) মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ 'জাতুল জান্‌ব' বলে নির্ণয় করেন এবং তাঁকে ঔষধ পান করাতে উদ্যোগী হন। রাসূল (সা) কোন প্রকার ঔষধ পান করতে অস্বীকৃতি জানান। ঠিক সে সময় তিনি একটু অচেতন হয়ে পড়েন। এটাকে তাঁরা দুইজন একটি সুযোগ বলে মনে করেন। তাঁরা

---

১৯. প্রাগুক্ত-৮/২৮৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৭

২০. উসুদুল গাবা-৫/৩৯৫; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৪৪; আল-ইসতী'আব-২/৭৪৫

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৭

২২. আল-ইসাবা-৪/২৩১; সাহাবিয়াত-১৭৩

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ একটু ফাঁক করে ঔষধ ঢেলে দেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর অচেতন অবস্থা দূর হয়ে গেলে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করেন এবং বলেন : এ ব্যবস্থাপত্র সম্ভবতঃ আসমা' দিয়ে থাকবে।[২৩]

হযরত আসমা' (রা) থেকে ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নিকট যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন– 'আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফার, ইবন 'আব্বাস, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আল-হাদ, 'উরওয়া, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, উম্মু 'আওন বিন্ত মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, ফাতিমা বিনত 'আলী, আবূ ইয়াযীদ আল মাদানী।[২৪] তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। রাসূল (সা) বিপদ-আপদের সময় পড়ার জন্য তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। আসমা' সেটি পাঠ করতেন।[২৫]

তিনি স্বপ্নের তা'বীরও ভালো জানতেন। এ কারণে হযরত 'উমার (রা) সচরাচর তাঁর কাছ থেকেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিতেন।[২৬]

হযরত আসমার (রা) তৃতীয় স্বামী 'আলী (রা) হিজরী ৪০ সনে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আসমাও এর কিছু দিন পরে ইনতিকাল করেন।[২৭]

একদিন রাসূল (সা) আসমার প্রথম স্বামী জা'ফারের তিন ছেলেকে খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, এদের এমন অবস্থা কেন? আসমা' বলেন, তাদের অতিমাত্রায় নজর লাগে। রাসূল (সা) বলেন, তা তুমি ঝাড়-ফুঁক কর না কেন। হযরত আসমার একটি মন্ত্র জানা ছিল। তিনি সেটি রাসূলকে (সা) শোনান। রাসূল (সা) শুনে বলেন, হ্যাঁ, এটি ঠিক আছে।[২৮]

হযরত আসমা' (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ফাতিমার (রা) বিয়ের সময় তিনি বেশ কর্মতৎপরতা দেখান। পাত্রী পক্ষ থেকে তিনি জামাই 'আলীর (রা) বাড়ীতে যান।[২৯]

---

২৩. বুখারী-২/৮৫১; মুসনাদ-৬/৪৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৪৫
২৪. আদ-দুররুল মানছুর-৩৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৭
২৫. মুসনাদ-৬/৩৬৯; কান্‌য আল-'উম্মাল-১/২৯৯
২৬. কান্‌য আল-'উম্মাল-৩/১৫৩; আল-ইসাবা-৪/২৩১; হায়াতুস্ সাহাবা-৩/৪৫০
২৭. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৩৯৯; শাজারাতুজ জাহাজ-১/১৫, ৪৮
২৮. মুসলিম-২/২২৩
২৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৭-৬৬৮

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-ইমাম আয-যাহাবী :

(ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরূত : আল-মুওয়াস্সাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)

(খ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

(গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো : মাকতাবা আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি.)

২. ইবন হাজার :

(ক) তাহযীব আত-তাহযীব, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.; বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

(খ) তাকরীব আত-তাহযীব, (লাখনৌ)

(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, (বৈরূত : দার আল-ফিকর, ১৯৭৮)

(ঘ) লিসান আল-মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হি.)

(ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হি.)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী : শাযারাত আয-যাহাব, (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্যী: তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, (বৈরূত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-১, ১৯৮৮)

৫. আবূ ইউসুফ : কিতাব আল-খারাজ, (বৈরূত : দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯)

৬. ইবন কাছীর :

(ক) তাফসীর আল-কুরআন আল-'আজীম, (মিসর : দারু ইহ্ইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা)

(খ) মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর, (বৈরূত : দার আল-কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১)

(গ) আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ্, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)

(ঘ) (ঘ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত : মাকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)

৭. ইবনুল জাওযী : সিফাতুস সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)

৮. ইবন সা'দ : আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির)

৯. ইবন 'আসাকির : আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম : মাতবা'আতু আশ-শাম, ১৩২৯ হি.)

১০. ইয়াকূত আল-হামাবী : মু'জাম আল-বুলদান, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)

১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী : কিতাব আল-আগানী, (মিসর : ১৯২৯)

১২. ইবন হাযাম : জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, (মক্কা : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২)

১৩. ইবন খাল্লিকান : ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর : মাকতাবা আন-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলূসী : বুলূগ আল-আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (১৩১৪ হি.)

১৫. ইবনুল আছীর :
(ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
(খ) তাজরীদু আসমা' আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, সংস্করণ-১, ১৩১৫ হি.)

১৬. আল-বালাযুরী :
(ক) আনসাব আল-আশরাফ, (মিসর : দার আল-মা'আরিফ)
(খ) ফুতূহ আল-বুলদান, (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)

১৭. আয-যিরিক্‌লী : আল-আ'লাম, (বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালাঈন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)

১৮. ইবন হিশাম : আল-সীরাহ্‌ আন-নাবাবিয়্যা, (বৈরূত)

১৯. ইউসুফ আল-কান্‌ধালূবী : হায়াত আস-সাহাবা, (দিমাশ্‌ক : দারুল কালাম, সংস্করণ-২, ১৯৮৩)

২০. সা'ঈদ আল-আনসারী, মাওলানা : সিয়ারে আনসাব, (ভারত : ১৯৪৮)

২১. নিয়ায ফতেহপূরী : সাহাবিয়াত, (করাচী : নাফীস একাডেমী)

২২. ইবন 'আবদিল বার : আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)

২৩. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' আহলিল বায়ত, (দিমাশ্‌ক : দারুল য়ামামা, সংস্করণ-৩, ১৯৯৮)

২৪. ইবন সাল্লাম আল-জামহী : তাবাকাত আশ শু'আরা', (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

২৫. ইবন কুতায়বা : আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা' (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮১)

২৬. ড. আবদুর রহমান আল-বাশা : সুওয়ারুন মিন হায়াত আস-সাহাবা, (সৌদি আরব, সংস্করণ-১)

২৭. ড. শাওকী দায়ফ : তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, সংস্করণ-৭)

২৮. ড. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, (বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)

২৯. জুরযী যায়দান : তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ্‌ আল-'আরাবিয়্যা, (বৈরূত : দারু মাকতাবা আল-হায়াত, সংস্করণ-৩, ১৯৭৮)

৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী : কানযু আল-'উম্মাল, (বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৫, ১৯৮৫)

৩১. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল-বান্না : বুলূগ আল-আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ), (কায়রো : দার-আশ-শিহাব)

৩২. ড. মুসতাফা আস-সিবা'ঈ : আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-২, ১৯৭৬)

৩৩. হাজী খালীফা : কাশ্ফ আজ-জুনূন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরূত : দার আল-ফিক্র, ১৯৯০)
৩৪. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক : তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী : তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, (মিসর : আত-তিবা'আ আল-মুগীরিয়া
৩৬. দায়িরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়া (লাহোর)
৩৭. ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইকদ আল-ফারীদ, (কায়রো : লুজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
৩৮. ইবন মানজূর : লিসান আল-'আরাব, (কায়রো : দারু মা'আরিফ)
৩৯. 'উমার রিদা কাহহালা : আ'লাম আন-নিসা', (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৫, ১৯৮৪)
৪০. মাহমূদ মাহদী আল-ইসতানবূলী ও মুসতাফা আশ-শিলবী : নিসা' হাওলার রাসূল (সা), (জিদ্দা : মাকতাবা আস-সাওয়াদী, সংস্করণ-৯, ২০০১)
৪১. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, (মক্কা : দারু তায়্যিবা আল-খাদরা, সংস্করণ-২, ২০০০)
৪২. সা'ঈদ আনসারী : সিয়ারুল সাহাবিয়াত, (আজগড়, ১৩৪১)
৪৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী : সীরাতে 'আয়িশা (রা), (করাচী : উরদূ একাডেমী সিন্ধ)
৪৪. ড. আবদুর কারীম যায়দান : আল-মুফাস্সাল ফী আহকাম আল-মারআতি ওয়াল বায়ত ফী আশ-শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৩, ১৯৯৭)
৪৫. আল-বাকিল্লানী : ই'জাজ আল-কুরআন, (বৈরূত : মুআস্সাসাতুল কুতুব আছ-ছাকাফিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৯১)
৪৬. আস-সুয়ূতী : আদ-দুররুল মানছূর, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
৪৭. 'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী : খাযানাতুল আদাব, (বৈরূত : দারু সাদির)
৪৮. মুহাম্মাদ 'আলী আশ-শাওকানী : দাররুস সাহাবা ফী মানাকিব আল-কারাবা ওয়াস সাহাবা, (দিমাশ্ক : দারুল ফিক্র, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)
৪৯. 'আলী ইবন বুরহানউদ্দীন আল-হালাবী : আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা, (মিসর : সংস্করণ-১, ১৯৬৪)
৫০. আল-বায়হাকী : দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৫)
৫১. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্, (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৪, ২০০১)
৫২. মুহিব্বুদ্দীন আত-তারাবী : আর-রিয়াদ আন-নাদিরা ফী মানাকিব আল-'আশারা, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)
৫৩. আহমাদ যীনী দাহলান : আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা, (বৈরূত : আহলিয়া লিন নাশ্র ওয়াত তাওযী', ১৯৮৩)
৫৪. আবূ নু'আইম আল-ইসফাহানী : হিলয়াতুল আওলিয়া, (বৈরূত : দার আল-কিতাব আল-আরাবী, সংস্করণ-২, ১৯৬৭)

৫৫. আহমাদ খলীল জুম'আ : বানাত আস-সাহাবা, (বৈরূত : আল-যামামা, সংস্করণ-১, ১৯৯৯)
৫৬. আস-সামহূদী : ওফা' আল-ওফা', (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, সংস্করণ-৪, ১৯৮৪)
৫৭. ইবন 'আসাকির : তারীখু দিমাশ্ক, (দিমাশ্ক : দারুল ফিক্র)
৫৮. আল-হায়ছামী : মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, (বৈরূত : মুআস্সাসা আল-মা'আরিফ, ১৯৮৬)
৫৯. মুস'আব আয-যুবায়রী : নাসাবু কুরায়শ, (মিসর : দার আল-মা'আরিফ, সংস্করণ-৩)
৬০. ইবন কায়্যিম : যাদ আল-মা'আদ, (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-২, ১৯৮২)
৬১. আল-ওয়াকিদী : আল-মাগাযী, (বৈরূত : 'আলম আল-কুতুব)
৬২. ইবন সায়্যিদ আন-নাস : 'উয়ূন আল-আছার ফী ফুনূন আল-মাগাযী ওয়াস সিয়ার, (মুআস্সাসাতু 'ইয্যিদ্দীন)
৬৩. ইবন কুতায়বা 'উয়ূন আল-আখবার, (দারুল কুতুব, ১৯৬৩)
৬৪. ইবন কুতায়বা : আল-মা'আরিফ, (মিসর : দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৪, ১৯৭৭)
৬৫. মানসূর 'আলী নাসিফ : আত-আল-জামি' লিল উসূল, (মিসর : মাতবা'আতু আল-বাবী আল-হালাবী, সংস্করণ-৪)
৬৬. আত-তাবারী : তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলূক, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা সংস্করণ-২, ১৯৮৮)
৬৭. 'আবদুল বাদী' সাকার : শা'ইরাত আল-আরাব, (আল-মাকতাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-১, ১৯৬৭)
৬৮. আল-জাহিজ : আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরূত : দারুল ফিক্র)
৬৯. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মিনাত তারীখ, (দিমাশ্ক : দারুল য়ামামা, সংস্করণ-১, ১৯৯৭)
৭০. ড. 'আয়িশা 'আবদুর রহমান : তারাজিমু সায়্যিদাত বায়ত আন-নুবুওয়াহ্, (কায়রো : দার আদ-দায়ান লিত-তুরাছ, সংস্করণ-১, ১৯৮৮)
৭১. ইবন দুরাইদ : আল-ইশতিকাক, (কায়রো, ১৯৫৮)
৭২. ইবন কুদামা আল-মাকদাসী : আল-ইসতিবসার ফী নাসাবিস সাহাবা মিনাল আনসার, (বৈরূত : দারুল ফিক্র)
৭৩. ইমাম আল-বুখারী : আল-আদাব আল-মুফরাদ, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০১)
৭৪. 'আবদুর রউফ দানাপুরী : আসাহ আস-সীরাহ্, (করাচী)
৭৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ : আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, খণ্ড-১-৫, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)
৭৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ : আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, সংস্করণ-১, ২০০৩)
৭৭. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা